শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বাণী ॥

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্ব-নাগরিক" "সেই আমার মহাতীর্থ"

মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮১, ১৯৭৬ সম্পাদিকা—বেণু মিত্র ২৯তম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

"নরনারায়ণ আশ্রমের আদর্শ হইতেছে পুরুষোত্তম-কৃষ্টির ছাঁচে বিশ্বনাগরিক জীবন সামনে রাখিয়া বহুধা-বিভক্ত এই বিশ্বকে এক-বিশ্বে গড়িয়া তোলা। এই আদর্শকে রূপ দিতে হইলে গীতার আত্মজ্ঞান-স্বধর্ম-নীতির সমন্বয় বিধান করিতে হইবে। এই সমন্বয়কে একমাত্র বাস্তবের বুকে, 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে'-ই রূপ দেওয়া সম্ভব। জটিল কুটিল আবেষ্টনের ভিতরেই ইহাকে কর্মকরী করিতে হইবে।...নরনারায়ণ আশ্রমের উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে প্রাণ ছড়ানো, যে প্রাণ একটি অখণ্ড সমাজ গড়িয়া তুলিতে পারে। কর্ম হইবে প্রাণ-প্রসারের যন্ত্র। প্রাণের ঘনীভূত আস্বাদন হইবে কর্ম। কর্মের এই রূপ ছাড়া ভারতবর্ষ একান্তভাবে অহংকৌন্দ্রিক 'কর্ম' নিতে পারে না। নিলে ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ থাকিবে না। প্রাণের রস নিংড়াইয়া কর্ম ফুটিয়া বাহির হইবে। এই প্রাণই সমাজ গড়িবে। এই উদ্দেশ্যকে সফল করিতে হইলে নরনারায়ণ আশ্রমের সমন্বয়-যোগে যুক্ত ব্যবহারিক ও পারমার্থিক দিক থাকিবে। এই প্রতিষ্ঠান একাধারে স্বতন্ত্র ও গণতন্ত্র। প্রচলিত গণতন্ত্রদ্বারা ইহা পরিচালিত হইবে না। মহাত্মাজীর 'Folly of Democracy' প্রবন্ধ পড়িয়াছি।"—

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ,

২০শে জুলাই ১৯৫৭

উজ্জ্বলভারত

মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭৬ ঊনত্রিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

আমাদের কথা

মাঘ ১৩৮২ বঙ্গাব্দ হইতে উজ্জ্বলভারত পত্রিকা তাহার ২৯-তম বর্ষ আরম্ভ করিল। তাহার ২৮-তম বর্ষ বিশেষ দুর্যোগপূর্ণ হওয়ায় সে নিয়মিত প্রকাশিত হইতে পারে নাই। তবু সে কাজও আছে এবং আরও বাঁচিয়ে থাকা লইয়াই তাহার ২৯-তম বর্ষ সে আরম্ভ করিল। তাহাকে মানুষের প্রয়োজন আছে বলিয়াই এত দুর্যোগেও সে আছে এবং ভবিষ্যতেও বাঁচিবে বলিয়া আশা রাখে। উজ্জ্বলভারত প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত উজ্জ্বলভারত-প্রাণপুরুষ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-দেব যে জীবন ও দর্শন মানুষের সর্বাঙ্গীণ সমস্যা সমাধান হিসাবে উপস্থিত করিতে চাহিয়াছেন ও চাহিতেছেন, বর্তমান বিশ্বে তাহাই যুগধর্ম। শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের নিকট তিনি কেন আসিয়াছেন তাহার উত্তর দিয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ১২৫৭ সালের ২৪শে মে লিখিতেছেন, 'শ্রীনিত্যগোপালের শ্রীচরণতলে আসিয়াছি, বিশ্বকেন্দ্রে আসিয়াছি বিশ্বনাথ ও বিশ্ব বনিয়া যাইবার জন্য, বিশ্ব বনিয়া গিয়া বিশ্বসেবা করিবার জন্য।' বিশ্বরূপ বনিয়া বিশ্বসেবা করাই সমস্ত বন্ধন মাঝে মুক্তি—ইহাই মানুষের নিকট সমস্ত শাস্ত্র ও জীবনের বিবিধ সমস্যার মধ্য দিয়া উপস্থিত করাই উজ্জ্বলভারতের কাজ। 'যিনি অন্তরে বাহিরে সমভাবে, তাঁহাকে পাইতে হইলে আমার জীবনের এমন এক স্তরের সাধনাদ্বারা পাইতে হইবে যাহা সমভাবে অন্তরের ও বাহিরের। জীবনেরই যেন প্রকাশ অন্তর ও বাহির। সাধনা হইবে জীবনগত, একান্ত অন্তরেরও নয়, একান্ত বাহিরেরও নয়।' জীবনকে, জীবন-দেবতাকে ঐ স্তরে বাহিরে সমভাবে পাইয়া সমগ্র জীবনকে, সহজ জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবার কথা বলিতেই উজ্জ্বলভারতের প্রয়োজন। 'সহজ জীবনের ছন্দ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুইকেই পরিপাক করিয়া চলে। একান্ত প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির পথে চলা জীবনের পক্ষে অস্বাভাবিক। প্রবৃত্তি আগাইয়া গেলে নিবৃত্তি পিছন হইতে বাধা দেয়, একান্ত নিবৃত্তি আগাইয়া গেলেও প্রবৃত্তি পিছটানের সৃষ্টি করে।' এই দুই বৃত্তিকে সামঞ্জস্য করিয়া সহজ ভাগবতী বৃত্তিকে মানুষের মধ্যে উন্মোচিত করাই উজ্জ্বলভারতের কাজ। 'বিশ্বের সকলকে লইয়া বিশ্বের জামা ও রসগোল্লা খাওয়া যায় না। মানুষের অর্থ রসগোল্লা ও রসগোল্লার স্তরে সকলকে লইয়া যাওয়া বুঝায় না। কেননা উহা অসম্ভব। দুধ যদি অনন্ত পরিমাণে উৎপাদন করা যাইত, তবে রসগোল্লাকে standard করা যাইত। দুধকে 'মান' ধরিলে হয়ত সকলেই কিছু কিছু দুধ পাইতে পারে। খাদ্যের খাওয়াপরার সমাধান আনিতে হইলে বৈরাগ্যের আশ্রয় নিতেই হইবে। আটের নামে সিল্ক ও রসগোল্লার প্রচলন সমর্থন করা যাইতে পারে বটে, উহাতে শোষণ থাকিয়া যাইবেই। যাহারা সিল্ক ও রসগোল্লা ব্যবহার করিবে, তাহাদের ইহার জন্য প্রচুর মূল্য দিতে হইবে।' —বিশ্বের সকলকে লইয়া খাওয়াপরার

সাম্যবাদ আনার কথা উজ্জলভারত বলে—তাই তাহার প্রয়োজন কোনদিন ফুরাইবে কেন?

তাই বলি উজ্জলভারত আবার রওয়ানা হইল, সে চলিতে চায়।

দূরে কাছে যে কেউ যে ভাবে পারেন ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন যেন—বিশ্বের আকাশে বাতাসে এই আবুত্তি ছড়াইয়া দিয়া উজ্জলভারত রওনা হইল। জয় হোক শ্রীশ্রীনিত্য-গোপালের—যাঁহার প্রাণধারা বিচ্ছুরিত হইয়া নূতন জগতে নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিয়া তুলিবে।

এক বিশ্ব রচনায় ভারতের অবদান

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

"আজ চাই সর্বক্ষেত্রের সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে এমন একটী সর্বাঙ্গীণ আদর্শবাদ প্রচার এবং তাহার অনুবর্তন করিয়া একটী কর্মতালিকা প্রণয়ন।

আমরা তাহারই দিগ্ দর্শন করিতেছি :—

১) উজ্জল ভারতের ইষ্ট হইবেন নরনারায়ণ। 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে' —মুণ্ডক উপনিষৎ। একান্ত নারায়ণ বা একান্ত নর কাহারও দ্বারা সমগ্র বিশ্বসমস্যার সমাধান অসম্ভব। নর-নারায়ণ সংহতির মাঝেই ভারতীয় ভাববাদ পাশ্চাত্য জড়বাদের সমন্বয় সম্ভব। এই নরনারায়ণই শ্রীকৃষ্ণার্জুন। নর হইতেছে সর্ব জীবের প্রতিনিধি স্থানীয়।

২) উজ্জল ভারতের ধর্ম সর্বধর্ম সমন্বয়। জড়-ধর্ম, অজড়-ধর্ম, হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-বৌদ্ধ-জৈন প্রভৃতি সর্বধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ হইতেছে পুরু-ষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবন। এই ধর্ম স্বীকৃত, আস্বাদিত ও প্রচারিত হইলে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন দ্বারা ধর্মের প্রশ্নকে আর চাপা দিবার প্রয়োজন হইবে না। এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্যে ইসলাম ধর্মও হজম হইয়া যাইবে।

৩) উজ্জল ভারতের শাস্ত্র অখণ্ড বেদশাস্ত্র ও 'নিগমকল্প তরোর্গলিতং ফলং' ভাগবত শাস্ত্র।

৪) উজ্জল ভারতে নর-নারীর সম্বন্ধ দুইয়ের সমকক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে; একান্ত পুরুষ-তন্ত্র বা একান্ত নারীতন্ত্র সমাজ কোনও স্থায়ী ফল আনয়ন করিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

৫) উজ্জল ভারতের সমাজ ব্যবস্থার উচ্চতম জীবনের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের থাকিবে সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (equal and direct re-lation)। ঋষির বর্ণাশ্রমের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণাশ্রম। গুণকৌলীন্য ও কর্ম-কৌলীন্য কৃষ্ণ-বর্ণাশ্রমে নাই।

৬) উজ্জলভারতের অর্থনীতির প্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্—ঈশোপ-

নিবদের এই মহাবাণী হইতে। 'লোভ করিও না. ধন কাহারও একচেটিয়া নয়। ধন বিশ্বের, ধন বিশ্বেশ্বরের ইহাই ভারতের অপমন্ত্র। উজ্জ্বল ভারত ধনিক শ্রমিক পরস্পরকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সহযোগিতাদ্বারা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবে।

৭) শ্রেণীসংঘর্ষের (Class-war) রক্তাক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল ভারত শ্রেণী সমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিবে। সাধনা তাহার আনন্দমঠের 'ভক্তি'—দেশভক্তি, বিশ্বভক্তি, নরনারায়ণ-ভক্তি।

৮) প্রাচীন ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে ব্যষ্টি সাধনার উপর জোর দিয়াছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা জোর দিয়াছে সমষ্টি সাধনার উপর। উজ্জ্বল ভারত দুইয়ের তুল্যমূল্য স্বীকার করিয়া সমগ্র দৃষ্টি লইয়া ব্যষ্টি সমষ্টির সমন্বয় বিধান করিবে। উজ্জ্বল ভারতে সমষ্টির চাপে যেমন ব্যষ্টি নিষ্পেষিত হইবে না, ব্যষ্টির উচ্ছৃঙ্খলতায়ও সমষ্টি তেমনই বিপন্ন হইবে না।

৯) উজ্জ্বল ভারতের মুক্তি-আস্বাদন ধরার মুক্তিতে ঘনীভূত। উজ্জ্বল ভারত মাটির দেহেই ব্রহ্ম-লোককে আস্বাদন করিবে, মাটির দেহের নরনারীর মধ্যেই গোলোকের দেবদেবীকে প্রত্যক্ষ করিবে।

১০) উজ্জ্বল ভারতে 'no method is too mean' নীতি চলিবে না। ভারতবর্ষে পথ ও গন্তব্যস্থল একই বস্তুসত্তার দুইটী দৃষ্টিভঙ্গি বা আস্বাদন মাত্র। আনন্দমঠের 'ভক্তি-সাধনাই' এই সমন্বয়ের খোঁজ দিবে।

১১) উজ্জ্বল ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তি হইবে পল্লী ব্রহ্ম। শহর থাকিবে এখানে পল্লীর সেবক। পল্লীই বাস্তব সত্তা, শহর একটা idea মাত্র। এই পল্লী সভ্যতাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে স্বর্গমানকে কৃষিমানের সেবকরূপে স্থাপন করিতে হইবে। কৃষি-সভ্যতার চরণ তলেই স্বর্গের উচ্চ মস্তিষ্ক শীতল হইতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের 'মান' বাড়াইয়া তুলিলেই সম্ভব হইবে পল্লী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। অর্থের শাসন-শোষণমুক্ত অন্নই বিশ্বপ্রাণবর্দ্ধক। অর্থ থাকিবে অন্নের বাহক-রূপে অন্নব্রহ্মকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার জন্য।" —পঞ্চাশ বৎসরেরও আগে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মানুষী সভ্যতার বর্তমান কালের মূল সমস্যাগুলির সমাধানের ওপর যে আলোক-পাত করেছিলেন, উপরে তাই-ই উদ্ধৃত হল। আজও বিশ্ব সমস্যার সমাধানদ্বারা এক-বিশ্ব রচনার জন্যও ঐ পথেই অগ্রসর হতে হবে।

"অশ্বত্থবৃক্ষ পূজার সময় তাহাতে কৃষ্ণকে আবাহন করিতে হইবে না। অশ্বত্থবৃক্ষই কৃষ্ণের এক রূপ।"

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

নারী বর্ষ

শ্রীসুনীতি সান্যাল

যে ভারতবর্ষের বুকে একদিন ঘোষিত হয়েছিল "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"—সেই ভারতবর্ষের বুকেই কালের ধারা বেয়েই আজ দিকে দিকে ঘোষিত হয়ে চলেছে নারীবর্ষ উদ্‌যাপনের নানা কার্যাত্মক পরিকল্পনা। সমগ্র নারীহৃদয় নিশ্চয়ই এতে আনন্দিত হবে, সাড়া দেবে এ বর্ষ পূর্তির কর্ম-প্রচেষ্টায়।

অতীতের দিকে যখন চোখ ফেরাই তখন দেখতে পাই কত কত নারী-জীবন এই স্বাতন্ত্র্যহীনতা বিধির গণ্ডি অতিক্রম করে স্বমহিমায় জনসমাজের কাছে কল্যাণী মূর্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছেন! বর্তমান যুগেও এ চিত্রের সংখ্যাও বিরল নয়। ভারতীয় কর্মিষ্ঠা নারীর স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করেও পরতন্ত্র নারীকে সমাজ-গঠনে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা দিয়েছিলেন, সম্মানও দিয়েছিলেন, দেননি শুধু স্বাতন্ত্র্য। ব্রিটিশরা যেমন ভারতবর্ষকে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-উচ্চ পদের চাকুরী সবই দিতে চাইতেন শুধু দিতে চাইতেন না ভারতের স্বাতন্ত্র্য, ঠিক তেমনি অবস্থা নারী জীবনেও যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল।

আজ প্রগতির পটভূমিকায় নারীজীবনের সকল সত্তা যেন উপলব্ধি করতে চাইছে—না, সমাজের অর্ধাঙ্গ অংশ ঐ নারীসত্তা মোটেও সুস্থতা লাভ করেনি যদিও কিছুটা সংখ্যা আজ শিক্ষা দীক্ষার সব অধিকারে অনেকটা অগ্রসর, তথাপি সমগ্র নারী-জীবনের চলার পথ আর চলার ছন্দ এখনও অনেক অবিদিত আছে, যার ফলে সমাজের কল্যাণ কিছুতেই পূর্ণ করা যাচ্ছে না বরং বীভৎসরূপে মনুষ্য সমাজের সভ্যতাকে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। নারীজাতি সম্পর্কে অনেক কুপ্রথা, কুসংস্কার এদেশ থেকে দূর হয়েছে; সব অধিকারের পূর্ণ সুযোগের কথাও চিন্তা করা হচ্ছে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও নারী-শক্তি পূর্ণ মর্যাদার আসন পেয়েছে—যা নাকি কয়েকশত বছর আগের ইতিহাসের পাতায় আছে শুধু নারীত্বের অপরাধেই সুলতানা রিজিয়ার জীবনের লাঞ্ছনা। তাঁর রাষ্ট্র-পরিচালনার যোগ্যতাকেও ম্লান করে ফেলা হয়েছিল নারীত্বের অপরাধে।

কিন্তু এসব নিয়ে ভাবতে যখন বসি তখন চোখের সামনে আমরা কী দেখি? দেখি নারী সমাজের কিছুটা অংশ বিশেষ করে শহরাঞ্চলে মেয়েরা দিদিমা, ঠাকুরমার সেই অবরোধ প্রথা থেকে মুক্তি পেয়ে স্কুল কলেজে শিক্ষা লাভ করেছে, বেশ কিছুটা অংশ স্বাতন্ত্র্যের নামে উচ্ছৃঙ্খল ভোগ বিলাসে, নগ্ন দেহ-সজ্জায় পুরুষ-শাসিত সমাজে পুরুষের অহমিকার কাছেই নিজেদের বিলিয়ে দিচ্ছে, পারিবারিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে চাকুরী জীবন দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের standard বাড়িয়ে চলেছে—আবার নারীসমাজের আরেকটা অংশ অর্থাৎ গ্রাম-প্রধান ভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশে গ্রামীণ জীবনের চিত্রে দেখা যাচ্ছে শত-সহস্র

মেয়েরা আজও সাক্ষরতা পর্যন্ত জানবার সুযোগ পায়নি তাঁদের স্বাস্থ্যের তাঁদের সচ্ছেন্দের তাঁদের বিকাশের তরে আজও সমগ্র নারীহৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করেনি। সমগ্র দেহযন্ত্রকে সুস্থ রাখতে হলে যেমন দেহের যে কোন অংশের ক্ষুদ্রতম কোষটিকেও উপযুক্ত পরিবেশন করতে হয় তেমনি সমাজের অপরাধ এবং ঐ নারীসমাজের সকল স্তরের, সকল অবস্থার নারীকে সুষ্ঠু আসন্ন অনতে না পারলে কোন পরিকল্পনাই দীর্ঘস্থায়ী হবেনা। একটা উদাহরণ মনে পড়ে গেল সেই "মাষ্টারের বনলতা সেন"— বনলতা পথ প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেকে আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছে কি ভবিষ্যৎ তারও পথ প্রদর্শন করতে পেরেছিল? বনলতার কাহিনী যখন আমরা আলোচনা করি তাঁকে বাহবা দেই- বড় জোর রোমাঞ্চিত হই তাঁর কথা ভেবে, কিন্তু দৃঢ় সংকল্প কি গ্রহণ করেছি আমরা নারীসমাজ যে নারী-পুরুষের যোগাতা ও প্রয়োজনের মানদণ্ডেই শুধু উভয়ের মিলনের কথা ভাবতে হবে? পুরুষ তার পুরুষত্বের গুণাবলী দিয়ে নারীকে গ্রহণ করবে আর নারী তার নারীত্বের গুণাবলী দিয়ে পুরুষকে গ্রহণ করবে। এখানেই হবে সার্থক সুখের নীড়, সার্থক পারিবারিক জীবন। তাই আজও প্রতি ঘরে কন্যার মায়ের কন্যার বিয়েতে "বেনেতী" বুলির কাছে মাথা নোয়াতেই হচ্ছে। আজকে এই নারীত্বের উদ্যাপনের দিনে আমরা কি একথা নতুন করে ভাবব না? "বনলতা সেনকে" ডেকে বলতে পারবনা যে তোমার আত্মাহুতি আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে, যদিও সময় অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে তথাপি আমরা আজ থেকে নতুন করে ভেবেছি, সংকল্প নিয়েছি নারী-পুরুষের মিলন হবে যোগ্যতার মাপকাঠিতে, কোন অতিসন্ধির মাপকাঠিতে নয়। আবার এও যেন না হয় যে যোগ্যতার মাপকাঠিতে, স্বাতন্ত্র্যের মাপকাঠিতে নিজেদেরকে ভুল বুঝে সংসারে অনর্থ ঘটে যায়, যার দৃষ্টান্ত বর্তমান পরিবার জীবনে বহু লক্ষিত হচ্ছে। "আত্মা যেন সদা নিহত দুরন্ত"—এই মন্ত্রে আজকের নারী-সমাজকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। নিজের ভেতরকার আলো বা জ্যোতি দিয়ে দুরন্ত নিহত করতে হবে। প্রত্যেকে হবে প্রত্যেকের সঙ্গে independent at the same time interdependent এই ভাবে জীবনকে গ্রথিত করতে না পারলে গঠনমূলক কোন কাজ আয়ত্তে আনা যাবে না।

তাই পরিশেষে বলি এমন একদল নারী জেগে উঠুক যাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে আবার সেই ভারতীয় নারীর সুর—"যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্"—জীবনের যা কিছু শিক্ষাদীক্ষা বৈভব-বিলাস আমাকে অমৃতা করবে না তা নারী-জীবন থেকে ধুয়ে মুছে যাক। নারী কন্যারূপে অমৃতা হবে, বধূরূপে অমৃতা হবে, জননী-রূপে অমৃতা হবে, সমাজকল্যাণ কর্মে অমৃতা হবে এই হবে বর্তমান নারীর শেষ পরিচয়। এই ব্রত উদ্‌যাপনের সংকল্প নিয়ে প্রতিটী নারী হৃদয়কে জাগিয়ে তুলতে হবে। তবেই আমাদের "নারীবর্ষ" পালন হবে সার্থক। আবার স্মরণ করি সেই বাণী—

"আমি দেখিতে চাই তোমাদের দেবীমূর্ত্তি। প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই এমন একদল সতী নারীর যাহারা আবার আমাদের পতিত নারীজাতির লুপ্ত সতীত্ব আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিবে। আমি একদল সতী সাধ্বী স্ত্রী জগতের সামনে স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে তৈয়ার করিতে চাই।

তোমরা আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য কৃত-সংকল্প হও। তোমরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, স্নেহে উমা, ভক্তিতে সীতা, যোগে যোগমায়া হইয়া দেখাও জগতে নারীজাতি চির পূজ্যা।

……তোমরা মূর্ত্তিমতী শক্তি হও। দুনিয়ার বুকে গার্গী, মৈত্রেয়ীর মত পুরুষোত্তম-তত্ত্ব প্রচার কর। ……তোমরা দাঁড়াও, নরসিংহীর মত দাঁড়াও। সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নতুন করিয়া গড়িতে হইবে।" শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

১৯৫৫

নিতাগোপাল, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, মনের মন, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র। তোমার প্রাণ দিয়া আমি প্রাণন করিব, তোমার মন দিয়া মনন, তোমার চক্ষু দিয়া দর্শন, তোমার শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করিব। তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যেখানেই আমি অহঙ্কারী হইয়া প্রাণন, মনন, দর্শন বা শ্রবণ করিব, সেখানে বিষ জমিয়া উঠিবে। সে বিষ কি আমি হজম করিতে পারিব? তোমার প্রাণন অমৃত, মনন অমৃত, দর্শন অমৃত, শ্রবণ অমৃত।

সর্বেন্দ্রিয়গম্য যা-কিছু সব অমৃত। আমি অমৃতের অধিকারী হইব। 'মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়'—তোমার কৃপায় আমার সব রস অমৃত রসে গড়িয়া উঠুক। সকালে প্রার্থনায় যাই না। P ...ইনজেকশন দেওয়া হয়। বৈকালের দিকে বাহ্য ও প্রস্রাবের বেশ কষ্ট হয়। সন্ধ্যার পর রেণু ডুস দিতে চেষ্টা করে, সুবিধা হয় না। বীরেন ডাক্তারকে রেণু ডাকিয়া আনে। সুবোধ ডাক্তারের ওখানেও যায়। বীরেন ডাক্তারের নির্দ্দেশে ডুস দেয়, বাহ্য হয়। রাত্রিতে উদ্বেগ বাড়ে—আলা ও obstruction। বারবার যমুনা ও নীলুর জায়গা রেজিষ্টারীর কথা মনে পড়ে। একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে। নীলু ৫ কাঠা জমি বাবদ ৬২৫ টাকা, যমুনা ৪ কাঠা বাবদ ৫০০ টাকা দিয়াছে। চলিয়া গেলে ছেলেরা ঐ স্থান দাবী করিবে ইহা আমি বিশ্বাস করিনা। তবু লিখিয়া যাইতেছি, যদি দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া যাইতে না পারি, ছেলেরা যেন আইনের সুযোগ লইয়া ঐ স্থান দাবী না করে। আমি তাহাদিগের সততার উপর বিশ্বাস করি। ঐ স্থান তাহাদের অর্থে ও শ্রমে হয় নাই। যাহারা বুকের রক্ত দিয়া উহা পাইয়াছে, ন্যায়তঃ ধর্মতঃ উহা তাহাদেরই হওয়া উচিত। রেণু প্রভৃতির রক্ত দিয়া ঐ স্থান প্রাপ্ত। উষাঙ্গিনী নিতাব্রত ইহা জানে। রেণুর উপরে ঐ স্থানের সর্ববিধ দায়িত্ব কর্তৃত্ব ও থাকিবে। সে ছাড়া ঐ স্থান হইতে না।

তাহার শক্তি ও অর্থদ্বারা উহা গঠিত। তাহার বাবার বিশু বাবদ ৮২৫৲ ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাবদ ৮১৫৲ টাকাই উহার মূল ভিত্তি। রেণুর সঙ্গে গোপাও থাকিবে। তাহার জীবনের সকল ভার আমার প্রতিষ্ঠান বহন করিবে। আপাততঃ এই পর্যন্তই বলা রহিল। মিনু ইচ্ছা করিলে সারা জীবন আশ্রমে থাকিতে পারিবে। অনেক সেবা সে করিয়াছে। সে বড় দুঃখী ও অসহায়। ৮ই আগষ্ট

নিত্যগোপাল, তোমার প্রতিষ্ঠা বিশ্বের বুকে গড়িয়া তুলিব বলিয়া মনে বড় সাধ ছিল, সকল প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করিয়া এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছি। বুঝি বা পারিলাম না। তোমার মঠ আমাকে 'বিকৃত মত প্রচারক' বলিয়া ট্রাস্টী হইবার অযোগ্য ঘোষণা করিয়াছেন। হয়ত বা তাহাই। কিন্তু তোমার যে রূপের খোঁজ তুমি আমায় দিয়াছ, তাহা যেমন সার্বজনীন, সর্বসংস্কার-মুক্ত, তেমনটী বিশ্বে কোথাও দেখিনা। তুমি যেমন 'সহজ', সর্ব আকারে, সর্ব সম্প্রদায়ে তোমাকে যেমন মানায়, তেমন তো আর কাহাকেও মানায় না। তুমি কি ঠাকুরবাড়ীর ঠাকুর হইয়া থাকিবে? যাহা হয় করিও। আমার তোমাছাড়া গতি নাই। আজিও প্রার্থনায় বসিতে পারি নাই। সকালে সুবোধ, পরে বীরেন আসে। সুবোধ P. চালাইতে বলে। বীরেনের মিকচার খাওয়ার জ্বালা একটু কমে। রাত্রিতে ১১।টা হইতে ৫ বার উঠি। দিনে একটু ভাল থাকি। বৈকালে জগদীশ চক্রবর্তী তাহার গীতা বঙ্গানুবাদ পড়িয়া শুনান। যেখানে আমি differ করি তাহা বলি। কুমার বাহির হয়। রেণু ক্লাস III র বই পড়ে। আমার শরীরের অবস্থার উন্নতি বাহির হয় না। আমার অসুস্থতার খবর জানিয়া নীলু পোষ্টকার্ড দেয়। মিনু ভবানীপুর হইতে সেলাই বাবদ ৫৲ টাকা আনে। বীরেন সন্ধ্যার পর আসে। ... ৯ই আগষ্ট

পুরুষোত্তম, আজ তোমার জন্মাষ্টমী। প্রোতিবত-লোক-বেদ-স্ব হইয়া—প্রকৃষ্টরূপে ত্যক্ত হইয়াছে লোক বেদ স্ব যাহাদের তেমনটী হইয়া—গোপীরা তোমায় ভজনা করিয়াছিলেন। চাহি নাই আমি তোমাকে। তুমি অযাচিত করুণায় জীবনে আসিয়াছ। আজ তোমাকে লইয়া আমি বিপন্ন। তুমি আমার সকল দুঃখের মূল। তোমায় জীবন, দর্শন ও সমাজ-ব্যবস্থাকে ধরার বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সারা জীবন দাপাদাপি করিলাম। পুরুষোত্তম-কৃষ্টিই আমার প্রাণ-প্রিয়। এই কৃষ্টির ছাঁচে বিশ্ব গড়িয়া না উঠিলে এ বিশ্বকে শোষণের হাত হইতে কি করিয়া রক্ষা করা যাইবে? ওগো শোষণ-মুক্তি শ্রীকৃষ্ণ, যদি দয়া করিয়া জীবনে আসিয়াছ, বল দাও, বুদ্ধি দাও, এমন সুযোগ দাও যাহাতে তোমার আসন ঘরে ঘরে রচনা করিতে পারি। দিন যে আমার শেষ হইল। সমাজের বুকে ঝাপাইয়া পড়িবার মত দুর্জয় সাহস ও বীর্য প্রদান কর। তোমার জন্যে আমি আবার অমিয়, কৃষ্ণ-জীবন লাভ করিব। রাত্রিতে প্রস্রাবের উদ্বেগ খুব বাড়ে ১০।, ১১।, ১২।, ২।, ৩। ও ৬।তে প্রস্রাব হয়। নীলু আসে, চিনু আসে। সে কয়েক বই ৭ কপি করিয়া নেয়, প্রতিভা রেণুর বইও নেয়। ১৩৬৲ টাকার উপর নগদ টাকা দিয়া যায়। স্পোসমিক ওষুধ আসিয়াছে। নীলুদের খাওয়ার কষ্ট··· দুঃখ হয়। কিন্তু করিবার কিছুই তো নাই। ১৫৲ টাকা দেওয়া হয়। মঠে ঠাকুরের বই কিনিবার জন্য কুমার ও চিনু যায়। তারিণীবাবু

ছিলেন না বলিয়া কিছুই হয় নাই। ক্ষিতীশবাবু কুমারকে জিজ্ঞাসা করেন 'তোমরা কেমন আছ'? কুমার বলে, আমরা ভাল আছি, স্বামীজী অসুস্থ। ক্ষিতীশবাবু ইহা কিছুই বলিলেন না। ট্রাস্টী হইয়া তিনি তো আমার গতি ছাড়িয়া দেন নাই, আমি তো তাহাকে সভা হইতে বলিয়াছিলাম। ঠাকুরের ইচ্ছা। ১০ই আগষ্ট

ঠাকুর, কোনও দিন তো আমার মস্তক বুদ্ধি হেট হইতে দেও নাই। তাই যখন বরিশাল কংগ্রেস ছাড়িতে বাধ্য হইয়া স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ গড়িয়াছিলাম, তখনকার সাকলা উল্লেখ করিয়া বরিশালের ইন্দ্রপানি কবিরাজ বলিয়াছিলেন, 'যারে আল্লা টানে কল্লা যইয়া, তার ঠাঃ টাইন্না করবা কি? অরে ঘোষের গুরুবল আছে, কে তাহার কি করিবে!' সত্যই তো আমার বল গুরুবলই। মহানির্বাণ মঠে আমি 'বিরুদ্ধমত প্রচারকারী' বলিয়া ট্রাস্টী হইবার অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যে ক্ষিতীশবাবু একদিন আমার 'অদ্বৈতত্ত্ব' বলিয়া ঠাট্টার বিষয় ছিলেন, তিনিও আজ ট্রাস্টী হইয়া আমার একবার খোঁজও নেন না। কিন্তু স্বরাজ-সেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা হইয়াও সেদিন 'war-council-এ আমিই হইয়াছিলাম first dictator'। আমিই কংগ্রেসের পক্ষ হইতে 'লবণ আইন' ভাঙ্গিবার জন্য ১৫ জন সহ নির্ভীকালু অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলাম। সেদিন কংগ্রেসের সভা না থাকিলেও কংগ্রেসের সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে আসিয়াছিল। মহানির্বাণ মঠের লোকেরাও কি তেমন করিয়া ভাবিতে পারেন না? তোমার ইচ্ছা হইলে তাহাও হইতে পারে। আমার জীবনের লক্ষ্য-নিধারণ! তোমার ইচ্ছা অবযুক্ত হউক। সকালে প্রার্থনায় যাইনা। সারাদিন ২ ঘণ্টা পর পর, কখনও বা ১ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্রাব করি। বীরেন ভাবে। বাড়াবাড়ি দেখিয়া হোমিও করাইতেই বলে। রেণু, অভয়বাবু ডাক্তারের কথা বলে, তিনি পি সাহার কথা বলেন। মনোরঞ্জন বসুর সঙ্গে রেণু দেখা করে। সে অপর একজন ডাক্তারের কথা বলে। সত্যব্রতকে খবর দেওয়া হয়। রেণু পি. সাহার কাছে যায়। কাল ১০টা—১১॥ টার মধ্যে আসিবেন। সন্ধ্যায় মনোরঞ্জন, সত্যব্রত আসে। সন্ধ্যায় পর নীলরতনবাবু আসেন, তাহার কাছে ঠাকুরের বড়ভুজ হওয়ার কথা, শ্রীকৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করা, কুসুম-সরোবরে বাঙ্গলায় আসিতে মহাপ্রভুর নির্দেশ, ঠাকুরের কাছে 'তিনি কে' ইহা জানিবার জন্য নগেন্দ্র নারায়ণ বাবুর বৃন্দাবনে প্রশ্নের কথা আলোচনা করি। সত্যব্রত রামলালকে দিয়া তার পাঠাইয়া দেয়। ১১ই আগষ্ট

নিতাগোপাল, তুমি আমার বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন একটি স্থান, যাহার উপর আমার সব কিছু অস্তি, শান্তি, সুখ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, ঘন হইয়াছে। তুমি ছাড়া আমার আসক্ত হইবার কি আছে? রাত্রির অনিদ্রায় তুমিই আমার স্মরণ-মননের বিষয়, সারাদিন তোমার দর্শন আমার ধ্যানের বিষয়। এই বয়সে আমি কি করিয়া বাঁচিতাম যদি না আমার তুমি থাকিতে? কি ভাবেই আমার জীবন হইত। তুমি আমাকে গ্রহণ করিয়াছ বলিয়া আমি আজিও ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি না। এখনও ইচ্ছা সকল রোগ ঝাড়িয়া ফেলিয়া বড়ের মত কর্ম-সমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়ি। পারিব কিনা জানিনা। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে 'জয় নিতাগোপাল' বলাইয়া যাইতে পারিব না? বল

দেও, সুযোগ দেও, মানুষের প্রাণে সাড়া জাগাও। ১২টার পর পি. সাহা আসেন। লক্ষণ শোনেন...ওষুধ দেন...। মেঠে যে থেকে ওষুধ আনা হয়। বেলা ৪টায় ওষুধ খাওয়া হয়। রাত্রিতে শোওয়ার পূর্বে চীনা ঘাস...খাওয়া হয়। তেমন কিছু উপকার কোনও ওষুধেই এ যাবৎ বুঝা যায় নাই। রাত্রিতে প্রস্রাবে ছয় বার উঠি ৪টার পর। ঘাম একটু কম নাকি। সত্যব্রত ও সাবিত্রী সন্ধ্যার পর আসে। ১০৲ টাকা দিয়া যায়। বিমলা ও হরিদাসীর কাছে অসুখের খবর পোষ্টকার্ডে জানান হয়। ডাক্তার সাহা বেশ হাসিখুশী আছেন। আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বলি, কাজে থাকিলে ভাল থাকি। সন্ধ্যার পর নারকেলডাঙ্গা হইতে স্বাধীনতা উৎসবে বক্তৃতা দিবার জন্য আসিয়াছিল। পারিব না বলিয়া দেই। মনু একবার খবরও নেয় নাই। উহারা এত নিষ্ঠুর। আর তাহারও জন্য দৌড়াইয়া খবর নিবার শক্তিও নাই, ইচ্ছাও নাই। ১২ই আগষ্ট।

ঠাকুর, সারা জীবনের স্বপ্ন তুমি। তোমাকেই ব্যক্তিগত জীবনে সমাজ জীবনে রাষ্ট্র জীবনে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছি। তুমি অসাম্প্রদায়িক—সর্বসম্প্রদায়িক, পোষণমূর্তি। শোষণের বিরুদ্ধে—তাহা ব্যক্তি জীবনেই হউক বা বিশ্ব-জীবনে হউক—সারা জীবন সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছি। শোষণ করিতে পারি নাই বলিয়া কোথাও আমার স্থান হয় নাই। মহানির্বাণ মঠে যাহারা শোষণ করিতেছে, তাহারাই ট্রাস্টী হইবার যোগ্য। অথচ মঠের অভিকর কিছু করিলে সে নাকি ট্রাস্টী হইতে পারিবে না। ৫ টাকার ভোগ হইলেও লিস্ট পাঠাইয়া দিয়া এক সন্ধ্যার খাওয়া বাঁচায়। তুমি আমার আছ—এই-ই আমার সুখ। তোমাকে বুকে লইয়া যেন বাকী কয়টা দিন চলিতে পারি। এই করিও। প্রার্থনায় যোগ দেই নাই। কোনও উপকারই ওষুধ খাইয়া টের পাইতেছি না। সারাদিন প্রস্রাব করিতে ছুটাছুটি করিতে হয়। কি ভয়ই না করীয়ার হয়। সন্ধ্যায় সত্যব্রতের লোক ১০টি ডাব ও কয়েকটী পেয়ারা দিয়া যায়। চীনা ঘাস খাইয়াই বোধ হয় ১১টার পর প্রচুর ঘাম হয়। আমার খবর দিয়া মনোরঞ্জন বসুর নিকট এক চিঠি বুমার তাহার বাসায় দিয়া আসে। শোয়ার পর ৬/৭ বার উঠি। অক্ষয়বাবুকে কিছু দিয়া পি. সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া ব্যবস্থা করা ভাল। প্রতিদিন আজ রাত্রিতে উপরে শোয়। কে আমার কাছে থাকিবে, সকলেই যে অসুস্থ। মঠ হইতে কেহ আসিল না। নিশ্চয়ই তাহারা নীরঞ্জনবাবুর নিকট খবর পাইয়া থাকিবেন। ব্যাপারটা এমন হৃদয়হীন হইল? যিনি আমায় 'অন্ধ ভক্ত' বলিয়া মঠে খাও সেই নিত্যানন্দবাবুও ট্রাস্টি হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন? ২০ মাসের যাতায়াতের ফলে কি এতটুকু স্নেহ পাইবার অধিকারও লাভ হয় নাই। যাক! ঠাকুর আমায় আছেন, তাই সব আছে। ১৩ই আগষ্ট

নিত্যগোপাল, 'তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী। দেও দুঃখ দেও তাপ সকলি সহিব আমি।' 'ভয় কি, টেনে তুলব'—তোমার জলদগম্ভীর স্বরে এই বাণী সারা জীবন আমার পথ-চলায় প্রেরণা যোগাইয়াছে। বিশ্বাস করিব, আজও তোমার স্নেহ সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। নইলে কি আমি এত দূর আসিতে পারিতাম? এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া যাত্রা করিয়া একরূপ অক্ষত শরীরে আসার মূলে কি তোমার প্রেরণ

নাই? আমি তোমার, তুমি আমার—ইহাই আমার পথ-চলার চিরন্তন সবখানি কথা। তোমাকে ধরার বুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রাণপণ করিব। প্রার্থনায় যোগ দিতে পারি নাই। আজ সারাটী দিনই কমের দিকে ছিল। আলো খুব কম বিকালেও। রাত্রি ১টার পর একটু বাড়ে। ৫টা হইতে ৭টা পাঠ হয়। তারপর 'আত্মারামতা' পাঠ হয়। 'ভীর্থা কুরুন্ত' অংশ পাঠ হয়। তারপর কর্ম প্রারম্ভ হয়। ইহার সকল কর্মই সুশৃঙ্খল। উপোদ্ঘাতের 'উক্ত' পদের ব্যাখ্যা হয়। 'শ্রুত জ্ঞান প্রমাণ গোচরীভূত' পদের ব্যাখ্যা। 'প্রত্যক্ষাপেক্ষা অনুমানের যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য নয়' —নিত্যগোপাল। অথচ আচার্য শঙ্কর তাহাই করিয়াছেন। চার্বাক মানে প্রত্যক্ষ যুক্তি। নিত্য-গোপাল শঙ্কর-চার্বাকের সমন্বয় দর্শন প্রচার করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার দর্শনের অপূর্বত্ব। পাঠের পরই বিমলা আসে পুত্র মিঠির সহ। তাহার নিকট গোস্বামী মহাশয়ের শ্যামসুন্দরকে স্থাপিত করার কথা বলা হয়। সে পরিকল্পনাবাবদ ৫০ টাকা দিয়া যায়। হরিদাসী ও জয়া আসে। তাদের জন্য ৫০ টাকা দিয়া যায়। আমি এখন ভালই আছি। অনর্গল বলিয়া যাইতেছি সবাইকে সুধীর···আসে। পাঠও ভাল করিয়া ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন 'অনিকেত'। জগন্নাথ দেবই পথে দাঁড়ানো ঠাকুর। তিনি নিত্যই নব নব, চিরকালের আধুনিক, কলানিধি। Morality ও Art এর দ্বন্দ্বের কথা বলি। একটী সোবিউল ওষুধ বেশ কাজ করিয়াছে। ইহা আশ্চর্য! বিমলা আসিয়াছিল। ১৪ই আগষ্ট

ঠাকুর, তোমার জীবন ও দর্শনের দিকে চাহিলে আমার লেশমাত্র সন্দেহও থাকে না যে, আজ হউক কাল হউক বিশ্বে তোমার তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইবেই। এমন সংস্কারমুক্ত সহজ জীবন কাহারও তো দেখি না। ···আর তোমার? তোমার সকল নামে সমান রুচি, কালী নামে কৃষ্ণ নামে সমান সমাধি, বাহিরের আচারের কোনও বালাই নাই, কামিনী কাঞ্চনে ভীতির লেশমাত্র নাই। এমন জীবন না হইলে কি বর্তমান যুগের চলিবে? এ যে সংস্কার-মুক্তির যুগ, পাশ্চাত্যের সব বাচাই করিয়া লওয়া ও প্রাচ্যের অনুগত হইয়া মানার সমন্বয়ের যুগ। আজ স্বাধীনতা দিবস। তোমাকে বুকে লইয়াই ইহার ভিতর প্রাণ ঢালিয়া যুক্ত ছিলাম। আজ ভারতের বিজয়া দশমী, বিশ্ববাসীর কোলাকুলির দিন। তোমার আবির্ভাবে বিশ্ব প্রেমের বন্ধনে বদ্ধ হউক। সকালে মাখনবাবু আসেন। একটু বেলায় ধীরেন ও সুবোধ ডাক্তারবাবু। ৪ টায় রেণু পি গাহার কাছে যায়। বাহির হইয়া গিয়াছেন। আবার ৭টার পর যায়। ফেরে ৯টায়। এখন ওষুধ দিলেন না। ওষুধে যখন ফল হইয়াছে, তখন এখন ওষুধ খাওয়ার দরকার নাই। ৬ দিন পর খবর দিতে হইবে। রেণুর ভোর রাত্রিতে জ্বর হয়—১০১। আমি যে কি করিব বুঝিয়া উঠিতেছি না। আমার প্রস্রাবের অবস্থা কমের দিকে। আলাও কম। রাত্রির দিকে একটু সময় লাগিয়াছে, তাহাও পূর্বের মত নয়। পৈশাল বিনোদ ঘুঁইয়া প্রভৃতি আসে। সন্ধ্যার খবর পর্তুগীজ সৈন্য গোয়ার প্রবেশকারী নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর গুলি চালাইয়া ১০ জনকে নিহত করিয়াছে। ১৫ই আগষ্ট

ঠাকুর, আমাকে সত্যই আজ বুঝাইয়া দিতে

হইবে তোমার কি এই বিশেষ বুকে প্রতিষ্ঠিত হইবার সংকল্প আছে এবং আমার কি সেই দিক দিয়া করণীয় কিছু আছে? তোমার মঠ বলে—যে মঠ তোমার নয় এবং যাহা তুমি নও, আমি তোমার উপর সেই আমার মত চাপাইয়া চালাইতে চাহিতেছি। আমি তো অত চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না যে তুমি 'আমার নিতাগোপাল' ছাড়া অপর কিছু। বিশেষ করিয়া ইহাও বুঝিতেছি না, যদি আমার মত তোমার স্বীকৃত হইত, তবে তাহা 'প্রকৃতির এমন প্রতিকূলতার কাছে বাধা পাইতেছে কেন? সারা জীবন ঠেলাঠেলি করিলাম—বাধা, কেবল বাধা। রেণুর শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছে, কে আমার কাজ করিবে? যদি তোমার ইচ্ছা না থাকে আমাকে বুঝাইয়া দাও। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি এক পা-ও অগ্রসর হইতে চাহি না। আমি সরিয়া দাঁড়াই। তুমি বলিয়াছ, 'ভরত, তোমার যখন যাহা প্রয়োজন, ভগবান অন্তর্যামীরূপে তাহা যে যুগাইয়া দিতেছেন, তাহা কি তুমি টের পাও না?' তোমাকে বুঝাইয়া দেও ঠাকুর। সকালের প্রার্থনায় যোগ দেই না। সারাদিন একরূপ ভালই কাটিলাম। রেণুর জ্বর ১০১ হইয়াছিল, রাত্রিতে ১০৫ ডিগ্রে ৯৭°৪। বৈকালে মনোরঞ্জন বসু আসে। গোয়ার ৩৪ জন নিহত হওয়ার সংবাদে কলিকাতা বিক্ষুব্ধ হয়। কাল সর্বাত্মক হরতাল ঘোষিত হয়—ট্রাম বাস পর্যন্ত। রেণু অসুস্থ হইয়া পড়িলে কি উপায় হইবে ভাবিতে পারি না। এমনই একটি বিপদের মধ্যে কি পড়িব? সন্ধ্যায় কুমায়ের জালিকা টেলিগ্রাম দিয়াছে বাসন্তী কাল ডোরেরপাড়ীতে হাওড়া পৌঁছিবে। কাল হরতাল বন্ধ আজ রাত্রিতেই কুমায় হাওড়ায় গিয়া শুইয়া থাকে রেণুর জন্য বীরেনবাবুর ব্যবস্থামত medo....আনা হয়।...১৬ই আগষ্ট

ঠাকুর, আমাকে সত্য করিয়া বল—আমি যি তোমার ইচ্ছার পথে বাহির হইয়া তোমাকে ধরার বুকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করি, না ইহ আমার খেয়াল? আমি তো চিরকালের 'কুনো ব্যাঙ' জীবনে স্কুল আর বাসা। এমন যে সুদূর বাংলাদেশের নদীর পার, সেখানেই কি বছরে ১০/১ দিনের বেশী গিয়াছি? ঘরেই থাকিতাম। ছাত্র-ম মাষ্টারদের সঙ্গেও মেলামেশা করিতাম না। সেই দাদাদাদা (উমেশ চক্রবর্তীর) পাল্লায় পড়িয়া কলের রোগীর সেবায় কিছু দিন নিযুক্ত হইয়াছিলাম মাষ্টারী জীবনেও রজোগুণের জন্য স্বামী বিবেকা নন্দকে 'অসুর' বলিতাম। আজ সেই আমি-তাঁহার পথাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জাতি গঠনের কাজে ব্যাপৃত মনে পড়ে হুগলীতে তোমার সঙ্গে কথা। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'প্রকৃতি আমার মেয়েদে মত, অথচ আমাকে পুরুষ বানিয়েছেন। ইহার মীমাংসা কোথায়?' তুমি শুধু 'হো হো' করিয় উচ্চহাস্য করিয়াছিলে। আজ আমাকে স্পষ্ট করিয় বল আমার এই প্রচেষ্টা তোমার অনুমোদিত কিনা তোমার ইচ্ছা না থাকিলে আমি সে পথে যাইব না তোমার সঙ্গে লড়াই করা আমার কোনমতেই সাজে না। আমি ছাড়াছাড়ি করিব, প্রাকৃতিকতার সঙ্গে ঠেলাঠেলি করিব, আর তুমি বাঁশী বাজাইবে, এ হয় না। আমি পারিব না। আমাকে মুক্তি দেও খুব হরতাল হইয়াছে। এমনটি বুঝি হয় নাই ইহা স্বতঃস্ফূর্ত কম্যুনিষ্টরা বলে. নেহরু সরকারের বিরুদ্ধে হরতাল গোয়ার পুলিশী action নিয়া

পারীতে। মূর্খ তাহারা। এই হরতাল সমগ্র বিশ্বের কাছে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। রেণুর আজ আর জ্বর হয় নাই,....কুমার ছাওড়া হইতে ফেরে ৭ টার পর।....আমি বৈকালে ১০ মিনিটের জন্য কালীঘাট পার্কে ঘুরিয়া আসি। ভাল লাগিতেছিল না। ১৭ই আগষ্ট

ঠাকুর, যাহা কিছু হাতে তুলিয়া দিবে মাথায় পাতিয়া লব। তোমাকে আমি কি আর বলিব? তোমার ইচ্ছা পূরণ করাতেই আমার সার্থকতা। তোমার কি ইচ্ছা আমার জীবনে তাহাই আমি জানিতে চাই। তোমার সঙ্গে কোন কিছু লইয়াই তো দ্বিমত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, আমার পক্ষে কল্যাণকর নয়। তুমি আমি সর্বপ্রকারে এক অদ্বৈত হইব, ইহাতেই না আমার সার্থকতা: 'যাহাতে তোমারি হবে তারি তরে যা কিছু চাওয়া'। আমি তোমার শ্রীরাধা হইব। তোমার হাতের বাঁশীর মধুরসে আমাকে গড়িয়া তোল—আমার ইহাই কাতর নিবেদন। আমাকে ঘরের বাহির করিয়া তুমি কি আড়ালে থাকিতে পার? পারিলে বলিতে না, 'শরৎ, তুমি যখন যেখানে আছ, আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি। কোন্ পথে কোন্ কৌশলে তুমি আমাকে দিয়া তোমার ইচ্ছা পূরণ করাইয়া লইতেছ তাহা তুমিই জান। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। প্রার্থনায় যোগ দিতে পারি নাই। রেণু আজ ভাত খাইয়াছে দুই বেলাই, বাহির হয় নাই। বীরেন আসে কেমন আছি খবর নিতে। প্রেস হইতে প্রুফ দিয়া যায়, রাত্রিতে শোয়ার পর ১২টা, ৩টা, ৪টায় উঠি। ঘুম দেখিলাম বিলাত যাইতেছি। প্রথমে দেখি কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতেছি, শেষে দেখি সন্ন্যাসী বেশে প্রচার করিতে। একটা কাল ফেলে যাবার যোগাড় করিয়া দিতেছে। সারা জীবন এই যাত্রাই দেখিলাম। পথ-চলাই শিখিলাম। কাহার সঙ্গে কোথায় কতদূর যাইব জানিনা। এই তো আমার নিতাগোপাল। পথই —psychological line of development-ই —চিনি ভাল। আমার যাত্রা অনির্দেশের পথে যাত্রা। কাজেই কোনও লোক আমার সঙ্গে থাকিবে না: নূতন নূতন লোক আসিবে ও যাইবে। শেষ পর্যন্ত কাহারা থাকিবে জানি না। লোক আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে, আমি পথ বহিয়া চলিতেছি। সন্ধ্যার পর নীরদবরণ ভাই আসেন। স্ত্রীর সম্বন্ধে আমার বক্তব্য লিখিয়া দিতে বলেন। ম্যানেজার কখনও কার্যনির্বাহক কমিটির ex-officio member হইতে পারেন না। সন্ন্যাসীর লক্ষণ কি, তাহা নির্দেশ করিতে হইবে। যেখানে ঠাকুর আছিত প্রশ্ন, সেখানে আর কাহারও দীক্ষা দিবার অধিকার থাকিবে না। মঠের বাহিরে উপযুক্ত লোক—তা সংসারীই হউক বা সন্ন্যাসীই হউক—দিতে পারিবেন। গেরুয়া মানুষকে সন্ন্যাস দিতে পারে না। রেণু আজ Medorrhinum 1000 এক মাত্রা খায়। ১৮ই আগষ্ট

ঠাকুর, জীবনটাই আমার অনির্দেশের যাত্রা। দিতে হবে পাড়ি, এই মাত্র জানি, না জানি কোন্ ঘাটে হব পার। স্বপ্নে দেখি—জয়নগর গিয়াছি, সঙ্গে উষারাণী; কার কাছে গিয়াছি, কোথায় গিয়াছি জানা নাই। অথচ গিয়াছি ভাগবত পাঠ করিতে। তুমি আমার চির অনির্দেশ, অপরিচয়ের পরিচয়, তোমার সঙ্গে। কালীবাড়ী যাই, শুনি তুমি কৃষ্ণ-মন্দিরে, সেখানে গিয়া শুনি তুমি নির্জায়,

সেখানে যাইয়া শুনি তুমি মসজিদে।' নিত্য-গোপাল, তোমাকে কোথায় পাওয়া যায়! কোথায় পাওয়া যায় না বলিতে পার? কোনও ঠিকানা নাই, অথচ সব ঠিকানাই তোমার ঠিকানা। কৃষ্ণাম্বেষণ কি সহজ কথা! আমি তো তোমাকেই খুঁজিতেছি। কোথায়ও তুমি নাই, তুমি সর্বত্র। জীবনে বহু পাইলাম—তুমি ছাড়া। 'অত্যাগসহনঃ বন্ধুঃ'। কেহ বলিল না যে তোমাকে ছাড়িয়া কিছুতেই আমি যাইব না। হাজার হাজার মানুষ আসিয়াছে, জাগাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কেউ টেকে নাই। খবর দিলে খবর নেয়। না দিলে কয় জন নেয়? তুমিই আমার সত্য নিত্য বন্ধু। বৈকালে কেশব সান্যাল ও মুকুন্দ ঘোষ আসে। ২ ঘণ্টার উপর কথাবার্তা হয়। বিমল আসে। নীলুর চিঠি আসে, শরীর ভাল হয়। [নিত্যগোপালকে] ঠাকুরের গ্রন্থে আলোচনা করার কথা বলি। কেউ কিছু করুক বা না করুক, যে কিছু করিবেনা ভাবিয়া বাহিরের লোকের পরামর্শ না করা চরম নির্বুদ্ধিতা ...১৯শে আগষ্ট

ঠাকুর, সেই কবে ১৯১৯ এর ৯ই ফেব্রুয়ারী হরমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম—সামনে ছিলে তুমি, তোমার জীবন ও দর্শন। কোনও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সে সময়ে রূপ পরিগ্রহ করে নাই। কলিকাতা আসিলাম। একদিন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে দাঁড়াইয়া কর্মব্যস্ত জনস্রোতের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছি—আমি তো সকল কর্ম চুকাইয়া আসিয়াছি, অথচ আমার দিকে চাহিয়া আছে ৫টী প্রাণী অন্নবস্ত্র প্রভৃতির জন্য। বুক কাটিয়া ধ্বনি বাহির হইল 'অন্ন রাখে'। নিতাইবাবুর বাড়ী থাকি। নিতাইবাবু হঠাৎ বলিলেন, 'ঠাকুরের দর্শন অবলম্বনে বেদান্তের ভাষ্য লেখ।' বেদান্তের আলোচনা তাহার সঙ্গে হইত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমি পারিব?' উত্তর দিলেন, 'হাঁ পারিবে।' বলিলাম, 'আচ্ছা, পারিব।' কিন্তু বেদান্ত লিখিতে হইলে যে বিশ্রাম, যে অর্থ দরকার, তাহা কোথায়? নিতাইবাবু বলিলেন, শুনিয়াছি, দি আর দাস খুব দাতা, তাঁহার কাছে গেলে হয় না? বলিলাম, আমার ইচ্ছা নাই। প্রথমতঃ তাঁহার নিকট গেলেই তিনি বেদান্তের কি লিখিব জিজ্ঞাসা করিবেন। তাঁহার নিকট পরীক্ষা দিতে আমি প্রস্তুত নই। তিনি বেদান্তের কতটুকু জানেন? দ্বিতীয়তঃ তাঁহার নিকট গেলে প্রমাণিত হইবে, তাঁহার সাহায্যের আপন জনেরা কিছু করিল না, তোমরা হক-নাহাকা কিছু করিলে না। নিতাইবাবু বলিলেন, তবে থাক। তিনি ধনীবাবু প্রভৃতির কাছে আমাকে নিয়া গেলেন। ধনীবাবু ১০০৲ টাকা, দুর্গাবাবু ১০০ টাকা, এইভাবে ৬০০৲ টাকার ব্যবস্থা হইল। মাসে মাসে ৫০৲ টাকা হরিশালে যাইবে। এক বৎসরে বেদান্ত শেষ করিব। নিতাইবাবু এক রীম ফুলস্কেপ কাগজ কিনিয়া দিলেন। বরিশাল আসিলাম। তুমি সেদিন হইতেই বিশেষভাবে পথ আগলাইয়া রাখিয়াছ। তোমার সৃষ্টি অক্ষুণ্ণ হউক। ৯টায় অনাথবন্ধু তাহার স্ত্রী-পুত্রসহ আসে। ...সন্তোষ শাস্ত্রী আসে, বৈকালে সেবানন্দ আসে ...নিতান্তই (খাড়ু হারানর ব্যাপারে) কোনও লেখাপড়া করিয়া কিছু দিবে না। আমি ১০০৲ টাকা, ২ বারে পূজার আগে দিব। ইহাতে যদি ঐ লোক রাজী না হন, তাহারা যাহা পারেন করিবেন। দৈবক্রমে যাহা হইয়াছে, তাহার জন্য

ষোল আনা বাড়ী ভাড়া চলেনা। আর বড়জোর যায় যে ৪০০৲ টাকাই তাহার প্রমাণ কই? আমি অতি কষ্টে দিব। সকালে উষাঙ্গিনী নিত্যব্রতসহ বেহালা যায়। ...২০শে আগষ্ট

ঠাকুর, সত্যই তুমি সঙ্গে সঙ্গে ছিলে যারা জীবন—আজিও—নইলে কি বরিশালে স্ত্রী পুত্র কন্যার মধ্যে থাকিয়া সকাল হইতে খাওয়ার সময়টুকু বাদে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক বৎসর কাল নিশ্চিন্তে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখিতে পারিতাম? সামনে আমার কি ছিল? ১ বৎসরের জন্য ৬০০৲ টাকা বই তো নয়! তারপর? 'তারপরের' ভাবনা তো ভাবিতে চাহি নাই! লেখাই কি সহজ? শঙ্কর রামানুজ কাহাকেও তো সঙ্গে পাই নাই। তাঁহারা তো বিশেষ মতবাদের প্রচারক, আমি যে সমন্বয়বাদী। অধিরোহ অধ্যায় অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাষ্য লিখিতে লিখিতে কখনও কলম রাখিয়া মাথা মুড়িয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়িয়া থাকিতাম। তোমার আলো পাইতাম। আবার নূতন উদ্যমে রওয়ানা হইতাম। বুদ্ধ-বেদান্ত সমন্বয়, জৈন-বেদান্ত সমন্বয়, ন্যায়-বৈশেষিক-বেদান্ত সমন্বয়ের চেষ্টা কি কেহ এ যাবৎ করিয়াছেন? তোমার আশ্রিত আমি এই দুঃসাহসে বোধ হয় সর্ব প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা তুমি জান ও বিশ্ব জানে। তোমার জীবন-আশ্রমে প্রস্থান-ত্রয়ের ভাষ্য রচিত হইয়াছে। সামনে পিছনে বামে দক্ষিণে ছিলে আমাকে আবরণ করিয়া। সন্ধ্যার সময় সুরেশ ওস্তের মুদী দোকানে গিয়া কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিতাম। রাত্রিতে আর কিছু লিখিতাম না। ব্রজমোহন কলেজ লাইব্রেরী হইতে সুর্য সেন পুস্তক যোগাইত reference-এর জন্য। বন্ধু সুদেব সেন দিয়াছিলে ওদেশাওকরের ভাগবাটির কিনিবার টাকা। এই এক বৎসর ছিল আমার তপস্যার জীবন। সকল আত্মীয়-কাহারও আশীর্বাদ আমি পাইয়াছি। তাই তাঁহাদিগকে এই ব্রাহ্ম-চক্রে মিলাইতে পারিয়াছি। ইহা তাঁহারা স্বেচ্ছায় না করিলে আমি বুদ্ধি দিয়া পারিতাম? তোমার জয় হউক। ১টায় রেণু পি, সাহার ওখানে যাব। পূর্বের ওষুধই পুনঃ repeat করিতে বলে। কিং কোং হইতে ওষুধ কিনিয়া আনে। কাল সকালে খাইব। মনু আসে ৩টায়। পাঠ সুরু হয় ৪টায়। আজ পূর্বে ঈশ, পরে ভক্তিযোগ দর্শন। নাগরতন বাবু পরে আসিবেন এই জন্য। নীলরতনবাবু আসেন নাই মঠে তাঁহার সভা ছিল। সভাব্রতকে নিত্যব্রতর ব্যাপারে আলোচনার জন্য আসিতে পত্র দেই। ভাব পাঠায়, কাল আসিবে। অতুল ও বিনোদ ছুইয়া সভায় উপস্থিত হয়।.... ২১শে আগষ্ট

ঠাকুর, আবাল্য তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ। ১৩১২ সনের ১৩ই অগ্রহায়ণ দীক্ষার দিন তাহা প্রকটরূপ ধারণ করিয়াছে মাত্র। আমি চিরকাল ছিলাম কুণো, বাহিরের সঙ্গ কোনও দিনই পছন্দ করিতাম না। বরিশালে স্কুল আর বাসা, বাসা আর স্কুল সন্ধ্যাকালে ঘরে বসিয়া প্রার্থনা করিতাম। মা ঠাকুরের নাম লওয়া পছন্দ করিতেন। কোনও দিন ধূম পান করি নাই। শৈশবে একবার গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়া তামাকে টান দিয়াছিলাম। দাদা জানিয়া এক চড় দিয়াছিলেন। আর খাই নাই। গোপাল চক্রবর্তীর চণ্ডী টীকাশুদ্ধ কিনিয়া পূজার সময় মায়ের সামনে বসিয়া পড়িতাম। দুর্গাকে চিরকাল ভালবাসিতাম। জানিতাম না যে, তিনিই কুরুক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বরিশালে

যখন পড়িতাম তখন ছুটিতে বাড়ী আসার পর পশ্চিম বাড়ীর বকুল গাছে উঠিয়া বকুল ফুল পাড়িয়া মালা গাঁথিতাম। পুরোহিত ঠাকুরকে দিয়া সেই মালা কালাচাঁদের গলায় পরাইয়া দেখিতাম। কে জানিত এই অপরাধে কৃষ্ণ একদিন আমার পথে বাহির করিবেন! আজ আমার পথই সর্বস্ব। 'যাচী আর নাইরে' এই ত আমার ইতিহাস। মুখ বুজিয়া আঘাত সহিতেছি, আঘাত করি নাই। বাল্যকাল হইতেই বোধ হয় যাহাদের সঙ্গে মিশিতাম—যদিও তখন খুব অল্প লোকের সঙ্গেই মিশিতাম—তাহাদের সব কিছুকে নিজের মনে করিয়া চলিতে ভালবাসিতাম। আজিকার তাহার সকলের সঙ্গেই অন্তরঙ্গ হইয়া চলিতে চাহিতাম। বাল্যের বন্ধু ছিলেন ৺উমেশ সুর, আমাকে গাব পাড়িয়া খাওয়াইতেন। তাহাদের পরিবারের সঙ্গে খুব মেলামেশা করিতাম, বরিশাল ছাত্র জীবনে বিহারী লাল ঘোষের সঙ্গে—দুর্গাচরণ গুহঠাকুরতার বাসায় ছিলাম, তাহার পরিবারেরও ছিলাম আমি একজন। সন্ধ্যার পর সত্যব্রত ও বড় বৌ আসে। ঘড়ির মালিক যখন ৪০০৲ টাকা হইতে নামিয়া উহার দাম ২৫০৲ টাকা বলিতেছে, তখন আমাদের ১০০৲ টাকা দিবার আর কোনও নৈতিক দায়িত্ব নাই। কাল ঘড়ির প্রকৃত মূল্য জানিতে নিত্যব্রত বাহির হইবে। প্রস্তাবের অবস্থা একরূপ।...২২শে আগষ্ট

ঠাকুর, তোমার চরণ-প্রসাদে যাহাকে যখন ভালবাসিয়াছি, তাহাকে সমগ্রভাবে তাহার পারিবারিক জীবনসহ পাইতে চাহিয়াছি, তাহাকে নূতন করিয়া গড়িতে চাহিয়াছি। এ আমার সাড়া জীবনের ইতিহাস। সমগ্রই আমার প্রাণের সাধনীয়। যৌবনে যাহাদের সঙ্গে মিশিয়াছি, পাঠাবস্থায় ও চাকুরী অবস্থায়ও, তাহাদের পরিবারের সঙ্গে কি প্রাণ ঢালিয়া মিশিয়াছি। হাজারদাদা (উমেশ চক্রবর্তী, নারায়ণপুর, বরিশাল), লালমোহন সেন (নারায়ণপুর), অম্বিকা সেন (ঐ), অম্বিকা বাবু (ঐ), সূর্য সেন (দিঘলদুয়ার, প্রধান শিক্ষক, ব্রজমোহন স্কুল), যতেন্দ্র ঘোষ, সতীশ দাস, বনমালীবাবু (পাঠাবস্থা হইতে, রায়পাশা, বরিশাল), হেমন্ত দাস (বরদাখাম), বিমলা দাস (গৈলা), সুরেশ গুপ্ত (চাকুরী জীবনে, প্রচারক জীবনে, ও রাজনৈতিক জীবনে, গোপাল গুপ্ত হেম গাঙ্গুলী, প্রেম দাস, (কবিরাজ, বরেরা বরিশাল), হেম কবি, মুকুন্দ দাস, দুর্গামোহন সেন নগেন্দ্রবিজয় ভট্টাচার্য, যতীশের সুর (শ্যামপুর বরিশাল), সতীশ ও মনোমোহন কর্মকার, চক্রপাণি কবিরাজ প্রভৃতি আরও কত শত মানুষের সঙ্গে সমগ্রভাবে একাত্ম হইয়া মিশিতে চাহিয়াছি। 'আমি নিব বন্ত'। রাজনৈতিক জীবনে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর পরিবারের আমি একজন ছিলাম, তাহাদের বাসায় কতদিন তাহাদের একজন হইয়া ছিলাম প্রত্যেকের বাড়ীতে আমি গিয়াছি, খাইয়াছি আপনজনের মত চলিয়াছি। তোমার প্রসাদে আমি সকলের সঙ্গে মিশিয়াও ছিলাম তাহাদের অতীতে। তোমার জয় হউক। ৯টার পর আসে কিতীশ চক্রবর্তী। তারিণীবাবু বলিয়াছেন স্বতন্ত্র স্থান করিয়া আমি শ্যামসুন্দরানন্দের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়াছি, তাঁহারা ট্রাস্টী হইয়া মঠের স্বার্থ দেখেন না। আমাকে করিলে আমি বিপদে পড়িতাম বটে। ঠাকুর, তুমি রক্ষা করিয়াছ খাইতে বসিয়াছি এমন সময় হরিদাস চক্রবর্তী (সোনাতলা), পাবনা আসে। অভুক্ত। সে খাইবে

বসিবে তখন নবদ্বীপের যোগ-মায়া তাহার কন্যা জামাতা লইয়া আসে। তখন সকলের জন্য রান্না হয়। পরে চিনু আসে। জামাতা শচীন মৈত্র গ্রাহক হইবে। বৈকালে কাকরবার বসু ও অন্যান্য আসে। ..... সন্ধ্যার নীলরতনবাবু আসেন। নীলরতনবাবু আমাকে আপন মনে করেন, ঠাকুরের কিছু কাজ করিতে পারি ইহা বিশ্বাস করেন। ...বহুদূর নিত্যব্রত জানিল ঘড়ির দাম ১৭৲ টাকা। ২৩শে আগষ্ট

ঠাকুর, সারা জীবনই একরূপ সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিতাম। বরিশালে ৺দুর্গাচরণ গুহঠাকুরতা মহাশয়ের বাসায় থাকাকালীন তাঁহার মা-স্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গে কি ভাবেই মিশিতাম। তাঁহার মা যখন দুপুরে খাইতে বসিতেন, শনিবার সেই সময় ছুটি হইত। আমি তাঁহার পাতের কাছে বসিয়া 'দলা' খাইতাম। সব ভাল জিনিষ তাঁহারা দিতেন। মহিম দাস (ঠিকাবাসার পরিচালক) আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। আমি ছিলাম খুব পেটরোগা। কখনও পায়খানায় যাইবার পূর্বেই পথে বাহ্য করিয়া ফেলিতাম। মহিম কাপড় ধুইয়া দিত। মনে পড়ে সকালে মেথর দেখিয়া মনে মনে প্রণাম করিতাম। মেথর মায়ের কাজ করে কিনা। সেই বয়সে মায়ের কাছ ছাড়া হইয়া থাকিতাম। কখনও কখনও কেন কাঁদিতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু কাঁদিব কেমন করিয়া? কোনও দুঃখের কারণ তো ছিল না। তখন ভাবিতাম 'মা মরিয়াছেন'। ভাবিতে ভাবিতে কান্না আসিত। একদমে খুব কাঁদিয়া লইতাম। সেই কান্না আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। কান্না আমার ঘুচিল না। কান্না আমার চিরসাথী। যত কান্না কাঁদিয়াছি, মনে হয় কোন সদ্য বিধবা যুবতী বা সন্তানহারা মা এত কাঁদেন নাই। নয়নের বারি পূর্ণ করে কাড়ি কাড়ি সারি সারি সব রাখা হইয়াছে তোমার পা প্রক্ষালিব বলিয়া। তুমি চিরসঙ্গী ছিলে, তাই এত কান্না কাঁদিয়াও আজ দাঁড়াইয়া আছি। নিত্যব্রত ও কুমার ১০টার পর একবার ঘড়ির দাম জানিবার জন্য যায়।... রেণুর আজ ১৫ খানি বই রিভিউ করা হয়। জামালপুর বিশ্বাস উল্লুলতারতের গ্রাহকের ৪ টাকা M. O. করিয়া পাঠাইয়া লেখে, নিত্যগোপালকে সাধারণের কাছে তুলিয়া ধরিবার কাজ আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ পারেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করুন। এই দীক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত সকলের হইলে কাজ হইত। এই আবেষ্টন হইতে কিছু দিন দূরে থাকিলে একটু ভাল লাগিত বোধ হয়। কোথায় কাহার কাছে যাইব? কে দিবে টাকা? সত্যব্রত-মধুর ওখানেও তো কিছু দিনের জন্য থাকিতে পারিতাম। তাহা হইবে না। আমিও যাইব না। বাগুইআটীর ঘরটা বদি হইত। প্রস্রাব রাত্রিতে ১২।, ৩। ও ৫। টায় হয়। ২৪শে আগষ্ট

ঠাকুর, তোমার কৃপায় আমার নিজের মধ্যে থাকিবার একটা প্রবণতা ছিল বলিয়াই কেহ আমাকে পাইয়া বসিতে পারে নাই। প্রয়োজন বাড়ানোর ভিতর দিয়াই মানুষ অপরের মুঠার ভিতর আসিয়া পড়ে। প্রয়োজন যথা সম্ভব কমাইয়াই চলিয়াছি খাওয়ায় পরায়। চা-পান-তামাক খাই নাই। জীবনে একটি মাত্র কোট (তাহাও চাকায় ভগ্নিপতির দেওয়া) পরিয়াছি। চাদর গায়েই শিক্ষকতা করিয়াছি। ১৯০৬ সালে ১০৭ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে মেসে থাকাকালীন তৈল ব্যবহার ছাড়িয়া দিয়াছি।

বেরুনো সুবাদে স্নানের পুব ঝোপ আসিত। সাবান ব্যবহার কোনদিন করা নাই, গামছা আমার ছিল না। সব বিষয়ে এতই স্বাধীন ছিলাম যে, প্রী-প্রসাধন কাহারও তেমন কিছু করিতে হয় নাই। কোন কৃত্রিম অসুখও হয় নাই। কাপড়ের খোট গায়ে দিয়াই শীত কাটাইতাম। মনে পড়ে মা জোর করিয়া একটি গন্ধী কিনিয়া দিয়াছিলেন। আমি বুঝিয়াছি 'রেমেডয়া খাদয়ত: আত্মরামোঽপি অপ্রীতঃ' ব্যাকরণ মর্মার্থ। নইলে এত বৈচিত্র্যপূর্ণ জটিল পরিস্থিতির মধ্যে কোথায় কবে আটকাইয়া পড়িতাম! তুমি রক্ষা করিয়াছ। তোমার প্রয়োজনের ভিতর দিয়াই মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছি, আত্ম প্রয়োজনে নয়। সকলকে তোমার সেবক লাগাইবার জন্য টানাটানি করিয়াছি। স্ত্রী, পুত্রগণ, কন্যা, বড় বৌ, বাহিরের লোককে উপযুক্ত করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছি. মনুকে সেকালিকে বক্তৃতা শিখাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। সন্ধ্যার ঘড়ির লোকটি দুইটি যুবকসহ আসিয়া... ঘরকান্ন।... উষাঙ্গিনী মনুর ঘুমাতে সকালে গিয়াছে। তাহার শরীর ভাল নয়, এদিকে এইরূপ কথাবার্তা, আলোচনা করিবারও কেহ নাই। কি অসহায় আমি! ২৫শে আগষ্ট

ঠাকুর, দার্শনিক ভাবে ও ব্যবহারিক জীবনে 'জটিলতা' মানিয়া লইয়া ছিলাম বলিয়াই কি এত জটিলতার মধ্যে অসহায় অবস্থায় পড়িতেছি? অহঙ্কারপূর্বক বিদ্বেষ বুদ্ধিতে বা আরামের জন্য জটিলতা ছাটিয়া ফেলিয়া সহজ সরল ব্রহ্ম জ্ঞানের জন্য সাধনা করিলেই কি তাহা সহজ হইত? জটিলতা বা এ-জটিলতা দুই-ই অহঙ্কারীর পক্ষে সমান ভাবে জটিলতা। সকল জটিলতার মধ্যে থাকিয়াও যিনি সমাধানে-মুক্তি শ্রীরাধাকৃষ্ণকরী...। তিনি আশ্রিত করুণায় জীবনে আসিয়াছিলেন বলিয়াই তো জটিলতাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। তুমিও বলিয়াছিলে, 'ভয় কি? টেনে তুলব'। আমার একমাত্র ভরসা, তুমি, সব ঘটনার শেষ সমাধান তুমি। আজ যে তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন। আমি যে আর জটিলতার চাপ সহ্য করিতে পারিতেছি না। আসিয়াছ যদি, তোমার স্পর্শে সকল সমস্যার তোমাতে সমাধান হউক। 'চমসবদ্ব্যাপিত্বাচ্চ তদ্ব্যপদেশ'—ব্রহ্মসূত্র। রেণু মন্মথ বাবুর বাসায় যায়। সন্ধ্যায় উজ্জ্বলতারত্ন দিয়া যায়। ৯টার পর হঠাৎ ঘড়ির মালিকের একটি লোক নিত্যব্রতকে ডাকিয়া নেয়...। আজ রাত্রি ১০টা হইতে ৩টা পর্যন্ত এক টানা ঘুমাই। এইরূপ ঘুম কয়েকমাস যাবৎ ঘুমাই নাই। ২৬শে আগষ্ট

ঠাকুর, তোমার স্পর্শই আমার সকল সমস্যার সমাধান আনিয়া দিবে এই বিশ্বাস লইয়াই আমি এত জটিলতার ভিতর দিয়া চলিয়াছি। হইয়াছেও প্রচুর। যখন আমার দৈহিক শক্তি সামর্থ্য ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, তখনও সেই স্পর্শকেই জীবন্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি। সাগরের স্পর্শ আলিঙ্গন যেমন নদীর পক্ষে জীবন, আমার পক্ষেও তুমি তাহাই। আমার জীবনে প্রকাশিত হইয়া তোমার ইচ্ছানুরূপ ভাবে আমার জীবন গড়িয়া তোল। কি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, কি সৎ কি অসৎ তুমিই জান। তোমার মানদণ্ডই চলিবে, আমার কিংবা অপর কাহারও নয়। তোমার মানেই আমার মান, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। দুইবারে ১০টা ও ৩টায় উজ্জ্বলতারত্ন পোষ্ট করা হয়। বৈকালে মাখনবাবু আসে। অমিতাভ সুজাতা আসে। উষাঙ্গিনী

বেহালা যায়। রাত্রিতে সেখানে থাকে। সত্যব্রত একবার সন্ধ্যার পর আসে। আমার এখানের কোনও ঘটনার সঙ্গে জড়াইয়া পড়া উচিত নয়। সাক্ষীর মত থাকা চলিতে পারে। নচেৎ চলিয়া যাওয়া উচিত। এই বয়স, শরীর অসুস্থ। ইহাতে আমার পাঠপ্রচার লইয়া থাকাই কর্তব্য। সংসারের মানুষ যেরূপ লোভী, দুর্বৃত্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে ইহাদের ব্যাপারের মধ্যে পড়িলে কি চলিতে পারিব? আমার পথ এক-তরফা চলিবার পথ। মানুষের পথ tit for tat-এর পথ। উহারা তাহা না হইলে টিকিতেও পারে না। যাহারা মধ্যম স্তরের ভাল মানুষ তাহারা ভালমানুষ হইয়া বিপন্ন। তাহাদের বাধ্য হইয়াই অনেক সময় tit for tat নীতি গ্রহণ করিতে হয়। তাই গান্ধীজী সমষ্টিগত সাধনার কথা আনিলেন। সমষ্টি সত্যপরায়ণ হইতে পারে। ব্যষ্টিকে শিবাজীর মত হইতেই হয় দুষ্টের ছাত্রে থাকিতে হইলে। আজ রেণু 'মহারাষ্ট্রপ্রভাত' হইতে পড়িয়া শুনায়। দেশবন্ধু-সুভাষ tit for tat-এর স্তরের। তাঁহাদের no method is too mean বাঙ্গলাদেশের বর্তমান দুর্নীতির জন্য দায়ী। ইতিহাস ইহা একদিন বলিবেই। ২৭শে আগষ্ট

ক্রমশঃ

সে কি স্বপ্ন শুধু?

শ্রীশান্তশীল দাশ

মানুষের মন হতে হিংসা ও বিদ্বেষ
কোন দিন যাবে না কি? এই হানাহানি,
প্রতিদিন রক্তপাত আর হাহাকার
চারিধারে; দীর্ঘশ্বাস আকাশে বাতাসে—
এর শেষ কবে হবে? কবে এ পৃথিবী
হবে এক স্নিগ্ধ দীপ্ত শান্তি নিকেতন?
যেখানে আঘাত নেই, মানুষের হাতে
মানুষের এ লাঞ্ছনা, হিংসা রক্তপাত।
মিলেমিশে এক সাথে যেখানে মানুষ
থাকবে প্রসন্ন মনে হাসিহাসি মুখ।
স্বপ্নে ভুষ্ট জীবনের দিনগুলি কেটে
যাবে এই ধরণীর কল্যাণ চিন্তায়,
আর দুটি হাত সদা মগ্ন শুভব্রতে—
সে-দিন কি আসবে না? সে কি স্বপ্ন শুধু?

২৪ পরগণা জেলার অধিবাসীদের বিশেষ দায়িত্ব

- পশ্চিমবাঙ্গের বৃহত্তম আপনার ২৪ পরগণা জেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের বাস।

- বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতি গোষ্ঠী ও বিভিন্ন ভাষাভাষী নাগরিকদের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

- দেখবেন আপনার ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উৎসব অপরের অশান্তির কারণ যেন না হয়।

- আপনার এলাকায় শান্তি বজায় রাখুন এবং শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সরকারের সাথে সহযোগিতা করুন।

২৪ পরগণা জেলা তথ্য ও জনসংযোগ সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

গীতাচার্য্য ব্রহ্মচারী জগদীশচন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা

মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা-টিপ্পনী, ভাষ্য-সহস্রাধিক ও বিস্তৃত মূল্যবান ভূমিকাসহ। শঙ্কর, শ্রীধর, বলদেব, বঙ্কিম, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গীতাচার্যদের তুলনালোচনা পূর্বক সম্পাদিত। অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা ও ভক্তিমূলক উপসংহার। অ্যাকেট সহ ভালো কাপড়ে বাঁধাই ১৫·০০ টাকা। প্লাস্টিকের অ্যাকেট সহ ১৭·০০ টাকা।

শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। "তাঁর শ্রীগীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ। "যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলাভাষায় শ্রীজগদীশ চন্দ্রের গীতা। "যতদিন বাংলাভাষা থাকবে, জগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা থাকবে, জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।" ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

গীতার অন্যান্য সংস্করণ

বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০	নিত্য পাঠ্য গীতা	৩·৫০
মধ্যম পকেট গীতা	২·৫০	সহজপাঠ্য ক্ষুদ্র গীতা	১·০০
ক্ষুদ্র গীতা	২·৫০	ঐ প্লাস্টিক অ্যাকেট সহ	১·৫০

জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত গীতা	১৫·০০	ভারত আত্মার বাণী	
ধর্মবাণী	১·৫০	Soul of India Speaks	
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	শিক্ষার্থীর ব্রহ্মচর্য	

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০		
বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০		
বিজ্ঞানে বাঙালী	৫·০০		
বাংলার ঋষি	৫·০০		
বাংলার বিদুষী	৩·৫০		
বাংলার মনীষী	২·৫০		
জীবন গড়া	০·৭৫		
রাজর্ষি রামমোহন	৩·০০		
আচার্য জগদীশ	৪·০০		
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২·৫০		
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০		
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০		

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ বি. টি.

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৩·০০
মানুষের মত মানুষ	১·৩০
বঙ্কিমের গল্প	১৫০
বিদ্যাসাগর	৩·০০

ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের

শরীর ও শক্তি	৩·০০
নীরোগদেহে দীর্ঘ জীবন	২·৫০
সরল যোগ-ব্যায়াম	৩·০০
যোগ-ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩·০০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৩·০০
যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৫·০০

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৪·০০

সর্বদা-ব্যবহার্য মধ্যমাকৃতি অভিনব বাংলা অভিধান। পরিবর্ধিত সংস্করণ। শব্দসংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

"ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রেই বর্ত্তমান সময়ে কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয় হইলেও হইতে পারে। বৃহৎ ক্ষেত্রে সম্ভব হইবার দিন আজও আসে নাই। যতখানি জ্ঞান ও প্রেমের গভীরতা থাকিলে বৃহৎ কর্ম্মের বহির্মুখী টান সামাল দেওয়া সম্ভব, ততখানি গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান বা প্রেম লাভ করিবার সময় আজিও আসে নাই। তাহা যদি হইত, তবে আমার নরনারায়ণ আশ্রম এত ক্ষীণ-কলেবর হইত না। জ্ঞান-প্রেমের ভাবুকতা লইয়া থাকিলেও লোক আসিত, কর্ম্ম-ক্ষেত্রের প্রসার থাকিলেও লোক আসিত। কিন্তু জ্ঞান-প্রেম লইয়া কাজ করিবার মত যোগ্য মানুষ আজিও গড়িয়া উঠে নাই। দু'টীই সমন্বিত হইতে চাহি-তেছে বলিয়াই মধ্যে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজিও ইহা দানা বাঁধে নাই। ইহার জন্য একটি দার্শনিক বিপ্লবের সমাজের উপর দিয়া বহিয়া যাওয়া প্রয়োজন। নরনারায়ণ আশ্রমের তো ইহাই ছিল কাজ। সে কি তাহা পারিবে?"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ,

২৪শে জুলাই ১৯৪৭

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে।

"On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious man will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man namely the exploitation of man by man.

Occasional Speeches--Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে নিযুক্ত হতে পারে, তার ইঙ্গিত পাবেন নীচের বইগুলিতে

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

॥ মুদ্রিত ॥		॥ পাণ্ডুলিপি ॥
১। ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)		১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	২·২৫	৩। দশ বৎসরের দিনপঞ্জী, পত্রাবলী, ভাষণ ইত্যাদি।
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)	৮·০০	
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	৭·০০	
২। ঈশোপনিষৎ	২·০০	
৩। কেনোপনিষৎ	১·০০	॥ শ্রীপ্রতিভা রায়ের ॥
৪। কঠোপনিষৎ	৩·০০	
৫। প্রশ্নোপনিষৎ	১·০০	১। নারী-প্রগতির জন্মকথা
৬। ঐতরেয়োপনিষৎ	১·৭৫	২। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ		নিতাগোপাল ও শিষ্যা সুধার কথা।
৭। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ		৩। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
৮। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ		
মুণ্ডকোপনিষৎ		
৯। শ্রীনিতাগোপাল	··	॥ শ্রীমতী রেণু মিত্রের ॥
১০। স্বরাজের পথ	·৫০	
১১। গীতাজয়ন্তী	·০৬	১। সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিতাগোপাল
১২। উজ্জ্বলতারত (পত্রিকা)	·৫০	২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে
১৩। মহাত্মাজীর [illegible] সম্বন্ধে		৩। শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন
পুরুষোত্তমানন্দজীর আলোচনা	৫·০০	ওরিয়েন্ট বুক কোং প্রকাশিত
(গান্ধী আশ্রমিক কর্তৃক প্রকাশিত)		৪। রবীন্দ্র-হৃদয় ৫·০০
১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১২·০০	৫। প্রাথমিক শিক্ষা ৪·০০

13 MAR 1976

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি, পো: অশ্বিনীনগর, (ডায়মণ্ড-দেশবন্ধুনগর, কলিকাতা-৫৯) ২৪ পরগণা।

শ্রীবিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পো: অশ্বিনীনগর, কলিকাতা-৫৯ হইতে প্রকাশিত, প্রিন্টিং সেন্টার, (৩/৩, কে, বি, লাইব্রেরী) হাতিবাড়া, হইতে মুদ্রিত।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত-প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

। শ্রীশ্রীবিভাগোপাল-বাণী ।

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
বহু-একত্ব সমন্বয়। দ্বৈতে-
অদ্বৈতের সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্ব-নাগরিক"

"এই বিশ্বই আমার মহাপীঠ"

চৈত্র-বৈশাখ ১৩৮২-৮৩, ১৯৭৬ সম্পাদিকা—রেণু মিত্র ২১তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

গ্রীষ্মকালে শীতল আরাম

পিপ্‌ট্‌ ১৪
সাইজ ২-৬, ৭-১০

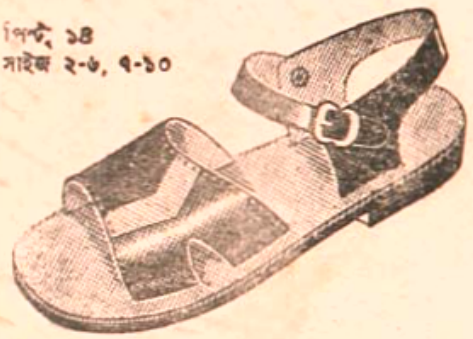

ক্লাসমেট ৪৮
সাইজ ২-৫

জুবিলী ৫৯
সাইজ ৫-১০

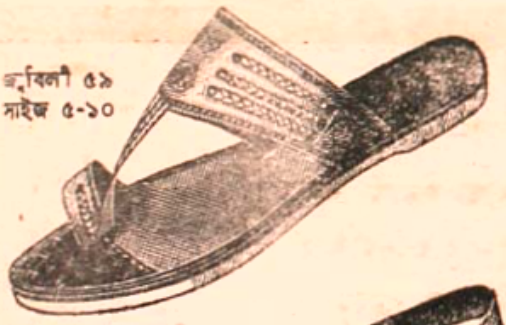

রাখি ৬২
সাইজ ২-৭

ক্যোভাদিস ১২
সাইজ ৫-১০

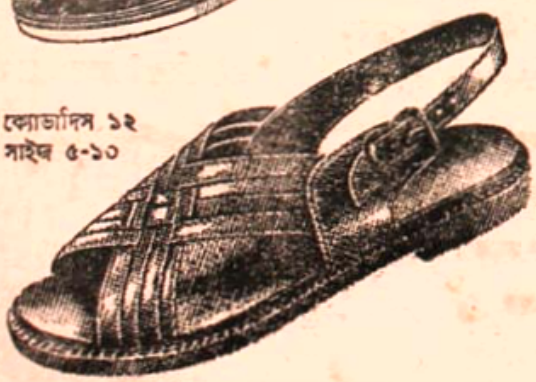

সানওয়ে ৬৩
সাইজ ৫-১০

Bata

উজ্জ্বলভারত

চৈত্র-বৈশাখ, ১৩৮১-৮৫, খ্রী: ১৯৭৬ ঊনত্রিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

যুগ-চিত্তে শ্রীনিত্যগোপাল

শ্রীরেণু মিত্র

"নির্গুণের ভাবে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ প্রভাবিত না হইলে বর্তমান পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র বাঁচিবে কি করিয়া? সর্বগুণ-সমন্বয়ই নির্গুণ। পারম্পরিক একটা নূতন বিন্যাসের নামই সমন্বয়। দৈবী ও আসুরী সম্পদের সমন্বয়ে পুরুষোত্তম-দেহ গঠিত। শ্রীনিত্যগোপাল সমাজকে এই নির্গুণের মূল তাৎপর্য ও সাধনা শিখাইতে আসিয়াছেন। নির্গুণের ক্ষেত্রেই প্রতি বর্ণ সর্ব বর্ণ, প্রতি আশ্রম সর্বাশ্রম। এই স্তরে ব্রাহ্মণ সর্ব বর্ণ, ক্ষত্রিয় সর্ব বর্ণ, বৈশ্য সর্ব বর্ণ, শূদ্র সর্ব বর্ণ। সত্ত্বগুণের স্তরে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই, শূদ্র শূদ্রই। ইহাতে কোনও অখণ্ড সুস্থ সমাজ গড়িতে পারে না। সমাজকে সমাজপদবাচ্য হইতে গেলেই তাহাকে নির্গুণ হইতে হইবে। শ্রীনিত্যগোপালের স্পর্শ ব্যতীত ইহা হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।"— শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ, ৩রা জুলাই ১৯৪৭

গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজম যা দিয়েই বর্তমান সময়ের সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করা যাক না কেন— যে চেষ্টা বিশ্ব সভ্যতার শেষ ধাপ পর্যন্ত অনেক খানি হয়েছে— তেমন একটা সন্তোষ-জনক ফল পাওয়া যায় নি আজপর্যন্ত, প্রযুক্তিবিদ্যা বা বিজ্ঞানের যত উন্নতিই হোক না কেন। তাই সর্ব মানুষের সর্বাঙ্গীণ সার্থকতার উপরের কথাটি কি সভ্যতার কাছে এ জিজ্ঞাসা উচ্চারিত হয়ে গেছে। সেই পরের কথাটির কিছু রয়েছে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের উপরোক্ত উক্তিতে। তাঁর মতে— —এক কথায় সমাজকে নির্গুণ হতে হবে। নির্গুণ হওয়া কি রকম? গুণের অনুপস্থিতি নির্গুণত্ব নয়— সর্বগুণ সমন্বয়ই নির্গুণত্ব। কোন একটা গুণ দিয়ে মানুষ তৈরী নয় তাই কোন একটা গুণকেই অতিমূল্য বা কম মূল্য দেওয়া চলবে না, প্রতিটী গুণের যথার্থ মূল্য দিয়ে যখন তিনটি গুণই ব্যক্তি-জীবনে সমন্বিত হবে এবং তারই ফলস্বরূপ সমাজ-জীবনেও সমন্বিত হবে, তখনই সমাজ নির্গুণ হবে। এই চিন্তাধারাটা যখন মানুষের বোধের মধ্যে তথা আচরণের মধ্যে সহজ হবে তখনই মানুষের বর্তমানকালীন সমস্যাগুলির সমাধান হওয়া সম্ভব হবে। সেই নির্গুণ স্তরে প্রতি বর্ণ সর্ববর্ণ অর্থাৎ প্রত্যেকের মধ্যেই ত্র স্বরূপ ক্ষত্রিয়ত্ব বৈশ্যত্ব শূদ্রত্ব রয়েছে— অবশ্য সবগুলির প্রকাশ সকলের মধ্যে সমভাবে বা একই ভাবে থাকা সম্ভব বা স্বাভাবিক নয়— কারো মধ্যে কোনটা কম বেশী অবশ্যই থাকবে— কিন্তু প্রত্যেককেই প্রত্যেকটাকে সমমূল্যে স্বীকার করে নিতে হবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে সাড়া দেবার মত দেহ মনের নমনীয়তা রক্ষা করতে প্রয়াস পেতে হবে। এই চিন্তাধারায় কেউ শুধু ব্রাহ্মণ, বা শুধু ক্ষত্রিয় বা শুধু বৈশ্য বা শুধু শূদ্র হতে পারবে না। সাত্ত্বিকতার প্রকাশ অধ্যয়ন অধ্যাপনার মধ্যে— কিন্তু একজন উচ্চ চিন্তাশীল ব্যক্তিকেও যেমন খেতে হয়, ঘুমোতে হয় তেমনি যাকে বলে শূদ্রের কাজ— অর্থাৎ সেবা বা পরিশ্রম, আমরা যাকে নীচু কাজ বলে জানি

সেই সব কাজের জন্যও তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে —মানসিক ভাবে এবং দেহের অভ্যাসের দ্বারাও। আবার তেমনি ক্ষুদ্র বলে যে পরিচিত – কায়িক শ্রম বা নীচু কাজ যে করবে বলে কথা, তাকেও উচ্চ চিন্তার অধিকার ও সুযোগ সমান ভাবেই দিতে হবে। কেবল তাই নয়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে তা রাখতে হবে। সর্বক্ষণ-সমন্বয়ই পুরুষোত্তমত্ব। সেখানেই কোন একের ঐকান্তিকতায় বিহ্বলতা ভাঙ্গা হয়ে গেছে। কোন গুণের ঐকান্তিকতাদ্বারা মানুষের মানসিকতায় ভারসাম্য রক্ষিত হয় না বলে তা মানুষকে সুস্থ করে না, স্বস্তিও দেয় না। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে যে-বিষয় নিয়ে তার দেহমন সংগ্রহ সত্তা গঠিত, তার সব কিছুর সুসমঞ্জস বিকাশ। এতেই শুধু মানুষকে সুস্থ রাখতে পারে। মানুষ তার আবেগকে যদি অতি মূল্য দিয়ে অতিরিক্ত বাড়িয়ে তোলে, তাহলে যেমন তার জুটবে না খাঁটি সোনালি আনন্দ, তেমনি আবেগ-জীবনটাকে দলিত মথিত করে সে যদি বুদ্ধিকেই শুধু স্থান দিয়ে চলে, তাও খাঁটি সোনালি আনন্দ থেকে তাকে অনেকখানি দূরে রাখবে। মানুষের বুদ্ধিকে যেমন শুদ্ধ করতে হবে, তেমনি তার আবেগ-প্রবণতাকেও শুদ্ধ করতে হবে এবং এই দুই-ই শুদ্ধ হয়ে গিয়ে বিশ্বরূপের স্তরে, সামঞ্জস্যের সমন্বয়ের স্তরে। আর সেই স্তরই নির্গুণ স্তর। সত্ত্বগুণের-স্তর হচ্ছে কোন একটি বিশেষের স্তর। কোন একটি বিশেষই যখন স্বীকৃতি ও মূল্যপ্রাপ্ত না হয়ে সব বিশেষগুলিই স্বীকৃত ও যথা মূল্যপ্রাপ্ত হয় —তখনই সেটা সত্ত্বগুণের স্তরকে সার্থক করে নির্গুণ হয়ে দাঁড়ায়। এই চিন্তাধারার মধ্যেই রয়েছে মানুষের সমস্যার সমাধান—এবং এইখানেই মানুষ 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' হয়ে ব্রহ্মত্ব লাভ করে।

—এই চিন্তাধারার দৃষ্টান্ত সমন্বয়মূর্তি যোগাচার্য শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব। জড়ের ক্ষেত্রেও তিনি সহজ বিচরণকারী, অজড়ের ক্ষেত্রেও তাঁর পূর্ণ অধিকার—তিনি আমাদের মত সামান্য মানুষকেও আপন জ্ঞানে কোলে তুলে নেন, অভয় দেন, আশ্রয় দেন, আনন্দিত করেন; আবার মুহূর্মুহুঃ নির্বিকল্প সমাধিস্থ হয়ে সব কিছুর অতীতে চলে যেতেও তিনি অতিসক্ষম পারঙ্গম। এমনটি না হলে প্রতিটি গুণকে সার্থক করে নিগুণাবস্থা আসবে কি করে? আজকের মানুষের তো এইখানে উত্তরণেরই আহ্বান সভ্যতার স্তরে স্তরে। তাই তো শক্তিমদে মত্ত বিজ্ঞানী পাশ্চাত্য তার সমস্ত সম্পদ ও কর্মশক্তি সত্ত্বেও প্রশান্ত চিত্তের গ্লানি দূর করতে পারে নি—জগতের আনন্দ-যজ্ঞের প্রসাদ লাভ করতে পারে নি। আর ভারতবর্ষ তার সকল আধ্যাত্মিকতা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের জড়বাদের আকর্ষণকে পরিপাক করতে না পেরে তার কাছে নিজেকে বলি দিয়েছে। যে আধ্যাত্মিকতার সম্পদ তার ছিল, ঠিক তাই দিয়েও তো জড়বাদকে পরিপাক করা গেল না। আজকে সে যা করেছে তা তো জড়ীয় সভ্যতার কাছে আত্মবিক্রয়। এর মধ্যে ভারতবর্ষের সত্তা কোথায়, প্রেম কোথায়, পবিত্রতা কোথায়? এই-ই কি ভারতবর্ষ! অথচ সেদিনের আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষেও মানুষ মানুষকে জন্মগত কারণে ঘৃণা করে ছোট বড়, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য করে রেখেছিল কেন? যে পাপ আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের রক্তের মধ্যে? সেদিনের আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ নারীকে নরের সমকক্ষবিলুপ্ত করে দিয়ে তার মাতৃত্বকে ধূলায় লুটিয়ে

দিয়েছিল কেন? অথচ আজকের ভারতবর্ষের চেহারা দেখেও তো আঁতকে শিউরে উঠতে হয়। আজকে নারী যা কিছু হয়েছে তার মধ্যেই বা সত্য প্রেম, পবিত্রতা কোথায়? ওর নাম স্বাধীনতা? নারীর স্বধর্ম যে প্রাণ, সেই প্রাণ বাদ দিয়ে বুদ্ধিমান হওয়ার সাধনা নিয়েই তো নারী অসুন্দর হয়ে গেল— প্রাণ-প্রধান নারীর বুদ্ধি দরকার কিন্তু প্রাণ বাদ দিয়ে নয়— এই সঙ্গে বলা যায় পুরুষও বুদ্ধি-প্রধান, কিন্তু প্রাণকে সঙ্গে না রাখলেই সে বুদ্ধি হয়ে পড়ে শোষণের যন্ত্র। কি পুরুষ কি নারী, কি ধনিক কি শ্রমিক, কি উচ্চবর্ণ কি নিম্নবর্ণ প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র হয়েও পরতন্ত্র এই সত্য কথাটা মনে রেখে জীবনে না চললেই যে কোন ঐকদেশিকতার অসৌন্দর্যে জীবন ভরে ওঠে। সভ্যতার মধ্যে যে কোন ঐকদেশিকতাকে বাদ দিতে বলে শ্রীশ্রীনিতাই-গোপাল পরস্পর-বিরুদ্ধকে পরম সমন্বয় করতে বললেন। সমস্ত উপাধির নিরসন হয়ে সেইখানে নির্গুণের স্ফুরণ ওঠে। সামগ্রিকতার, সর্ব সমন্বয়ের এই পথ ছাড়া বহু ঐকদেশিক পথে চলেই তো দেখা গেল, তাতে এর থেকে বেশী সংখ্যক সমস্যার সমাধান হয় না। এইজন্য আজকের যুগদেবতা শ্রীশ্রীনিতাগোপাল। তিনি সত্ত্বগুণী, রজোগুণী, তমোগুণী; অর্থাৎ তিনি জ্ঞানানন্দ, তিনি ভক্তির অধিকারী, তিনি সেবাপরায়ণ; তাই কোন গুণ কোন বৃত্তিতে তাঁর একচেটিয়া অধিকার নয়, আবার কোনটার দাবীও তিনি করেন না। এই মানসিকতা আজকের দিনে সাধনার বস্তু— এই মানসিকতাই সমাজ ও সভ্যতার কাছে শ্রীনিতাগোপালের অবদান।

আজকের সভ্যতার কিসের অভাব? জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিদ্যা শিল্প সাহিত্য সবই আজ পাওয়া যাবে, যা পাওয়া যাচ্ছে না তা হচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রীতি, পারস্পরিকতা, বিশ্বাস এবং সততা। বহিরঙ্গের সাজসজ্জা, আর বিজ্ঞাপনীর কারদাদুরস্ত মুখের ভাষার অন্তরালে সত্যিকারের মানুষটি যে কি বস্তু— আজকের মানুষ তা নিজেই জানে না। তার দেহ সাজানো, ঘর সাজানো—কিন্তু তার অন্তরটিতে কি কি বস্তু রয়েছে তাদের মোহন চেহারাটা সম্বন্ধে সে নিজেই সচেতন নয়। আজকের সভ্যতার সমস্যা—এইটেইটিতি, রেডিয়া প্রভৃতি কত কিছু দিয়ে তার ঘর দুয়ার দেহ সাজানো কিন্তু তার মনটা কি এমন সুন্দর? সে কি মানুষমাত্রকে ভালবাসে? অপরের সুখে সে কি সুখী হয়? অপরের দুঃখে মুখের ভাষায় নয়, সে কি সত্যিকারের বেদনায় কাতর হয়? শ্রীশ্রীনিতাগোপাল এইখানে আমাদের পথ দেখিয়ে গেছেন— তিনি অনেক বড়, তাঁর ব্যক্তিগত বস্তুবিষয় যোগাড়ের তাগিদ নেই— অথচ তিনি সমস্ত মানুষকে এমন প্রাণঢালা ভালবাসতে পারেন, যা আমরা দেখি না, পাই না, পারি না। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অকপট প্রেম সমস্ত মানুষকে এমন করে আকর্ষণ করত যা বিস্ময়ের বস্তু। সেইজন্যই তো তিনি বড়। আমরা ক্ষুদ্র, তাই আমাদের আকর্ষণ করবার ক্ষমতা দুই চারি জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ— তা-ও আবার তাদেরই মধ্যে যারা স্বেচ্ছাভাবে আমাদের অধীন থাকবে। কিন্তু শ্রীনিতাগোপাল ভালবাসেন অধীন করে নয়, অপরের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেই। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীনিত্যগোপালের এই জীবন-দর্শনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'লড়াই-এর মধ্যে ও জীবন লইয়া চলিয়াছি। খাঁচার বাঘকে খাঁচা হইতে মুক্তি দিয়া অরণ্যে মোটা ডাণ্ডা করিয়া তবে তাহার সঙ্গে লড়াই করিয়াছি। এই লড়াই বৃন্দাবনে লিখিয়াছি। রাসলীলা এই লড়াই ও জয়ের ছবি। এ দেশ বিষয়কে দার্শনিক ভাষায় 'bad name' দিয়া, তাহাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া নিপীড়িত করিয়া, বিষয়ের দাঁত নখ ভাঙিয়া বিষয়-জয়ের, বিষয়কে hang করিবার সাধনা করিয়াছে। হয়তো জয় করিয়াছে। কিন্তু এই বিজয় কি বিষয় মানিয়া লইয়াছে? আজ কালের সুযোগ পাইয়া বিষয় 'ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি'কে চালিয়া ধরিয়াছে। তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। নারীজাতি ছিল এ দেশে খাঁচায়-পোষা বাঘ। এই বাঘকে মুক্তি দিয়া, আক্রমণের সব সুযোগ সুবিধা তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বীরবান শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে জয় করিলেন। 'Give the dog a bad name and then hang'—ইহাই তো বুদ্ধিমানদের রাজনীতি। সবলকে দুর্বল না করিয়া কেহ সবলের সঙ্গে লড়াই করিতে চায় না।.... হৃদয়ের সাধনায় দুই-ই মোটা ডাণ্ডা থাকিয়া লড়াইয়ের জিদ্ দিয়া পরস্পরকে আপন করিবে। প্রেমের সাধনা এই লড়াইয়ের সাধনা'। (১২।৬।১৯৫৭)

—শ্রীনিত্যগোপাল এই সাধনার দর্শন রেখে গেছেন। এই অবস্থা দান করে—মোটা ডাণ্ডা সজীব রেখে অপরকে নিপীড়ন, অধীন না করে হৃদয়ের সহজ প্রীতির সাধনা বর্তমান বিশ্ব চায়—কিন্তু এখনও এ চিন্তাধারা মানুষের সচেতন চাওয়ার স্তরে এসে পৌঁছায় নি—তাই শ্রীনিত্যগোপাল তাঁর ১২৮ বৎসর আবির্ভাব সত্ত্বেও সাধারণ রাম-শ্যামমধুমধু থেকেও অপরিচিত। কিন্তু রবীন্দ্র-নজরুল সাহিত্যের অনুসন্ধান করলে এই হৃদয়ের সাধনা পাওয়া যাবে, বিশ্বের যাবতীয় চিন্তাশীলদের রচনায় এই ধ্বনি, এই ইঙ্গিত। শ্রীনিত্যগোপাল-প্রতিষ্ঠাপিত এই জীবন ও দর্শন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ভারতীয় প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে—বেদান্ত, ১১ খানা প্রধান উপনিষৎ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মধ্যে—রেখে গেছেন। মানুষের চিন্তাধারায় ক্রমে তা স্পষ্ট রূপ নেবে।

আজকের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কি? জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্যে কিম্বা যে বিষয়ে উৎকর্ষ বা নিপুণতা যুগে যুগে পূর্বেও এসেছে—কিন্তু নরনারী, কুলীন অকুলীন, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্বিশেষে সকলের তরেই যে এই সকল বিভাগের দুয়ার খুলে গেল, সকলের মধ্যে দিয়েই যে আজ ভগবান প্রকাশিত হতে চাইছেন—আজকের সভ্যতার এইটাই বৈশিষ্ট্য। আবির্ভূত ভগবান আজ সকলের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন—সবলে তাঁকে সর্বতোভাবে আত্মদান করবে এইটে আজকের সভ্যতার বিশেষ কথা।

এই বৈশিষ্ট্যকে রূপ দিতে, এবটি মুক্ত আনন্দিত জীবন সম্বন্ধে কত কথা শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল তাঁর ছোট ছোট কথা দিয়ে প্রকাশ করে গেছেন। তার কয়েকটি উদ্ধৃত করি :—

'অন্যের সুখে সুখবোধ হইলে, অন্যের দুঃখে ব্যথা হইলে, অন্যের পুণ্যে হর্ষ হইলে এবং অন্যের পাপে উপেক্ষা করিলে চিত্তে যে এক অপূর্ব অমল ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহার তুলনা নাই।

সে ভাব প্রফুল্লতাময় চিত্ত প্রসাদ। সেই ভাবময় চিত্ত-প্রসাদই সমাধির জনক।'

'জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র সত্য চন্দ্র নয়। দূর হইতে মরুভূমির স্বচ্ছ বালুকারাশি দেখিয়া মৃগের জলবোধ হয়। বালুকার প্রদেশ সত্য, সেটী যাহা তাহা সত্য, কিন্তু জল-ভ্রমটা মিথ্যা। জগৎ সত্য, কিন্তু মায়াবশতঃ জগৎকে আমাদের যাহা বোধ হয় তাহা মিথ্যা।'

'জীবের জীবনে যাহা ঘটে তাহা ঘটিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াই তাহা ঘটিয়া থাকে। জীবের জীবনে যখন কোন বিপদ ঘটে তখন তাহাও ঘটিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াই ঘটিয়া থাকে।'

'শূদ্র নারায়ণকে স্পর্শ করিলে নারায়ণ অপবিত্র হন, একথা সঙ্গত নহে। পরম পবিত্র যে নারায়ণ, তাঁহাকে চণ্ডাল স্পর্শ করিলে পর্যন্ত সে পবিত্র হয়।'

'দোষ কিছুই নয়। সচ্চিদানন্দকে যাহাতে ভাবিবার ব্যাঘাত হয়, তাহাই দোষ। আহারই হোক আর বিহারই হোক।'

'এই জগৎ আমার সম্বন্ধে একটি পবিত্র তীর্থ।'

'এক বীজ-বৃক্ষ হয়। সেই বৃক্ষ হইতে আবার বহু বীজের প্রকাশ হয়। বিশ্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই বিশ্বরূপে পরিণত হন। সেই বিশ্ব হইতেই একই বিশ্বেশ্বর বহু বিশ্বেশ্বররূপে প্রকাশিত হন।'

'প্রকৃত মহাপুরুষ সকল সম্প্রদায়ী অথচ তাঁহার কোন সম্প্রদায় নাই।'

'শেষ মীমাংসা কোন বিষয়েরই হইতে পারে না।'

যুগ-চেতনার এই নিগূঢ় সূত্রের বাণী যিনি প্রক্ষেপন করে গেছেন সেই শ্রীশ্রীনিতাগোপাল ১১২ বৎসর আগে বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে আবির্ভূত হয়ে মাত্র ৫৭টি বৎসর দেহে ছিলেন। তাঁর সর্বক্ষেত্রে সহজ বিচরণশীলতার নমনধর্ম তাঁর দেহের অপরূপ কান্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁকে অনন্তসাধারণ করে রেখেছে—কিন্তু তাঁর ব্যাপক গভীর চিন্তা ও জীবন-ধারা আগামী যুগের জন্য বলেই তিনি অপরিচিত হয়ে আছেন আজও। আজকের এই বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে অপরিচিত এই মহান মধুর অনবদ্য মানুষটিকে আমাদের সকল সত্তার প্রণাম জানাই—যুগ-চিত্তে তাঁর সামগ্রিক জীবনতত্ত্ব প্রস্ফুটিত হয়ে উঠুক—মানুষ হৃদয়ের সাধনা নিয়ে সর্বক্ষেত্রে সহজ জীবনের প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হোক—যাতে আসবে দেহ মনের শান্তি, স্বস্তি, তৃপ্তি, আনন্দ। মানুষের সভ্যতা তো এই-ই চায়।

"শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন এই সকল বিশ্বের নিগূঢ় পরিবিধান করিতে।"

অচিন্ত্য-স্মৃতি-চারণ

—শ্রীসুন্দরমোহন কাব্যতীর্থ

বাণীর কমলকুঞ্জের শ্বেত শতদলটি হঠাৎ ডুবে গেল। অস্তমিত হ'ল সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। 'অখণ্ড অমিয়ের' প্রণেতা অচিন্ত্য কুমার অমৃতলোকে যাত্রা করলেন। বাঙ্ময়ীর শুচিস্নাত অঙ্গনে যখন অশ্লীলতার স্রোত বইতে লাগল তখন কল্লোল যুগের এই কীর্তিমান পুরুষ নতুন কল্লোল তুলে সাহিত্যক্ষেত্রে ভক্তির মন্দাকিনী স্রোত ভগীরথের মত আবার বয়ে আনলেন। তাই আজ তাঁর তিরোধানে বঙ্গে যেন শেলাঘাত অনুভব করছি। তবু কবি করুণানিধানের ভাষায় বলি—

ধূলি পার্থিব ধূলি

মাহেন্দ্র যোগে মহাপ্রস্থান আনন্দ-ধ্বজা তুলি।

১৯০৩ সনে পরম রসবেত্তা অচিন্ত্যকুমার ভূমিষ্ঠ হন এরূপ সমুদ্র-মেখলা নোয়াখালিতে। কৈশোরের কিশলয় পর্বে পরিণত হয় তখনকার জলবায়ু-তেই। প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব বর্ষেই তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় উচ্চশ্রেণীর মাসিক 'প্রবাসী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় নীহারিকা দেবীর ছদ্মনামে। তৎপর সমুদ্রোপকূল পরিত্যাগ করে অচিন্ত্যকুমার হুগলীর তীরে বাঁধেন আপন নীড়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ পরীক্ষায় হন উত্তীর্ণ। কয়েক বছরের মধ্যে কৃতিত্বের সঙ্গে বি, এল, উপাধি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নান্তে তাঁর কর্মজীবনের যাত্রা শুরু হয় মুন্সেফরূপে। মুন্সেফের পর তাঁকে আমরা দেখতে পাই ন্যায়াধীশের পুণ্যাসনে—সাবজজ ও জেলা জজরূপে। সর্বক্ষেত্রেই উড্ডীন হয়েছে তাঁর সাফল্যের ধ্বজা। ঐ সমস্ত পদে সমাসীন থাকাকালীন তিনি পেয়েছিলেন জীবনের বিচিত্র রূপ, রস, গন্ধ—যা পরবর্তীকালে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়।

কর্ম-জীবনের মাঝে মাঝে চলেছে সাহিত্য-সাধনা। প্রথম দিকে সৃষ্টি হয়েছে অজস্র কবিতা। 'নীলাকাশ' 'প্রিয়া ও পৃথিবী' 'অমাবস্যা' 'আজন্ম সুরভী' তাঁর উল্লেখযোগ্য অনুপম কাব্যগ্রন্থ। প্রতি কবিতায় ছন্দিত নূপুরে বাণী বন্দনের অপরূপ বাসনা। মকরন্দ নিষ্যন্দী কবিতার কয়েকটি কলি পরিবেশন করি—

পল্লবরাগ তাম্র অধরে কার তরে এত মধু—
কার করে লীলাকমল তুমি গো, কার তুমি লীলাবধূ—
তনু তট উচ্ছল
শিশির শীতল কপোলে পড়েছে বিচূর্ণ কুন্তল।

উত্তরকালে কথাশিল্পী হিসাবে উত্তুঙ্গ শীর্ষে আরূঢ় হলেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবিতাকে তিনি ভুলতে পারেন নি। বাণীর প্রসাদী ফুল তাঁর শিরে ঝরে পড়েছে—কাব্য-সাধনায় সিদ্ধ সাধক রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত।

সেনগুপ্ত মশায়ের প্রথম উপন্যাস 'বেদে'। এর পর একে একে 'যখন বিবি', 'ডবলডেকার' 'কাক-জ্যোৎস্না' 'আদমুক্ত' 'উর্ণনাভ', 'ইন্দ্রাণী' প্রকাশিত হয়। সমাজ জীবনের অভাব ও অনীহা, অপূর্ণ

ও অপব্যয় আনন্দ ও উল্লাসের চিত্র বিচিত্র হয়ে উঠে। সৌখিন মজদুরী রচনায় তিনি কোনদিন ব্যাপৃত থাকেন নি। পূর্ববঙ্গের নরনারীর কথা অচিন্ত্য কুমারই প্রথম প্রাণের প্রীতি মাখিয়ে আমাদের মধ্যে পরিবেশন করেছেন।

অচিন্ত্যকুমার ছিলেন কুশলী শিল্পী। তাঁর প্রতিভার রশ্মি সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হয়েছে। যাতে হাত দিয়েছেন তাই অমৃতময় হয়ে উঠেছে। তাই ত ছন্দের ঢেউ তুলে বলতে ইচ্ছা করে—

শিবসুন্দরের সে যে রূপকার নিপুণ নিখুঁত দৃষ্টি ;
প্রতি রচনায় রুচি আনে তাই রয়েছে অমৃত-সৃষ্টি।

গল্পও তিনি অল্প লিখেন নি। 'কেরোসিন-টৈকে' তাঁর একটি অনবদ্য সৃষ্টি। 'মার্ড সাহেবের কথা'ই কি বিস্মৃত হওয়া যায়! নিজস্ব বচন ভঙ্গিতে প্রতিটি রচনাই পরম উপভোগ্য। সন্তোষ কুমার ঘোষ মশায়ের ভাষায়, "তাঁর এক একটি গল্প এক একটি বিস্ময়।"

প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় পা দিলে অচিন্ত্যকুমারের চিন্তার নব দিগন্ত খুলে যায়। তাঁর লেখনী যাদু-দণ্ড স্পর্শ করে জীবন-সাহিত্যকে। অমিয় ঢেলে বুদ্ধি সৃষ্টি করেন 'অখণ্ড অমিয়', পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। সারস্বত মণ্ডলী তাঁকে সংবর্দ্ধনায় বরণ করেন। অমৃত লেখনী থেকে আরও অমৃত পুরুষদের জীবনালেখ্য দিনে দিনে ফুটে উঠে। রবীন্দ্র-জীবন নিয়ে লেখেন 'ভাগবতী-তনু', জননী সারদামণির কাহিনী নিয়ে রচনা করেন পরমা-প্রকৃতি। মনে হয় প্রতি সৃষ্টিতেই যেন সুধার নির্ঝর রয়েছে।

১৯৬১ সনে এই প্রজ্ঞালোকিত পুরুষ সাহিত্য-কর্মের জন্য 'মতিলাল স্মৃতি' পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। অনলদ তাঁর লেখনী—হাত দিয়েছিলেন 'উদ্ধৃত খড়্গের' তৃতীয় খণ্ডে, তুমা পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ রচনাতেও মন দিয়েছিলেন। সৃষ্টি ছিল কয়েকটি প্রবন্ধ নিবন্ধেও। কিন্তু তার পূর্ব্বেই বিধাতা পুরুষের ডাক পড়ল—তা আর শেষ করে যেতে পারলেন না। কিন্তু যা রেখে গেলেন তাই—কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে থাকবে। কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ দত্তকবি সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন তারই পুণরাবৃত্তি ক'রে বলি—

"তুমি বঙ্গ ভারতীর তন্ত্রী' পরে
একটি অপূর্ব্ব তন্ত্র এনেছিলে পরাবার তরে।
সে তন্ত্র হয়েছে বাঁধা ; আজ হ'তে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে।

'শ্রীকৃষ্ণই একাধারে শঙ্কর-দর্শন, চার্বাক-দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের মূর্ত্তিমান দৃষ্টান্ত।'

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

১৯৫৫

ঠাকুর, এই সংসারে মানুষের বুদ্ধির সত্যও মিথ্যা, মিথ্যাও মিথ্যা। তোমার সত্যই সত্য, তোমার মিথ্যাই মিথ্যা। কী যে সত্য, কী যে মিথ্যা তুমিই তাহা জান। উপনিষৎ শোনান, তুমি 'সত্যং চ অনৃতং চ'। তুমি তাই যুধিষ্ঠিরকে 'অশ্বত্থামা হতঃ' বলিতে নির্দেশ দিয়াছিলে। বিশ্ব-কল্যাণের জন্য, ভূতহিতার্থে যে অযথার্থ ভাষণ তাহাও সত্য। তবে যাহারা আত্মকৈন্দ্রিক জীবন যাপন করে তাহাদের পক্ষে প্রচলিত সত্য পন্থা অবলম্বন করা উচিত। মিথ্যার পথ বিপজ্জনক পরিত্যাজ্য। কিন্তু বিষও তো অমৃতে পরিণত করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ তাহা পারিতেন। তাঁহার কৃপা-প্রাপ্ত পুরুষেরাও পারেন। এই বিষ প্রয়োগ করিতে হইলে সদ্ বৈদ্যের সদ্ গুরুর প্রয়োজন হয়। 'অশ্বত্থামা হত' এই বাণীর পশ্চাতে ছিল শ্রীকৃষ্ণ-নির্দেশ। যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ-নির্দেশের মর্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন, 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ'। শ্রীকৃষ্ণ-নির্দেশ লঙ্ঘন করার জন্যই যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন হইয়াছিল ইহা শ্রীনিতাগোপাল বলেন। 'সত্যমেব জয়তু'—তোমার সত্যই জয়যুক্ত হউক। উষালিপী বেহালা হইতে আসে। পরিমল ও নীলু আসে একটার পর। জয়া আসে ৪টার পর। পাঠ হয়—'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং' প্রভৃতি শ্লোকগুলির মধ্য হইতে প্রথমেই 'মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ' এই পদটি তুলিয়া লইয়া ঠাকুর ব্যাখ্যা সুরু করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের আলোতেই অদ্বেষ্টা, করুণ, মিত্র, উদাসীন প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই standard, আমার বুদ্ধি প্রকৃত standard নয়। তত্ত্বজ্ঞান হইতে মিথ্যা-জ্ঞানের অপায়। 'দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তিদোষ মিথ্যা-জ্ঞানানাং উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াৎ অপবর্গ'। 'কারণাভাবাৎ কার্যাভাবঃ ন তু কার্যাভাবাৎ কারণাভাবঃ'। এ দুঃখ দূর করার চেষ্টা কার্যকে লোপ করিবার চেষ্টা মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান হইলে দুঃখজন্ম দিব্য রূপে ফুটিয়া উঠে। ঈশোপনিষদের 'আবাস্যং' পদের ব্যাখ্যা আরম্ভ হয়। বেণু ৯টায় পি, সাহা ডাক্তারের ওখানে যায়। ওষুধ দেন না, আগামী রবি সোমে যাইতে বলেন। শ্রীকৃষ্ণের করুণ হওয়া ও আমাদের করুণ হওয়া আকাশ পাতাল প্রভেদ। 'উদাসীনঃ অরিবৎ বর্জ্যঃ' —ভাগবত। 'উদাসীনঃ বিপক্ষসুহৃৎপক্ষঃ'। শ্রীকৃষ্ণ যে স্তরের উদাসীন, সেইরূপ উদাসীনই আমাদিগকে হইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনই গীতা-জীবন

২৮শে আগষ্ট

ঠাকুর, তোমার বিশ্ব-নাগরিক অবধূত জীবনের সঙ্গে আমার জীবন যুক্ত থাকুক, তুমি আমার জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হও যেমন সাগর অনুপ্রবিষ্ট হয় নদীর বুকে। তুমি আমার অণুতে অণুতে রক্তধারায় প্রবিষ্ট হইয়া আমার জীবনকে তোমার জীবনে গড়িয়া তোল, যেন আমি তুমি বনিয়া যাই। তোমার সহিত সম্পর্কান্বিত নহে কি আমার প্রাণ - বুদ্ধি-মন-স্বাস্থ্য-ধন-অপত্য-বনাদি আমার কাছে প্রিয়? আমার জীবনের প্রতিটি স্তরে

তোমাকে ঘন করিয়া না পাইলে তোমাকে পাইবার সাধ মিটিবেনা। রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে শব্দে, আমার সকল বাহিরে আমার অন্তরকে পাইব, তবে না আমার অন্তর বাহির এক হইবে, যেখানে তুমি প্রকাশিত হইবে? গোড়ায় যিনি নির্গুণ, সর্বভূতের ক্ষেত্রেই তিনি নির্গুণ-ঘন সগুণ। আমার এ দ্বিমুখিনী প্রাপ্তি আমার জীবনে বাস্তব হউক। ২১ টায় পর রমাপতিবাবু আসেন। স্কীম পাইয়া কি কি ব্যাপার চলিতেছে তাহা শুনি। ট্রাস্টিগণ যে একটী কমিটী তৈয়ার করিয়া দিয়াছে, তাহার অধিকাংশ রমাপতিবাবুদের। মহেশ্বরানন্দের হাতের আমলা দাদের করা হইয়াছে। বৈকালে নিত্যগোপাল রায় আসেন। তাহার বড় ছেলে লইয়া সমস্যা দেখা দিয়াছে। সে উচ্ছৃঙ্খল খাঁকিবাজ। ২ বার তিনি চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন, আবার ডাকিয়াছেন। আর কাহেরাখা সম্ভব হইতেছে না। মাঝে মাঝে আলোচনা করিতে বলিলাম। বিমল আজি প্রণাম করিয়া গেল। অতুলবাবু চিঠি দিয়াছেন, বাগুইআটির জমির allocation আরম্ভ হইয়াছে। দলিল লইয়া যাওয়া প্রয়োজন। কাল যাইবে। শীঘ্র বীরেনের সঙ্গে যায় তাহার বাসায় ছেলেদের জামার মাপ আনিতে। ২৯শে আগষ্ট

ঠাকুর, প্রার্থনার সময় প্রত্যুষে উহারা যখন গান করে 'জয় নিত্যগোপাল', তখন বুকটার ভিতর কাঁদিয়া উঠে। কৈ তোমায় জয় তো বিশ্বের বুকে দাঁড়াইয়া দিতে পারিলাম না? অথচ সেই আশাই তো ছিল। ঘরে শুধু বলি, পত্রিকায় মাঝেমাঝে বলি। তোমার অতুলনীয় দর্শন কোথায় পাইব? গীতার 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতে ন কাঙ্ক্ষতে, সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্' এই শ্লোকটীই বলিয়াছে ভক্তির মধ্যে ব্রহ্ম হওয়ার কথা। কিন্তু কোনও ভক্ত কি আজ পর্যন্ত অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ভক্তির এমন নিবিড় অঙ্গাঙ্গি যোগ স্থাপন করিয়াছে? তুমি ধন্য, তোমাকে পাইয়া আমিও ধন্য। কিন্তু তোমাকে তো বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হইয়া পাইলাম না? আমার বড় কষ্ট। তোমার সেবার জন্য মানুষ লইয়া টানাটানি করিয়াছি। আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। আমি আজিও পথে দাঁড়াইয়া আছি। কত মানুষের উপর কত নির্ভর করিয়াছিলাম, সব আমার বৃথিসাৎ হইয়াছে। কেহ বুঝি আমার নাই, আর কেহ বুঝি আমার হইবেও না। কেহ কি আমার চোখের জল মুছাইতে আসিল বা পড়িল মনে আমাকে আগলাইয়া? তোমার কি ইচ্ছা তুমি জান। তোমার জয় হউক আমার জীবনে।.. সন্ধ্যার দিকে বেশ কষ্ট হয়।...'সহশিক্ষা ও তাহার ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে শুরু করি আশ্বিন মাসের জন্য।.... রেণুর ২৫টা বই রিভিউ করা হইয়াছে। কুমার বলিল লইয়া সকালে বাগুইআটী গিয়া হল..। ৩০শে আগষ্ট

ঠাকুর, তোমার কৃপায় প্রকৃতি পুরুষ দুইকেই সমান মর্যাদা দিতে শিখিয়াছি এবং জীবনে তাহার প্রয়োগও করিতে চাহিয়াছি। তবুও প্রকৃতি পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হইবে সম ভাবে সম মূল্যে, রাধারাণী না তাহার যোগসূত্র? অথবা প্রকৃতির পরিণামের ভিতর পুরুষ অন্তর্যামী যখন তখন পুরুষ যদি প্রকৃতির কাজে intervention করেন, তাহাতে পুরুষের মহিমা বাড়িতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির মাধুর্য বিলুপ্ত হয়। প্রকৃতি পুরুষ প্রেমযোগে পরস্পরের মধ্যে গলিয়া গিয়া

সৌম্য হইবেন, নিত্যগোপাল হইবেন, সত্যরূপে ফুটিয়া উঠিবেন— ইহাই না ছিল আমার জীবনের লক্ষ্য? ম্যাজিক আমি চাই না— চাই ম্যাজিক-লজিকের সমন্বয় অর্থাৎ যোগমায়া। পুরুষ প্রকৃতির পশ্চাতে থাকিয়া প্রকৃতিকে পরিণত করিবেন, প্রকৃতিও পুরুষের সকল অঙ্গ নিংড়াইয়া সৃষ্টি করিবেন। সারা জীবন 'সঙ্ঘ' 'সঙ্ঘ' করিয়া ঘুরিলাম। কোন মানুষকে পাইতে হইলে তাহার আবেষ্টনশুদ্ধ পরিবারশুদ্ধ পাইতে হয়। আমার সামান্য জীবনের ইতিহাস তো ইহাই। ওগো সঙ্ঘ-রূপী নিত্যগোপাল, ধরা দেও। কত আর ধৈর্য ধরিব? তুমি বলিয়াছিলে, সখে, ধৈর্য ধর' আজও বুক বাঁধিয়া চলিয়াছি তোমার পথের দিকে তাকাইয়া। 'সহশিক্ষা ও তাহার ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধ শেষ করি। সন্ধ্যায় নবদ্বীপের অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য আসে। সে রাত্রিতে এখানে থাকে। বাকি ১৫৲ টাকা দেয়। সে মাছ ২৲ গোল্লা দই আনে। আরও ২৲ টাকা দেয় ঠাকুরের কথাবার্তা হয়। নীলরতনবাবু দার্জিলিং হইতে যে পত্র দিয়াছেন তাহা খুব ভাল লাগিল। উহার ভিতর দিয়া ঠাকুরের স্পর্শ পাইলাম। আমি তো এই সম্প্রদায়ের একক। নীলরতনবাবু আমাকে চান। তিনি ছোট ভাইয়ের মতন আমার অনুগামী হইয়া থাকিতে চান্। ঠাকুর তাঁহার কল্যাণ করিবেন। ঠাকুরের অন্ততঃ এক-জন শিষ্য আমাকে চান। ইহা ঠাকুরের কীর্তি। ওসে আপদ।

ঠাকুর, তোমার উপর যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে। 'পারে রাখ বা না রাখ হরি সে ইচ্ছা তোমার'। আমার তো তুমি ছাড়া গতি নাই। তোমার বুদ্ধি আমার হউক। তোমার বুদ্ধি দিয়া তোমাকে, তোমার বিশ্বকে ও নিজেকে বুঝিব। আমি কি আর আছি? আছ তুমি। তোমার থাকাতেই আমার সত্তিকারের থাকা, তোমার থাকার মধ্যেই আমার থাকার রস। আমি তোমার মধ্যে তুমি হইয়া তোমার বিস্তার ও গভীরতা লাভ করিব, তন্ময় হইব। আমি তোমার তুমি হইয়া তোমার রূপ-গুণ-লীলাকথা কহিব বিশ্বমানবের সহিত একাত্ম হইয়া। রূপে ও স্বরূপে তোমাকে পাওয়া ও বিশ্বকে পাওয়ানো ছাড়া আমার আর কিছুতেই তৃপ্তি নাই, স্বস্তি নাই। তোমার মত বর্তমান যুগের উপযোগী দর্শন ও তাহাকে জীবনে আয়ত্ত করার কৌশল কে বলিয়াছে বা বলিতে পারে? একমাত্র তুমি কাম-কাঞ্চন-ভীত নও। মদনমোহন তোমার জয় হউক। ওগো নির্ভীক, ওগো দুঃসাহসী, তোমার জয় হউক। অমরেন্দ্র ১০টায় খাওয়ার পর চলিয়া যায়। এখানে কিছু সাহায্যের কথা বলিয়াছি। দিবে। প্রায় ১২ টায় বিভা সরকার আসে।....কুমার আশ্বিনের কপি প্রেসে দিয়া আসে। সন্ধ্যার পর অমিতাভ সুজাতা আসে।....জীবনে কাহারও আমার জন্য কোন কিছু করাকে ছোট করিয়া দেখি নাই। এত লোকের এত করার মধ্যে আমি বাস করিতেছি। তাহারাই আমার 'আমি'র স্রষ্টা। তাহাদিগকে লইয়াই আমি আমি। আমার যাহা দিয়াছ তাহাও তাহাদের। যে প্রাণ লইয়া শ্রী পুত্র কন্যাদের সুধাংশু-কুসুম-প্রতিভা-রেণু-নীলু-মিনুকে ঠাকুরের সেবার জন্য টানাটানি করিয়াছি ও করিতেছি তাহা আমার প্রাণই শুধু জানে। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। মূল কাইনালের কর্তৃপক্ষের রেণু ৭ দিন সময়ের জন্য চিঠি দেয় গতকাল। ১লা সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, এতদিন মানুষ চাহিয়াছে তাহার অতীত ও বর্তমান জীবনের অনেক ঘটনাকে ছাঁটকাট দিয়া, shortcut করিয়া নিজের ইচ্ছানুরূপ 'ফল' মিলাইতে, মধ্যবর্তী process বাদ দিয়া ফলে পৌঁছিতে যেমন শিশু ৫—৮-কে ৫+৮ করিয়া একটা ফলে পৌঁছিতে চায়। কেননা ছোট সংখ্যা হইতে বড় সংখ্যা বাদ দেওয়ার অর্থ সে জানে না; তাহার ধারণা বড় সংখ্যা হইতেই ছোট সংখ্যা বিয়োগ করা চলে। অথচ তাহাকে জ্ঞান লভ্য ফলেও তো পৌঁছিতে হইবে। তাই সে কল্পনায়ও ৫—৮-কে ৫+৮ লিখিয়া নিশ্চিন্তে ১৩-তে পৌঁছিল, 'ফল' ঠিক করিল। দুনিয়ার বোকা মানুষ এইরূপই তো করে। বাপ মা বাদ দিয়া স্ত্রীকে লইয়া ফল মিলায়, আমার দীর্ঘ দিনের স্পর্শকে অস্বীকার করিয়া কত মানুষ 'ফল' মিলাইতে চায়। জীবনের অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সব ঘটনার স্বয়ংমূল্য স্বীকার করিয়া তবে ফলে পৌঁছাইতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানীরাও এই shortcut করিতে চাহিয়াছেন। পুরুষোত্তম শিখাইয়াছেন সমগ্রকে স্বীকার করিয়া সমগ্র হইতে সমগ্র পথে সমগ্রকে পাওয়া। ইহাই উত্তর মীমাংসা, পুরুষোত্তম মীমাংসা, নিত্যগোপাল-মীমাংসা। আজ নীলরতন বাবুর চিঠির উত্তর এনভেলাপে দেই। কোনও সম্পর্ককে আমি ব্রহ্ম-মূল্য ছাড়া অন্য কোন মূল্যে দেখি নাই। সেই জন্য সব সম্পর্কের ভিতর ডুবিতে পারিতাম, অথচ নির্লিপ্ত ছিলাম। সুরেশের ছোট বোনের মৃত্যুর পূর্বে চতুর্থ ভেজ টাকা দিয়াছি, তাহার ভাগিনেয়ীর বিবাহে আমার লাইফ ইনসুরেন্স হইতে ১০০৲ টাকা দিতে অসুবিধা বোধ করি নাই। কাহারও সুখের অংশ আমি নিতে যাই নাই। আমি ছিলাম দুঃখের সাথী, পাওয়া তাহের সাথী। সুখ হইলে মানুষ বরং চলিয়াই গিয়াছে। দুঃখের বোঝা বইতে গিয়াই না মানুষের সঙ্গে আমার ঝগড়া। কাহারও সুখের প্রতি, টাকার প্রতি আমার লোভ ছিল না। মানুষের সেবার জন্য প্রাণপণ করিলাম। যতদূর পারি করিলাম। সেবার পথেই আমি সব হারাইয়াছি। বি, কে, পাল অনেক মাস পরে সন্ধ্যা ৭টার পর আসেন। ৯টার পর যান। মন আমাদের মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের যুগে, দেহ বর্তমান যুগে। দেহ-মনের সামঞ্জস্য করিয়া কোনও দর্শন এ দেশে নাই। বিজয়বাবু বলেন, ইহা একেবারে নূতন, কিন্তু এতদিনের সংস্কার, ঠিক ধরিতে পারি না। একটা টাকা রাখিয়া যান।

২রা সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, জীবনের সকল সম্পর্ককে ব্রহ্মদৃষ্টিতেই দেখিবার, উপলব্ধি ও আস্বাদন করিবার জন্য যথাসাধ্য করিয়াছি। সে তোমারই কৃপা। 'ব্রহ্মদৃষ্টিঃ উৎকর্ষাৎ'—ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্ম-দৃষ্টিদ্বারা সবকিছুর উৎকর্ষ সাধিত হয়, বস্তুর যথাযথ মূল্য আস্বাদিত হয়। মনে পড়ে একদিন উষাঙ্গিনী (তখন সত্যব্রত মাত্র কোলে) কাঁকরবার কোনও বাড়ীতে বেনারসী শাড়ী ও অলঙ্কারাদি পরিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিল। রাত্রিতে যখন শুইতে যাই তখন আবার ঐরূপ সাজিয়া শিশু সত্যব্রতকে কোলে লইয়া বসিতে বলি। বসিল—চক্ষু ভরিয়া দেখিলাম। কি দেখিলাম? 'বসিলেন মা হেমবরণী হেরম্বারে নিয়ে কোলে। হেরি গণেশ-জননী মাগী ভাসে নয়ন-জলে'। শিশু কোলে হেমবরণী উমার কি রূপ! মহাষ্টমী পূজার দিন শাখা সিন্দুর কাপড় দিয়া উষাঙ্গিনীর ব্রহ্মময়ী রূপের পূজা করিয়াছি।

শিষ্যের মত সংসার করিব, সন্ন্যাসী হইব ইহাই আমার কথা ছিল। পুত্র হেরম্ব হইবে, দিদিমাতা গণেশ হইবে, আমার বেদান্তের ওয়ারিশ হইবে। তাহাদের নিয়া বিশ্বকে বেদান্তের আলোকে গড়িয়া তুলিব—ইহাই তো স্বপ্ন। ঠাকুর, তুমি জান বিলাসবাবু আসেন ১১ টায়। বলি—আমি পথে আছি। তাই সব মঠ মন্দির সম্প্রদায় আমার। প্রাণবান জোরই আমার একমাত্র। আমার একমাত্র এই চরিত্র। আমার গুরুপাদ পর্বত্র প্রসারিত, 'পর্বতঃ পাদিপাদম্'। কুমারের অতীত কুমারের বাড়ি ছবিঘরা হইতে আসিয়াছে। সে অনুসৃত না থাকিলে আজ তাহার কিছু হইবে না। অতীতের যে কর্মের ফলে সে আজ যাহা হইয়াছে, কর্মের ও বুদ্ধির সেই ধারা যদি সে আজ পরিবর্তন না করে তবে তাহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আসিবে কোন্ পথে? আমি শিষ্যদের অতীতের সঙ্গে লড়াই করিতেছি! থাকিবে আমার এখানে, চাহিয়া থাকিবে, প্রাণ থাকিবে শ্রীগুরুর দিকে। তাহা হয় না। আগে সর্বতোভাবে আমার হইলে তাহাদের কল্যাণ করিতে পারিবে। যখন আমার কাছ ছাড়া তত্ত্ব কোথাও ভাল লাগিবে না, তখনই বুঝিব সে আমার হইয়াছে। তাহার আর বিপদ নাই। মিনুর সারা জীবনের ভার আমি নিয়াছি। তাহার ভাই মা, তাসুর দেবর নিবে? কে তাহার আছে সুযোগে সকলেই তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে। কে তাহার মেয়েকে দেখিবে? আজ এই সব নিয়া [illegible] প্রতিভার সঙ্গে আলোচনা হয়। [illegible]

ঠাকুর, তোমার বলে বলীয়ান হইয়া আমি আমার আশ্রিতদের সব অতীতের সঙ্গে লড়াই করিয়া চলিয়াছি। কাহাকেও তাহার অতীতের বোঝা এক বহিতে দেই নাই। কিন্তু তাহারা না থাকিলে তো তাহাদের অতীত প্রারব্ধ ক্রিয়মাণকে খণ্ডানো যায় না। তাই অতীতের ঝুলি কাঁধে করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি টানাটানি করিয়াও রাখিতে পারি নাই। ভগবান জনের কাছেই তুমি আছ, নহিলে [illegible] সকলের সব অতীত লইয়া টানাটানি করিতেছি। অনেকের অতীত অনেকটা ঘুচাইয়াছি। সে-ও তোমার আশীর্বাদে। আমার উপর কিসের তাহাদের দাবী? 'ন মে কর্তব্যং'। আমি করি বলিয়াই করি। কোনও দাবী নাই। সংসারী লোকের কাহার কতটা বুকের পাটা আছে যে আমার মত আশ্রয় দিতে পারে? তুমি আমায় আজ বলিয়াই পারি। তোমার জয় হউক। ২। টার পর 'পরমহংস অম্বুনাথ' বলিয়া পরিবেদনকারী ভদ্রলোক আসেন। তাঁহার একটা লেখা পড়িয়াও শুনান। তেমন কিছু বুঝিতে পারিলাম না। উচ্ছলভারতে ছাপাইতে বলেন। 'না' করিয়া দেই। পরে জগদীশবাবু আসেন। তাঁহার গীতার অনুবাদ শুনান। নীলু আসে ৫ টাকা দেয় প্রাপ্ত মাহিয়ানা ৫০ টাকা হইতে। ৪ টায় পাঠ আরম্ভ হয়। 'শ্রীভগবান পরম প্রেমরূপা নৈর্গুণী পরাভক্তি হইলে মায়ার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না, মায়ের যে [illegible] মায়াদেবতা তাহাতে।" শ্রীভগবানের standard ই গুণ-দোষ, পাপ-পুণ্যের এই বিশ্বের সকলেই তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে। standard। এই standard-এ প্রাকৃত জগৎ মেয়েরে, দেখিবে? আজ এই সব নিয়া [illegible] সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত সংকল্পে পরিণত হয়। 'যৎ কিঞ্চ প্রতিভার সঙ্গে আলোচনা হয়। তথা [illegible] জগৎ' অংশে ব্যাখ্যাত হয়। পূর্ণের ৪টি স্তর—পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম, পরিপূর্ণ। ভগবানকে পাওয়ার মধ্যে সমস্ত বিশ্বকে পাওয়ার, সামনে দার্শনিকদের রাসচক্র পড়িয়া উঠিতেছে। [illegible]

রামানুজ-বুদ্ধ-কপিল-গৌতম-পতঞ্জলি-যীশু-মহম্মদ-চার্বাক সহ আজ অন্যোন্য-বন্ধুবান্ধব ভগবানকৃত গৃহীতকণ্ঠ হইয়া রাসমণ্ডল রচনা করিতেছেন। মাঝে রাসবিহারী শ্রীনিতাগোপাল। সর্বলোক সুস্থময়, সর্ববস্তু সমস্থ, সর্বধাতু সমধর্ম, সর্ববর্ণ সমবর্ণ, সর্বজাতি সমস্বরের দিকে বিশ্ব অগ্রসর হইতেছে। কালীচরণ সিংহ ও অন্য দুইজন নূতন লোক আসেন। কালীবাবু খুব impressed হন, বলেন আপনার বাঁচিয়া থাকা চাই। একটি ইনভেলপমান লিখিয়া দিয়া যান—তিনি উপকার পাইয়াছেন। বিমলা আসে, ২টাকা দিয়া যায়।... ৬ঠা সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তোমার কাজে আত্মবিনিক্ষেপ'—'তৎ ক্রিয়াসু আত্মবিনিক্ষেপঃ' রূপ পরমাগতি সতত আমার জীবনে ভরিয়া উঠুক। তোমার কাজই জীবন-ব্রত করিব—ইহাই যেন হয়। আমার কাজ বলিয়া যেন কোন কাজ না থাকে। তুমি যে বিধান বর্তমানে প্রবর্তন করিবার জন্য আরম্ভ করিয়াছ আমি যেন সর্বান্তঃকরণে ত্যাগী হইয়া তাহাকেই সম্পন্ন করিবার দিকে আগাইয়া যাইতে পারি। তোমার কাজ শুধু আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, পরিসমাপ্তি অনেক দূরে। তাই মরিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু যে-প্রতিকূলতা আবেষ্টনের দিক হইতে আসিতেছে, তাহাতে কিছু করিতে পারিব বলিয়া তো মনে হয় না। 'রক্ষা তুমি করিবে'—'রক্ষিষ্যতি ইতি বিশ্বাসঃ' যেন আমার থাকে। আমি তোমাকে সোল্লাসে বরণ করিব। আমাকে প্রতিকূলতার মধ্যে স্থাপন করিয়া রাখ। তোমার কাজ তুমি করিবে, আমি নিমিত্তের গৌরব লাভ করিব। জয় নিতাগোপাল। রেণু ৯টার পর পি, সাহার ওখানে যায়। আবার ঐ ঔষধই পুনরায় খাইতে বলিলেন। বলেন তো, ভাল হইবে। রেণুর বই আর ৪খানি বাকি। কুমার বাগুইআটী যায়, তাহারা আসে allotation পূজার পূর্বে হইবে না। মিনুর জ্বর হইয়াছে কাল রাত্রেই, আমি জানি আজ। তাহাকে লইয়া আমি বিব্রত। আমি সকলকে 'স্পষ্টভাষায়' জানাইতেছি যে, তাহারা অনুগত থাকিলেই আমি আছি, তাহাদের সম্বন্ধে আমার করণীয় আছে, নইলে 'ন মে কর্তব্যং।' মাটির বুকে দাঁড়াইয়া মাটিকে জোরগলায় আঘাত করিলে মাটিও পায়ের নীচ হইতে সরিয়া যায়। কুমারের ছেলের কলেজে ভর্তি হওয়া সম্ভব হইয়াছে আমার জন্য। হরিদ্বার যাকিলে, ইহা তাহার কল্পনাতীত ছিল। শান্তিও করিতে পারে নাই। মিনু পারিবে তাহার মেয়ের ভবিষ্যৎ কল্যাণ করিতে এখানের যাহারা ছাড়া? অথচ এইখানের সকলের সঙ্গে তাহার অবাধভাব জন্য ঝগড়া। আর আমি পারি না। সব অন্তর্দৃষ্টি, সামনের অতি ক্ষুদ্রের প্রতি দৃষ্টি। যাহার ব্যাপক দৃষ্টি আছে, তিনিই গুরু। তাঁহার কাছে পড়িয়া থাকিতে হয়। তবেই কল্যাণ। ৪ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, মায়া বা প্রকৃতি যে স্বচ্ছন্দগতি, তাহার প্রতিটি স্পন্দন মেরু-ছন্দ, নিজের ছন্দে সুস্থ স্বচ্ছ, সেই ছন্দে ছন্দ মিলাইলেই যে উহা স্থিতির লক্ষণাবলম্বুক্ত, উহাই যে অগতি ব্রহ্মজ্ঞানের স্থিতির চেয়ে, সংযমের চেয়ে অধিকতর সংযম, পরবৈরাগ্য, পরসংযম, এই সংযমই বৃন্দাবনে রাধা দিতে হইয়াছে। এই পরম সংযমে সংযমী হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শসহস্র হইয়াও ব্রহ্মচারী। এই সংযমের সাধনাই তুমি আমাকে শিখাইতে চাহিয়াছ। তাই জটিল কুটিল গতিমান এই মায়া-জগতের কামিনীকাঞ্চনের

আবর্তনের ভিতর দিয়া আমাকে হাত ধরিয়া চালাইয়া আনিয়াছ। তুমিই আমার গোপ্তা, রক্ষক, গতি, প্রভু। সেকেণ্ডারী বোর্ড অব এডুকেশান হইতে রেণুকে ২০শে সেপ্টেম্বর বই জমা দিবার অনুমতি দিয়াছে ১০-টার স্থানে। কুমার চাকেশ্বরী হইতে ১রীম কাগজ জগদীশ প্রেসে ট্রামে আনিবার সময় পড়িয়া গিয়া চোট পায়। সে জগদীশ প্রেসে কাগজ দিয়া এখানে না আসিয়া খিদিরপুর চলিয়া যায় হেল মালিস করাইবার জন্য। কি হৃদয়হীন, বুদ্ধিহীন! সে এখানে থাকে, বিপদ হওয়ার পর যায় খিদিরপুর কালীঘাট অতিক্রম করিয়া? যতক্ষণ সে আমার এখানে থাকিবে, ততক্ষণ আমার সঙ্গে সম্পর্ক তাহার মুখ্য, আর যেই হউক আত্মীয়ই হউক না কেন, সে গৌণ। এই বিচার না থাকিলে শৃঙ্খলা থাকে না, মর্যাদা থাকে না। সত্যব্রত যদি প্রতিষ্ঠানে ঢিল, হরিপদবাবুর অনুমতি বাদীত কখনও আমার কাছে আসি ডাকি নাই। কোন্ পরিস্থিতিতে কে যে কাহার মুখ্য, কে যে গৌণ—এই বোধ না থাকিলে কে আপন কে পর বোঝা যায় না। চিরদিনও সে বোধ নাই, কুমারেরও নাই। খুব বেদনা পাইলাম। সারা জীবনই তো এইরূপ চলিল। হিষ্টিরিয়ার এক মাত্রা খাই।

৬ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তুমি তোমার ইচ্ছায় লিখিয়াছ, 'আমি যেমন করিয়া আশ্রম চালাইলাম, তেমন করিয়া চালাইবে'। তুমি সকল প্রাণ দিয়া, সকল মানুষ, সকল বস্তুর যথাযোগ্য সম্মান দিয়া আশ্রম চালাইয়া গিয়াছ, আমি তাহাই মানিয়া চলিতে চাহিলাম। যেখানে প্রাণের একটু গন্ধ পাইয়াছি, গলিয়া দাবী করিয়াছি। কাহারও কাছ হইতে টাকা চাই নাই, কেহ আমার নিকট টাকা কড়ি দিয়া আসেও নাই। প্রাণ দিয়া প্রাণ ভালবাসিয়াছি। প্রাণ কি পাইয়াছি? আঘাতই শুধু পাইয়াছি। মানুষকে পাইবার জন্য তাহার আবেষ্টনকে পর্যন্ত ভালবাসিয়াছি। আমি ছিলাম সেবার জন্য সদা প্রস্তুত। সকল ভাবের সম্বন্ধকে হস দিয়া, সকল পল্লবীতকে স্বকীয় করিয়া এবং সকল হসকে ভাবের আগুনে জ্বাল দিয়া, সকল স্বকীয়কে পরকীয় করিয়া মনস্তত্ত্বের শেষ গ্রন্থি মোচনের চেষ্টা করিয়াছি। আমার স্ব ও নাই, পর ও নাই। আমার স্ব-পর রহিত, স্ব-পর সমন্বিত মানুষের প্রতি ভালবাসা। এই ভালবাসা যেন বজায় থাকে। যে আঘাত মানুষ দিল, বিশ্বাস ভিন্ন হইয়া যেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত না হই। তুমি আশীর্বাদ কর। রেণু গোপাসহ ব্যাঙ্ক হইয়া কুকারটা সারাইবার জন্য ডায়মণ্ডহারবার ও বৌবাজার, পরে চাকেশ্বরীতে যায়। রেণুর মা-বোন কলিকাতা আসিয়াছে। সন্ধ্যার পর সেবানন্দ আসে। তাহাকে বলি, আমার ঠাকুর শুধু মহানির্বাণ মঠে নাই। তিনি অযোধ্যা। মঠে বসিয়া হুড়াহুড়ি করিব না বা দল পাকাইব না। আমার দল নাই, দল করিবার ইচ্ছা বা বুদ্ধি নাই। সহজ সরল সত্য পথে চলিব। যদি ঠাকুর প্রয়োজন মনে করেন তিনি ট্রাস্টী করিবেন। আমি ভোটের ভিখারী নই। ঠাকুর ছাড়া কাহারও অপেক্ষা করিব না। সাবিত্রী তাহারা একদিন আমাকে নিয়াছিলেন সত্যবাহিকীর প্রধান কর্মকর্তা করিবার জন্য। এখনও তিনি তাহা পারেন। তাঁহার ইচ্ছার দিকেই তাকাইয়া থাকিব। ৭ই সেপ্টেম্বর

। ঠাকুর, আমি চাহিয়াছিলাম একটু সুযোগ, যাহাতে তোমার জীবন-দর্শনকে প্রচার করিবার পথ খুলিয়া যায়। আমার জন্য কিছু চাই নাই। হইতে পারে যে, বর্তমানে সমাজের যে শোচনীয় অবস্থা তাহার মধ্যে বিপ্লবের অনুপ্রবেশ কালের অপেক্ষা করে। কিন্তু তোমার অবতরণও কি কালকে আগাইয়া দেয় নাই বা অবস্থার কোন বদল হয় নাই? ঘরে বাইরে বলে জনে সর্বত্র আমার যে বাধা। এই বাধা কি হৃদয় করা যাইবে না? হইতে পারে যে কাজ একটু একটু করিয়া আগাইতেছে। কিন্তু তাহা এতই 'অল্প' যে উহা প্রত্যক্ষগোচর নয় বলিলেই কি চলে না? আমি nature's sloth বলিয়া প্রকৃতির পরিবর্তনে একটা আলস্য আছে। রাধারাণী তো অলস নন। তিনি যে ধীরা অধীরা দুই-ই। আমার দেহ-শক্তি সবই যে শেষ হইয়া আসিল। কেন আমাকে এত বড় সম্পদ দিলে যাহা মানুষের কাছে উপস্থিত করিয়া যাইতে পারিব না? আমি তোমার শ্রীচরণাশ্রিত। আমি কি ব্যর্থ হইব? সত্যব্রতের আমার বেদান্তের দায়িত্ব, পিতৃধন না নেওয়ার কাহিনী কুমারের কাছে বলার সঙ্গে সঙ্গে বেদনা অন্তরে উথলিয়া ওঠে, অনেকক্ষণ কাঁদি। রেণু প্রতিভা মিনু ছুটিয়া আসে। এমন কান্না বুঝি অনেকদিন কাঁদি নাই। সত্যব্রত আমার কত বড় আশ্রয় ছিল, তাহার জন্য বেদান্ত রাখিয়াছিলাম। একদিন বলিয়াছিলাম, তুই আমার বেদান্ত না নিলে আমার বেদান্ত গঙ্গায় ভাসাইয়া দিব। সত্যব্রতের তাহা না নেওয়ায় আমার বুকটা গুলিয়াছে। সেই শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্য কত মানুষকে বুকে চাপিয়া ধরিলাম, পুত্রবৎ স্নেহ করিলাম। ফাঁক ভরিল না। ঠাকুর আমার পতি, আমি তাঁহার স্ত্রী; আমাদের দিব্য মৈথুনের ফলে জন্ম নিয়াছে যে বেদান্ত, তাহা আমার কত প্রিয়, সেই বেদান্তে নিবার কেহ নাই। এই বেদনা আমি সহ্য করিতে পারিতেছিনা। সকলেই আমার উপর রুষ্ট হয়। আমার স্বার্থের জন্য তো কাহাকেও আনি নাই। কেহ টাকা নিয়া আসে নাই। আসিয়াছে রিক্ত হস্তে, রিক্ত মন লইয়া। আমি তাহা পূর্ণ করিয়াছি এই মাত্র আমার অপরাধ। আজও সত্যব্রত প্রভৃতির অপেক্ষায় আছি। 'পাব জীবনে না হয় মরণে।' সকলেরই ফিরিয়া আসার পথ মুক্ত রাখিয়া চলিয়াছি। অয়া রেখা সন্ধ্যায় আসিয়াছিল। রেণু গোপা আভার সঙ্গে দেখা করিতে গোলাম মহম্মদে যায়। ৮ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, সারা জীবন সঙ্ঘমূর্তি তোমা প্রচারেরই জন্য কাঁদিলাম। মানুষ চাহিয়াছিলাম। তোমারই সেবার জন্য সঙ্ঘরূপে তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলাম। মানুষের প্রতীক্ষায় রহিলাম। কেহ আসিবার কথা থাকিলে সেই দিন আমার কাছে উৎসব তুল্য ছিল। কাছে রাখিতে, কাছে বসিয়া খাইতে ও খাওয়াইতে চাহিয়াছি। তোমার সেবার জন্য তাহাদের গড়িয়া তোলা ছাড়া কোনও অভিসন্ধি আমার ছিল না। তাহা না হইলে এতদিনে man-hater হইতাম। এমন নির্মম আঘাত পাইয়াছি তাহাদের কাছ হইতে। নিজের জন্য কখনও তো রাগ করি নাই। তাহাদের মানুষ করার জন্যই তো আমার যত রাগারাগি। আর পারি না। মানুষের দায়িত্ব লইবার সাধ আর আমার নাই। এই দায়িত্ব লওয়ার মধ্য দিয়া তাহারা সুযোগই লইতে চায়। প্রাণের বিনিময়ে কেহ প্রাণ দেয় না। আমার তো প্রাণ দিয়া কিছু

কথা ছাড়া গতি নাই। সবদেই দেখি বুঝিবার। আমার প্রাণ নিয়া আমি আজ একাই চলিব। তুমি আমার আছ, কেউ আর নাই আমার। ৮টার পর সুবোধ মুখার্জী আসেন। বিলাতের মৃত্যুলাভ-যোগ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শুনিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় তাহাদের সঙ্গে মিশিতে। সুবোধবাবু বলেন, আপনি গেলে সে দেশ একটি নূতন দর্শন শুনিতেন। হেমন্তবাবু ছেলে বলিতেছেন, বিলাত গেলে লর্ড রোনাল্ডশে আপনার জন্য প্ল্যাটফরম ঠিক করিয়া দিতেন বক্তৃতার জন্য। তাহারা খুব গুণগ্রাহী। হাঁ, তাঁহার Heart of Aryabarta-গ্রন্থে আমার বহিশাল কনফারেন্সে বক্তৃতার প্রশংসা আছে। পরে সতীন্দ্র দাশগুপ্ত আসে। ঠাকুরের 'ভক্তিযোগ দর্শন' সম্বন্ধে আলোচনা হয়। রেণু ৪টায় বিলাত-যাত্রী আত্মার সঙ্গে দেখা করিতে যায়। জ্ঞান বাবুর কাছ হইতে নয়নারায়ণ আশ্রম পরিকল্পনার জন্য ২০০৲ টাকা আনার জন্য প্রথমে রেণুর মা, পরে বড়দাদা তীব্র ভাষায় অভিযোগ করে। রেণু সর্বস্বান্ত হইয়া আমার সেবা করিতেছে, ইহার ফলে সে একদিন পথে দাঁড়াইবে—ইহাও বলে। রেণু যে ঊচ্চশিক্ষাব্রতের আমার মত একজন প্রোপাই-টার, একথা তাহার মা প্রভৃতি জানিলেও তাহারা আজ কিছুই জানেন না। বৈকালে সুবোধ ডাক্তার আসে—মিনুকে দেখে। অমূল্যের (ভাগিনের) ২৫৲ টাকা আসে। ৯ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তুমি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলার পরকীয় ও স্বকীয়ের সমন্বয় বিধান করিতে আসিয়াছ। কৈবল্যের সাধনা পরকীয়ের, অন্তোদ্ভবের সাধনা স্বকীয়ের। প্রয়োজনাভাবের সাধনা, দাবী দাওয়া না করার সাধনা পরকীয়ের, প্রয়োজনের সাধনা দাবী দাওয়ার সাধনা স্বকীয়ের। কোনও ভার না বহিয়া প্রেমের সাধনা পরকীয়ের। স্ত্রী ও স্বামীর পরস্পরের কাছে অনন্ত দায়িত্ব পালনের সাধনা স্বকীয়ের, কোনও দায়িত্বের ভার না লওয়া একান্ত প্রেমের সাধনা পরকীয়ের। তোমার আশীর্বাদে আমিও সকল মানুষের—নরনারীর—সঙ্গে স্বকীয় পরকীয় সম্বন্ধের সমন্বয় ঐ প্রেম-সাধনা করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু কেহ ইহার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিল না। আমি স্বাধীনতা দিয়াছি, নিজেও স্বাধীন হইয়াছি। প্রয়োজন অপ্রয়োজন সমভাবে করিয়া ভালবাসিয়াছি। কিন্তু পুত্র-কন্যা বাইরের লোক প্রভৃতি স্বকীয়ের সুবিধা ঐ দাবী পূরণ এবং পরকীয়ের সুবিধা ঐ ব্যক্তিগত হেয়াল পূরণের পথ ধরিয়া চলিয়াছে। আমাকে স্বকীয় ও পরকীয়ের শাস্তি, অসুবিধা দুই-ই ভোগ করিতে হইতেছে। প্রাণ আমার যায় যায়। বাঁচাও আমাকে বাঁচাও। মিনু চরম অবাধ্যতা করিতেছে। কাশুলী কেবুর এক আউন্স রস (২ আউন্স জলের সঙ্গে মিশ্রিত) নাকি তিতা বিষ। এ কি কথা। ঘোল খাইলে সর্দি বাড়িবে ইত্যাদি। আমি ইহাকে চটাইয়াছিলাম। ৯টায় বীরেন আসে। বুকে কোন ঘোর নাই। জ্বরও আজ ৯৯.৬। কাল ১০০ উঠিয়াছিল। পেটের আলাও কম। সন্ধ্যায় চন্দন তাহার মা সহ আসে। মিষ্টি দেওয়া হয়। বিমল ঘোষ নামে একটি যুবক আসিয়াছিল। —১৫ দিন পর এক দিয়া গিয়াছে। ১০ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তোমার 'নিতাই' (নিতাইচরণ পাল)-র সংস্পর্শে আসিয়া তোমাকে আপন বলিয়া বুঝিবার ও পাইবার অনেক কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি। সে-ই তোমার নিকট পাঠাইয়াছিল

নলীনে, সতীনবাবুর নিকট এক চিঠি দিয়া। তাঁহার প্রেরণায় সবেদাত লিখি, কত দীর্ঘ দিন তাহার বাড়ীর পাশের হল-ঘরটীতে আমরা থাকিতাম, শুইতাম, তোমার আলোচনা করিতাম! বৃন্দাবন হইতে আসার পর সে একটি ছোট পিতলের হাঁড়ি কিনিয়া দিয়াছিল। তাহাতে প্রায়ই বিচুড়ী রান্না করিতাম। একদিন সে বলিয়াছিল, 'অতুল, তুমি অনেক দুঃখ পাইবে। তুমি এত বেশী মানুষকে আপনার মনে করিয়া তাহাদের কাছে ভাসাইয়া যাও যে, তাহারা ইহার ভার সামলাইতে পারে না। আর তুমি দুঃখ পাও'। সারা জীবনই তো আমার এই কথা। আমি সকল পরকীয়াকে স্বকীয় করিয়া পাইতে চাই। আমি জানি প্রেম স্বকীয়-পরকীয়ের সমন্বয় বলিয়া উহা দুইয়েরই অতীত। স্বকীয়ত্বে দাবী-দাওয়ার নোংরামি, পরকীয়ত্বে কামুকতার, অতি-অনন্যতার, অতি-আধ্যাত্মিকতার নোংরামি। আমি সারা জীবন দুইয়ের অতীত থাকিতে চাহিয়াছি বলিয়াই আজ এতদূর আসিতে পারিয়াছি। তুমি সঙ্গে আছ, তাই পারিলাম। তোমার জয় হউক। কুমার নিতান্তই ঔৎসুক্য মীহারবাবুর বাসায় যায়, পরে থানায় যায়—ডায়েরী করে। পরে সন্তোষের ওখানে যায়. নীলু আসে নাই। এটার পাঠ আরম্ভ হয়। 'অপ্রাকৃত' বা সাধারণ প্রাকৃত কর্মও অপ্রাকৃত কর্মে গড়িয়া উঠে এই অংশ পাঠ হয়। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে 'সদ্ভাবে, সাধুভাবে' ইত্যাদি শ্লোক-গুচ্ছের আমার ভাল পাঠ ও আলোচনা হয়। পরে ঈশোপনিষদের ঊর্ধ্বগতি অধোগতির সমন্বয়ের অংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। বিমলা আসে। সেখানেও আসে। পরে অমিতাভর সঙ্গে হেণ্ডুর কথা হয়। হেণ্ডু তাহার 'positive' ব্যাখ্যা করে। — মিহু আসিত অধ্যাপক, আজ ১০০। বীরেন ডাক্তার আসে।—১২ই সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, সারা জীবন তুমি সঙ্গে সঙ্গে আছ। শ্রীরাধাকৃষ্ণ সব তোমার জীবনেরই প্রকাশ রূপে পাইয়াছি। গীতা গ্রন্থের এক বৎসরের মধ্যে আমাকে কিছু পরিবর্তন করিয়া দিবে বলিয়াছিলে। সে পরিবর্তন আসিল হুগলীতে তোমের একটি স্বপ্নের ছিদর দিয়া। তখন তোমার কাছে আমি হুগলীতে। তুমি হঠাৎ আসিয়া বলিলে, 'দাদা, আমি মরতে চাই'। প্রথমে বোধ হয় তুমি রাধা, পরে গৌর হইলে, তারপর শ্রীকৃষ্ণরূপে তুমি এমন জোরে আমাকে আকর্ষণ করিলে যে আমার স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। সেইদিন হইতে কৃষ্ণ-নাম জপ চলিল। তুমি বলিয়াছিলে এই স্বপ্ন শুনিয়া, 'যখন তখন যার তার কাছে বলিও না'। তখনও রাধারাণী আসেন নাই। বঙ্কিমবাবুর মত 'জীবনের রাধা' মনে করিতাম। আমিই রাধা। কিন্তু একদিন মনে হইল, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ, আমি অংশ হইয়া কেমন করিয়া পূর্ণের সেবা করিব? তাহা হইলে তাঁহার সেবার জন্য একজন পূর্ণের প্রয়োজন আছে। তখন চৈতন্য-চরিতামৃতের 'রাধাপূর্ণঃ প্রকটিত হয়ে: শ্রীরাধিকা ন চান্যা', তখন শ্রীরাধা আসিলেন। রাধা আসেন তো কৃষ্ণ পালান, কৃষ্ণ আসেন তো রাধা পালান। শ্রীবৃন্দাবনে প্রথমবার যাবার পর বৃন্দাবনে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ মিলিত হন শ্রীগৌরাঙ্গ হন। বৃন্দাবনে কুরুকুর করিয়া আমার নিকট তখনই হইয়া—চোখ মুদিলে, তখনও জাগরণে। তোমার কথা। হেণ্ডু তাহার মাকে সঙ্গে দেখা করিয়া পি, সাহার ওখান হইতে তার

আসে।...কুসুম সোহা (মনোহারিণী শিষ্যা) একটী মহিলাকে তত্ত্ব আনে, ঠাকুরের কর্ম্ম নিয়ে আলোচনা হয়। বলি, ৮ রবিবার যদি আমার পাঠ শুনিতে যাও অনেক প্রশ্ন পাইতে পারিবে। ভিখারীর মত চাচ্ছি না। প্রাণের মত দিয়া আস, একটা রত্ন, অমূল্য পাইবে। ঠাকুরের কর্ম্ম দিতে পারিলে জীবনে অনেক কিছু পাইবে—অর্থ পরমার্থ দুই-ই। ঠাকুর সর্ব্ব বিষয়ে UNIQUE। গীতা ১২৲ টাকা আমার জন্য পাঠায়। ১০৲ টাকা সে তাহার বাবার কাছ হইতে চাহিয়া আনে, ২৲ টাকা অপর একজনের কাছ হইতে। ১২ই সেপ্টেম্বর

প্রথমবার যখন বৃন্দাবন যাই কিছুদিন কুসুম সরোবরে ছিলাম। বোধহয় গোয়ালিয়রের রাজার মন্দির সেটি। হরিচরণ দাস বাবাজী সেখানে থাকিতেন, আসিও থাকিতাম অপর দিকে। তিনি খুব স্নেহ করিতেন। মাঝে মাঝে রাধাকুণ্ডে যাইতাম দুপ্রহরের রৌদ্রে। তখন শ্রীরাধাগোবিন্দ সেখানে জলকেলি করিতে আসেন। তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য স্থির সোৎসুক চেয়ে চাহিয়া থাকিতাম। শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের মাঝে শ্বেতপাথরের কুসুম চরণ আছে। লুকাইয়া লুকাইয়া তাহা সেবা করিতাম। রাধাকুণ্ডেও রাধাদামোদরের মন্দিরে কিছুদিন ছিলাম। কুসুম সরোবরে যতদিন ছিলাম, প্রায়ই স্বপ্নে লীলাদর্শন করিতাম। একদিন দেখি গোপ-মায়ার কোলে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা ভাবমুখী শ্রীরাধা মহিমা আছেন, দূরে পর্ব্বতের পাদদেশে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ। একদিন স্বপ্নে গৌরাঙ্গ শ্রীগৌরসুন্দর আসিয়াছেন। তাঁহার শ্রীচরণে শ্রীরাধাগোবিন্দের অতি চরণ-চিহ্ন দেখিয়া চিনিলাম। তিনি বলিলেন, 'যা এবার বাঙ্গলায় যা। সেখানে তোর কাজ আছে। এবার আর দেখা হবে না। ২৫ বৎসর পর আবার দেখা হবে'। মন মানিল না। যাইব না—সঙ্কল্প করিলাম। ২/১ দিন পরে জ্বর আসিল। প্রলাপের মধ্যে বলিলাম, 'আমি কি বৃন্দাবনে মরিতে আসিয়াছি?' ইহার পরে মনে হইল, আর থাকা হইবে না। হরিদাস বাবাজী কিন্তু স্বপ্ন শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমার আর এখানে থাকা হইবে না। তোমাদ্বারা বাঙ্গলায় কাজ হইবে, যাও, বাঙ্গলায় যাও'। ঠাকুর, পিছনে পিছনে আছ তুমি। এ মাসে হয়তো না নয় তো [illegible] পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন যাইবে। রেণু বাহির হইয়া গ্রেসিয়ার্স ও এজেন্টদের যার নীলুর পোষ্টকার্ড আসে, সব ঠিকঠাক হইয়াছে।... মিনুর রাত্রি দশটায় ১৬.৪—। প্রেতিভাই অধিকাংশ রান্না করে। সরযূ ২দিন আসিতেছে না। —সন্ধ্যায় সেবানন্দ আসে। তারিণীবাবু ও রমাপতিবাবুর মধ্যে খুব সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে। তারিণীবাবু দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন। এইরূপ হওয়া বিচিত্র নয়। ঠাকুরদের সাক্ষ বলিবার কিছু নাই।.... ১৩ই সেপ্টেম্বর

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমাবন্দের

[illegible]

কলিকাতা
১৮. ৫. ৩৬

....'পায়ের বেগেই পথ কেটে যায়' করিস নে আর দেরী—নূতন যুগের ভোরে'—ইহাই সকলের নীতি হউক। নূতন যুগ আসিয়া পড়িল, বিরাট কর্মক্ষেত্রও আগাইয়া আসিয়া প'ড়য়াছে, আর দেরী করিবার সময় নাই। এইবার সাজ সাজ রব চতুর্দিকে শুনিতেছি। তোমরা শ্রীশ্রীরাধাজীবন ও দর্শন লইয়া সজ্জিত হও, নূতন যুগের নূতন কাজে ঝাপাইয়া পড়। সঙ্ঘ গড়িতেই হইবে সেজন্য পত্র দিতে হইবে সাক্ষাৎ ভাবে। ধীরে ধীরে সুস্থ থাকিয়া যতটা দেহে কুলায়—ততটাই চিঠি দিবে। হুড়াহুড়ির তো কোন প্রয়োজন নাই। ——'যাহা পাইয়াছি পাইয়াছি, যাহা পাই নাই তাহা পাই নাই'—এই মনোভাব ছাড়া পুরুষোত্তম-দর্শনে অন্য কোনও ভাবের স্থান নাই। ইহা সম্ভব হয় তখনই যখন ছোটখাট পাওয়া না-পাওয়ার অতীত একটা পরম পাওয়ার মধ্যে সে ডুবিয়া মজিয়া তাহাই হইয়া গিয়াছে। রাজার প্রেমে ও আদরে যাহার মুখ ভরা, সে কখনও দরোয়ান বা ম্যানেজারের অনাদরে মুহ্যমান হয় না। তখনই সে সকলের দেনাপাওনার ঠিক ঠিক হিসাব করিতে পারে। কেননা রাজার জীবনের মধ্যেই যে চরম ও পরম ভাবে অন্তরতঃ দরোয়ান হইতে ম্যানেজার সকলের আদরই পাইয়াছে বলা চলে। এই পাওয়াটা অবশ্যই intuition-এর ক্ষেত্রে; succession-এর ক্ষেত্রে শুধু এই পাওয়ার আস্বাদন। তখনই পাওয়া ও না-পাওয়ার মধ্যে চলে সঙ্ঘর্ষ, তখনই নির্ধারিত হয় কোথায় কতখানি পাওয়ার দাবী করা চলে, কতখানি না-পাওয়া লইয়া তৃপ্ত থাকিতে হইবে এবং তত্খানি পাওয়ার জন্য, সামনে আগাইবার জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে। পাওয়াটা হইতেছে স্থিতির ক্ষেত্র, বিশুদ্ধ সত্ত্বের ক্ষেত্র—এই ক্ষেত্র না থাকিলে সুবিধাবাদ হইত। অনন্ত পাওয়ার দিকেই ছুটিতে হইবে অনন্ত না-পাওয়াকে হজম করিতে করিতে তখনই কখনও পাওয়া থাকে সামনে, কখনও বা না-পাওয়া থাকে সামনে। পরম পাওয়ার ক্ষেত্র বা intuition-এর ক্ষেত্র থাকে সব সময়ই সকল ক্ষেত্রের সামনে। Intuition-এর ক্ষেত্র আছে বলিয়াই পাওয়া ও না-পাওয়া অনন্তকাল ধরিয়া চলিবার সুযোগ পাইয়াছে। পাওয়াটার উপরেই সমাজ গড়ে: উহাই বিশুদ্ধ সত্ত্বের ক্ষেত্র। না-পাওয়ার ভিতর দিয়া পাওয়াটার হয় অগ্রগতি। না-পাওয়ার দ্বারাই পাওয়া থাকে flexible ও অগ্রসরনশীল, নচেৎ পাওয়া হইত জমাট, মৃত্যু। শ্রীরাধার সামনে এই পাওয়া ও না-পাওয়ার লীলা লইয়া বর্তমান ছিলেন পুরুষোত্তম। তাই শ্রীরাধার পরিবার ছিল না, সমাজ ছিল না, রাষ্ট্র ছিল না; ছিলেন শুধু পুরুষোত্তম। শ্রীরাধা ছিলেন উচ্চতম প্রকৃতি বিধানে পরিবার-ছাড়া, সমাজ-ছাড়া, রাষ্ট্র-ছাড়া, বিশ্ব-ছাড়া। তাঁহার সর্বহারা এই দীনা কাঙ্গালিনী সত্তাই পরিবার সমাজ রাষ্ট্র বিশ্ব গড়িতে সক্ষম। যাহাকে যাহা কিছু গড়িতে হইবে, তাহাকে তাহার বাহির হইয়া গড়িতে হয়। বাহির হওয়ার ভিতর রহিয়াছে যাহার বাহির সে হইল তাহার একটি সর্বাঙ্গীণ চিত্র এবং যে রূপে রসে সে গড়িয়া তুলিবে সেই রূপের স্পষ্ট একটি

intuitionএর উপর। একটি positive [illegible] তোলার উপরই তাঁহার প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিত। অন্তর্দৃষ্টির সহযোগ না থাকিলে কেহ তাহাকে সে কথা বলিয়াছে। তাই ঠাকুরের জীবনে অবগাহন করিতে গিয়া, তাঁহার [illegible] বুঝিতে গিয়া, তাঁহার [illegible] সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিদ্রোহ ও নবীনের আহ্বান সত্ত্বে জীবনস্থ প্রাচীন যেন রহিয়াছে, বাহির হওয়ার অপেক্ষায়। শ্রীরাধা উচ্চতম প্রাণপ্রকৃতির বিধানে, গোপমাত্র বিধানে সব কিছুর বাহিরে। বাহিরে দাঁড়াইয়া সেখানে একটি সমাজ তিনি গড়িয়া তুলিলেন। সেই সমাজই হইয়াছিল তাঁহার সমাজের ভিত্তি। আজও সেই সমাজের সেই সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাঁহাদের উপর এই সমাজ গঠনের ভার ন্যস্ত হয়, তাঁহাদিগকে তিনি সব কিছুর বাহির করেন। তাই তো ঘরছাড়া রাধার দুই পতি—পুরাণ সমাজের একজন এবং ভবিষ্যৎ নূতন সমাজের একজন। ভাঙাচোরা এ চীন সমাজের পতি হীন রায়ান পতি negative, নবীন তাহা সমাজের পতিই সৃষ্টিকার পতি, positive। পরা প্রকৃতির এই অদ্ভুত বিধানে বহু নরনারী সমাজের বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু যাহারা এই বিধানকে সকল দেহমন দিয়া, দিব্য জ্ঞান দিয়া, দিব্য কর্ম দিয়া বরণ করিয়া লইল, তাহারা গড়িল, ধন্য হইল, পুরুষোত্তমকে ধন্য করিল। আজ গড়িতেই হইবে নিজেদের পরিবারের, সমাজের রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য, স্থিতির জন্য, অগ্রগতির জন্য। পুরুষোত্তম সমাজ গড়িতে না পারিলে ইহকাল পরকাল সব বাজে, গড়িতে পারিলে সব সার্থক হইবে। গড়া ছাড়া আর কিছু নাই। গড়িবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও। নিজের কথা প্রাণের আবার দেহ কাল পাত্র বুঝিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিতেই হইবে। না পারিলে ঠাকুরই ব্যর্থ হইবেন। এই

অটিলতা যত বাড়ে, জীবনের সহজ ছন্দ ধরা পড়িবার পথ ততই খুলিয়া যায়। ঈশোপনিষদ পড়িয়া আরম্ভ করিয়া কেল। উহার প্রতি লাইনটি মুখস্থ কর। আমার বইগুলির উপর চিহ্ন দেওয়া সব চিহ্নগুলি আপনাআপনি ওঠাইয়া আসিবে। নিজের কথা সহজ সরল ভাষায় ডায়ারিতে লেখা যায়। আপনাআপনি পথ খুলিয়া যায়।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের

দুইখানি পত্র

কলিকাতা
১৮ ৫. ৪৬

...'পায়ের বেগেই পথ কেটে যায় কড়িল যে আর দেরী—নূতন যুগের ভোরে'—ইহাই সকলের নীতি হউক। নূতন যুগ আসিয়া পড়িল, বিরাট কর্মক্ষেত্রও আগাইয়া আসিয়া পড়িয়াছে, আর দেরী করিবার সময় নাই। এইবার সাজ সাজ রব চতুর্দিকে শুনিতেছি। তোমরা শ্রীশ্রীরাধাজীবন ও দর্শন লইয়া সজ্জিত হও, নূতন যুগের নূতন কাজে ঝাপাইয়া পড়। সঙ্ঘ গড়িতেই হইবে সেজন্য পত্র দিতে হইবে সাক্ষাৎ ভাবে। ধীরে ধীরে সুস্থ থাকিয়া যতটা দেহে কুলায়—ততটাই চিঠি দিবে। ছড়াছড়ির তো কোন প্রয়োজন নাই। ---'যাহা পাইয়াছি পাইয়াছি, যাহা পাই নাই তাহা পাই নাই'—এই মনোভাব ছাড়া পুরুষোত্তম-দর্শনে অন্য কোনও ভাবের স্থান নাই। ইহা সম্ভব হয় তখনই যখন ছোটখাট পাওয়া না-পাওয়ার অতীত একটা পরম পাওয়ার মধ্যে সে ডুবিয়া মজিয়া তাহাই হইয়া গিয়াছে। রাজার প্রেমে ও আদরে যাহার বুক ভরা, সে কখনও দরোয়ান বা ম্যানেজারের অনাদরে মুহ্যমান হয় না। তখনই সে সকলের দেনাপাওনার ঠিক ঠিক হিসাব করিতে পারে। কেননা রাজার জীবনের মধ্যেই যে চরম ও পরম ভাবে স্বরূপতঃ দরোয়ান হইতে ম্যানেজার সকলের আদরই পাইয়াছে বলা চলে। এই পাওয়াটা অবশ্যই intuition-এর ক্ষেত্রে; succession-এর ক্ষেত্রে শুধু এই পাওয়ার আস্বাদন। তখনই পাওয়া ও না-পাওয়ার মধ্যে চলে সঙ্গতি, তখনই নির্ধারিত হয় কোথায় কতখানি পাওয়ার দাবী করা চলে, কতখানি না-পাওয়া লইয়া তৃপ্ত থাকিতে হইবে এবং কতখানি পাওয়ার জন্য, সামনে আগাইবার জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে। পাওয়াটা হইতেছে স্থিতির ক্ষেত্র, বিশুদ্ধ সত্ত্বের ক্ষেত্র—এই ক্ষেত্র না থাকিলে সুবিধাবাদ হইত। অনন্ত পাওয়ার দিকেই ছুটিতে হইবে অনন্ত না-পাওয়াকে হজম করিতে করিতে। তখনই কখনও পাওয়া থাকে সামনে, কখনও বা না-পাওয়া থাকে সামনে। পরম পাওয়ার ক্ষেত্র বা intuition-এর ক্ষেত্র থাকে সব সময়ই সকল ক্ষেত্রের সামনে। Intuition-এর ক্ষেত্র আছে বলিয়াই পাওয়া ও না-পাওয়া অনন্তকাল ধরিয়া চলিবার সুযোগ পাইয়াছে। পাওয়াটার উপরেই সমাজ গড়ে: উহাই বিশুদ্ধ সত্ত্বের ক্ষেত্র। না-পাওয়ার ভিতর দিয়া পাওয়াটার হয় অগ্রগতি। না-পাওয়ার দ্বারাই পাওয়া থাকে flexible ও অগ্রগমনশীল, নচেৎ পাওয়া হইত জমাট, মৃত্যু। শ্রীরাধার সামনে এই পাওয়া ও না-পাওয়ার লীলা লইয়া বর্তমান ছিলেন পুরুষোত্তম। তাই শ্রীরাধার পরিবার ছিল না, সমাজ ছিল না, রাষ্ট্র ছিল না; ছিলেন শুধু পুরুষোত্তম। শ্রীরাধা ছিলেন উচ্চতম প্রকৃতি বিধানে পরিবার-ছাড়া, সমাজ-ছাড়া, রাষ্ট্র-ছাড়া, বিশ্ব-ছাড়া। তাঁহার সর্বহারা এই দীনা কাঙ্গালিনী সত্তাই পরিবার সমাজ রাষ্ট্র বিশ্ব গড়িতে সক্ষম। যাহাকে যাহা কিছু গড়িতে হইবে, তাহাকে তাহার বাহির হইয়া গড়িতে হয়। বাহির হওয়ার ভিতর রহিয়াছে যাহার বাহির সে হইল তাহার একটি সর্বাঙ্গীণ চিত্র এবং যে রূপে রসে সে গড়িয়া তুলিবে সেই রূপের স্পষ্ট একটি

intuition-গত চিত্ত। একটি positive বাস্তবের চিত্ত অনুভূতির মধ্যে না থাকিলে কোন ছাঁচে সে পুরাতন বীভৎসকে গড়িয়া তুলিবে? বীভৎসের সম্বন্ধে বিজ্ঞান ও দর্শনের তাহার সঙ্গে ঐক্যমত্য প্রকাশ করিয়াছে। বাহিরের অন্তরের ঐশ্বর্য উজাড় করিয়া সে-সমাজ বিধানে সব কিছুর অধিষ্ঠান রহিয়াছে, তাহারা সেখানে একটি সমাজ ভিত্তি গড়িয়া দিয়াছেন। সেই সমাজই হইয়াছিল ভাঙা-সমাজের ভিত্তি। আজও সেই সমাজের সেই সত্যের প্রয়োজনীয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাহাদের উপর এই সমাজ গঠনের ভার ন্যস্ত হয়, তাহাদিগকে তাঁরা সব কিছুর বাহির করেন। তাই তো ঘরছাড়া রাধার দুই পতি—পুরাণ সমাজের একজন এবং ভবিষ্যৎ নূতন সমাজের একজন। ভাঙাচুড়া প্রাচীন সমাজের পতি শ্রীকৃষ্ণ পতি negative, নবীন ভাঙা সমাজের পতিই সত্যিকার পতি, positive। পদ্মা প্রকৃতির এই অদ্ভুত বিধানে বহু নরনারী সমাজের বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু যাহারা এই বিধানকে সকল স্নেহমন দিয়া, দিব্য জ্ঞান দিয়া, দিব্য কর্ম দিয়া বরণ করিয়া লইল, তাহারা গড়িল, বড় হইল, পুরুষোত্তমকে বড় করিল। আজ গড়িতেই হইবে নিজেদের পরিবারের, সমাজের রাষ্ট্রের, মঙ্গলের জন্য, স্থিতির জন্য, প্রগতির জন্য। পুরুষোত্তম সমাজ গড়িতে না পারিলে ঈশ্বরলাভ পরলোক সব কাহিবে, গড়িতে পারিলে সব সার্থক হইবে। আর কিছু নাই। গড়িবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও। নিজের কথা একেবারে ভুলিয়া যাও। চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিতেই হইবে। না পারিলে ঠাকুরই বাদ হইয়াছেন। [illegible] পড়িয়া তোমার উপরই তাঁহার প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিতেছে। যতই ঠাকুরের জীবনে অবগাহন করিবে, ততই জটিলতর ঘটনার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিবে, কেননা উহাই যে বর্তমান সভ্যতার প্রকৃতির একমাত্র সত্য কথা। জীবন যত জটিলতর ঘটনায় সম্পৃক্ত হইবে, ততই পথও সহজ হইতে সহজ জীবনের জন্য বাহির করা পড়িবে। যে-জটিলতা ছাড়িয়া যেমিয়া সমাজ সহজ হইতে চাহিয়াছিল, সেই জটিলতাই আজ বিকৃতরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং মহীয়সী নারী প্রকৃতিকেই সে আশ্রয় লাভ করিতেছে, কেননা সে-ই শুধু দিব্যজ্ঞানে উহা হজম করিতে পারে এবং পুরুষোত্তম-স্তরে উহার সামাজিক রূপ প্রদান করিতে, বাস্তবিকতা দান করিতে পারে। একটা কথা আছে—যে বারে যে জীবন মুক্ত হয়, সেই বারে তাহার জীবনে সমস্ত ঘটনার সমাবেশ হয়। ইহা খুব সত্য কথা। যে ঘটনা চারা পড়িয়া প্রবলে পরিণত হইয়াছিল, যে আত্মকামী, আত্মসর্বস্ব জীবন তাহা গড়িয়া উঠিবেই। কেননা, ফুটিয়া না উঠিলে তো সমালোচনা হইতেই পারে না। সমস্ত সমাজের পাপ ফুটিয়া উঠে রত্নাকর-সদাগরদের জীবনে, তাই প্রায়ই তাহাদের জীবনে পাণ্ডিত্যের মত একটা কিছু ঘটিয়া যায়। ক্রৌঞ্চা-জীবনেও তাহা, দ্রৌপদী জীবনেও তাহা, পদ্মার জীবনেও তাহা, বিশ্বামিত্রের জীবনেও তাহা। জটিলতা যত বাড়ে, জীবনের সহজ ছন্দ ধরা পড়িবার পথ ততই খুলিয়া যায়। ঈশোপনিষদ পড়িয়া আরম্ভ করিয়া দেখ। উহার প্রতি লাইনটি মুখস্থ কর। আমার বইগুলির উপর নির্ভর না করিয়া, সমালোচনা-পদ্ধতি আপনা আপনি আয়ত্ত করিতে চেষ্টা কর। নিজের মত সহজ সরল ভাবে আমার মতখানি বলা চলে, তাহাতেই পথ খুলিয়া যায়।

আলোচনা ছাড়া আবেইন সৃষ্টি হয় না। জীবনের গুহ্যতম তত্ত্বকথা যতখানি বলা চলে, ততখানিই বলিতে হয়। অধিকারের বাহিরে বলিলেও কোনও ফল হয় না। সংঘ সংগঠকের চাই দেশ-কাল-পাত্র বুঝিয়া বলিবার কৌশলটি জানা। যখন তখন যার তার সমক্ষে যা তা বলিলে ফল ভাল হয় না। ঠাকুরের ব্যাপকতম ও গভীরতম পুরুষোত্তম-জীবনে অবগাহন করিয়া পুরুষোত্তম হও, পুরুষোত্তম-সঙ্ঘ রচনার মূল কেন্দ্র হও—ইহাই আমার তোমার কাছে দাবি। তুমি পারিবে। শ্রীশ্রীদেব তাহা করাইয়া দিবেন।

দ্বিতীয়পত্রের শেষাংশ

কলিকাতা

১৮ ৮.১৯৪৭

...মতের ও পথের মিলন যেখানে আদৌ নাই, সেখানে মনের মিলন যদি কদাচিৎ সম্ভবও হয়, তবে তাহা ভাববিলাসমাত্র, অতিসঙ্কীর্ণ। বাস্তবে যাহা হয় তাহার স্থান বাস্তবের দেশে কয়দিন টিকিবে? তোমাদের মনে যে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে, ইহাতে আমি খুবই প্রীত হইয়াছি। একদলের মিলন ঘটাইবার অত্যাগ্রহের সুযোগের আড়ালে নিজেদের আপাতঃ অসুবিধা এড়াইয়া গিয়া আবার ভবিষ্যতে নিজ মূর্তি ধারণ করিবার সম্ভাবনা অপর পক্ষের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এই মিলনের পশ্চাতে অনেকগুলি শক্তি কাজ করিয়াছে। কয়াণী ব্রিটিশ আসার ফলে যে বিরোধবিষ পড়িল বামাচাপা, যাহা বারবার নানা রকমে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিয়াছিল, তাহাকে হজম না করা পর্যন্ত কিছুই সমাধান হইবে না। পরীক্ষা দুই পক্ষকেই দিতে হইবে। হিন্দু rational বটে, কিন্তু animalityকে সে ঘৃণা করিয়াছে। তাহারই প্রায়শ্চিত্ত সে আজ করিতেছে। Animalityর হাতে rationality-র এই লাঞ্ছনাই ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্রের দেবাসুর সংগ্রামের গূঢ় তাৎপর্য, দেবতারা সব সময়ই 'লড়কে লেঙ্গে'-দের হাতে পরাজিত। আজও physical force আত্মিক শক্তিকে পরাজয় করিয়াছে। মীমাংসা ইহার নৃসিংহদেবের জীবন ও দর্শনদ্বারা হিন্দুকে পুরুষোত্তম মানুষে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রেরণা দান ও প্রচার করা। যতদিন হিন্দু না নরসিংহ হইবে, ততদিন ভগবানের বিধানে কিছুতেই এ প্রশ্নের মীমাংসা হইবে না। মুসলমানদের rational হইবার পথ তাহাদের কৃষ্টিতেই বাধা দিবে। তাহারা প্রাণপ্রধান, হিন্দু প্রজ্ঞাপ্রধান। হিন্দুরই ইহাদের সমন্বয় করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে। করিতেও হইবে তাহাকেই। তবু এ মিলনের যে জোয়ারটুকু আসিয়াছে, তাহার সুযোগ যতটুকু নেওয়া যায়, ততটুকু নিতেও হইবে। একথা ঠিক যে সমাজের নিম্নস্তরের মুসলমানেরা ঝগড়া চায় না, তাহাদিগকে ঝগড়ার মধ্যে টানিয়া আনা হয়। প্রত্যেকের অন্তরের নৃসিংহকে ফুটাইয়া তুলিবার, বারতাই পৌঁছাইতে হইবে, ইহাই হইবে আমাদের সাধনা। ইহার মধ্যে কাহারও বিরুদ্ধে কিছু-

থাকিতে পারে না, থাকিবে না। [illegible] আলোচনায় মনে হইবেই, বুঝিতে পারিবে। ভাতার পাশাপাশি পাকিস্তানে দেখিলে কি প্রশ্নের মীমাংসা কোথায় তাহা বলা পড়ে না? বিদ্রোহে ছহিয়াই গিয়াছে, পড়িল আরোর চাপা। শেষ সমাধান মহাত্মাজী দিতে পারিবেন না। তাহারা কি সত্যই অনুতপ্ত? প্রাণধর্মের stand-point হইতে উহারা তো অন্যায় কিছু করে নাই। Rationality-র দৃষ্টিভঙ্গি উহারা গ্রহণ করিতে পারিবে না। উহাদের নিকট হইতে অনুতাপের আশা করিয়া লাভ নাই। Animality-র উপরে যদি উহারা উঠিতে পারিত বা উঠিতে চাহিত তবে ঘটে মিলন সম্ভবপর হইত। হিন্দুকে একান্ত rationality-র উপরে উঠিয়া animality-র সঙ্গে সমন্বয় করিয়া সহজ জীবন লাভ করিতে হইবে। তবেই হইবে হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান। পাকিস্তানের সমস্ত মানুষ পালাইল কেন? হিন্দুর সাধন ভজন কোনও বিপদের সামনে দাঁড়াইবার মত বীর্য দান করে নাই। সে বড় অসহিষ্ণু, অধীর। রজোগুণ ইহাদের বিলুপ্ত তাই এই দুর্দশা। দেহের বীর্য যে সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সমস্যা ও তাহার সমাধান এইটুকু আলোচনায় মনে হইবেই, বুঝিতে পারিবে। 'বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি'। বাহুর শক্তি যতদিন না হিন্দুর আসিবে, লক্ষ রণ সোলাপ জল ছিটাইলেও সমস্যার সমাধান হইবে না। বাহু বাহুই, ইহার অতিরিক্ত নয়। নোয়াখালিতে দীর্ঘ দিন থাকিয়া যাহা হয় নাই, কলিকাতায় তাহা হইল কেন? রাষ্ট্র এখন পশ্চিমবঙ্গের হাতে, তাই এখন মিলন না আনিলে উহাদের আর এক পাও অগ্রসর হওয়ার সম্ভবনা নাই। তাই মহাত্মাজীর শরণ লওয়া। অন্তর যতটুকু বদলাইয়াছে তাহা শুধু পশ্চিমবঙ্গের হাতে রাষ্ট্র আছে বলে। রাষ্ট্র পশ্চিমবঙ্গের হাতে আসিলেও পূর্ববঙ্গের তো তাহা হয় নাই। সমস্ত সমস্যার চাপ পড়িবে তাই পূর্ববঙ্গের উপর। তাহাকেই আজ সুস্থ সবল পুরুষোত্তম-দর্শন লইতে হইবে। তবে স্বরাজ আসিবার অপরাহ্ণে সকলের জীবনেই ভাগবতী শক্তির প্রেরণা আসিয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে সম্ভব হইলে rationality-র দিক উঁচু করিয়া ধরিতে হইবে, হিন্দুদের কাছে animality ও rationality-র সমন্বয়ে জীবনধর্ম প্রকট করিতে হইবে।....

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

শ্রীসুবীর দাশগুপ্ত

কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' – শ্যাম নাম শুনে রাধারাণী বলেছিলেন 'আকুল করিল মন প্রাণ'— আজ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের জন্ম-বাসরে বসে ভাবছি শ্রীনিত্যগোপাল-নাম যে মহাজন আমাকে শুনিয়েছিলেন তিনি তো আকুল করা সুরেই নিত্যগোপাল-নাম শুনিয়েছিলেন – কিন্তু আমার মন-প্রাণ তো আকুল হল না! তবুও আজ শুদ্ধ ছন্দ দিয়েই আমার প্রণাম শ্রীনিত্যগোপালকে, আমার প্রণাম আমার আচার্যদেব স্বামী পুরুষোত্তমানন্দকে। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের কাছে শ্রীনিত্যগোপাল নাম শুনেছিলাম, শুনেছিলাম নিত্যগোপাল মহা-জীবনের জন্ম পরিপ্রেক্ষিতের উদ্দেশ্যের কথা।

আজ থেকে ১১১ বছর আগে ফাল্গুনী অষ্টমী-তিথিতে শ্রীনিত্যগোপাল ধরার বুকে নেমে এলেন। কী অপরূপ রূপ নিয়ে সে দিন তিনি এসেছিলেন— তা কোন কোন ভাগ্যবান দেখবার সৌভাগ্য লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। বুকে করে নিয়ে এলেন ছন্দের ধন সর্ব্ব সমন্বয়ের মধুমাখা বাণী। ঐশ্বরিক-দিব্য সামগ্রিক চিন্তাধারা যখন বহু মতবাদীর বহু মতের দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড হয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত, একের মতবাদকে অপরের মত-বাদের দ্বারা শাস্ত্র-যুক্তি যখন মানুষের অন্তরকে প্রবঞ্চিতই শুধু নয়, লাঞ্ছিত করতে লাগল, আর একমাত্র ধর্মের অনুশাসনের ভিত্তিতেই মানুষের জীবন যেন আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে গেল, তখন সুদূর পাশ্চাত্যের জড়বাদের ঝড় ভারতবর্ষের বুকে প্রবল গতিতে ঢুকে পড়ল। এক দিকে— বাস্তব বিমুখীনতার কৃচ্ছ্রতা, অপর দিকে পাশ্চাত্যের বস্তু-ভোগের বন্যা – এই দুই সংঘাতের ঘূর্ণিঝড়ে ভারতবর্ষের ভারতত্ব যখন লুপ্ত হতে চলেছিল, "সম্ভবামি যুগে যুগে" সেই মানুষটী নেমে এলেন – একজন শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে – আরেকজন শ্রীনিত্য-গোপাল রূপে। সর্ব্ব মতের সমন্বয় দিয়ে, আর পাশ্চাত্যের চোখ ঝলসানো বিলাসের হাত থেকে সহজ সরল জীবনের পথ দেখিয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আর শ্রীনিত্যগোপাল এলেন পরস্পর বিরুদ্ধ সর্ব্বমত ও সর্ব্বপথের জটিল কুটিল সমস্যায় জর্জরিত মানুষের কাছে সমাধানের পথ গড়ে তুলতে এবং সর্ব্বমত সর্ব্বপথকে স্বীকার করেও তার থেকে অতীত থাকবার কৌশলের খবর পৌঁছাতে। তাই তো শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন "টাকে টাকা আর সমাধি একমাত্র নিত্যগোপালেই সম্ভব"। শ্রীনিত্য-গোপাল জড়বাদকে স্বীকার করলেন আবার অজড়-বাদকেও স্বীকার করলেন। লিখলেন – জড়াজড় সমন্বয়, এক ও বহুর সমন্বয়। দ্বৈত অদ্বৈতের ঝগড়ার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য লিখলেন দ্বৈত-অদ্বৈত সমন্বয়ের সূত্র। এক জায়গায় লিখছেন "আমি অভেদবাদীও বটে, প্রভেদবাদীও বটে।" অর্থাৎ প্রভেদ অবস্থাকে তার তার নিজস্ব মূল্যে স্বীকার করেও, আস্বাদন করেও আবার তার থেকে মুক্ত থাকা—এই কৌশল ও দৃষ্টি আমরা শ্রীনিত্যগোপাল জীবনে ও দর্শনে দেখতে পাই। যাঁর জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই কাটত সমাধি

অবস্থায়—সেই মানুষটির বাস্তব জীবনের চলন, বলন এত সংবেদ, এত মাধুর্য্যপূর্ণ আর এত বিশুদ্ধ ছিল যে ভাবলে অবাক হতে হয়।

আজকের দিনের ভারতবর্ষকে সমগ্র পথের নিশানা দিতে তাই শ্রীনিত্যগোপাল এসেছিলেন। পূর্ব্বোক্ত দুই সভ্যতার ঘূর্ণাবর্তের আবর্ত্ত থেকে সংসারের মানুষকে মুক্ত করবার মন্ত্র ও জীবন নিয়ে এসেছিলেন শ্রীনিত্যগোপাল। সেদিন যে সমস্যা ছিল মানুষের জীবনে আজিও সেই সমস্যাই ভিন্নরূপে মানুষের সকল সুস্থতা গ্রাস করে ফেলেছে—সেদিন উৎকট আধ্যাত্মিকতার চাপে মানুষের হৃদয় শুকিয়ে কাঠ হতে চলেছিল, আজকের দিনে আবার পাশ্চাত্তোর ভোগবাদের নোংরামীতে মানুষের হৃদয়ের রস পর্য্যুদস্ত। তাই শ্রীনিত্যগোপালের প্রয়োজন, শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ধারার দর্শন বিশেষ করে আজকের মানুষের বড় প্রয়োজন। কেননা এই দুই সভ্যতার সংঘাতকে হজম করে তা থেকে ব্যাপকতম ও গভীরতম জীবনের সৌন্দর্য্য বের করবার মন্ত্রই যে দিয়ে গেছেন শ্রীনিত্যগোপাল। আজ বিশ্বের আকাশে বাতাসে যেন শ্রীনিত্যগোপালের দেওয়া এই মন্ত্রের সুর ভেসে আসছে সমস্ত ওলট পালটের মধ্য দিয়ে। কিন্তু জীবনের দুয়ারে এখনও পৌঁছাতে পারছেনা। তাই কালের অপেক্ষায় বসে থাকা ছাড়া বুঝি গত্যন্তর নেই।

শঙ্করাচার্য্যের ভারতবর্ষ শুধু অদ্বৈত ব্রহ্মকেই চেয়েছিল দীর্ঘ যুগ ধরে, তখনও ভারতবর্ষে সামগ্রিক সুস্থতার ইতিহাস ছিল না। এলেন বুদ্ধদেব, তিনি ভগবানকে পাওয়ার পথ দেখাতে এলেন না—এলেন মানুষের দুঃখ বেদনার মুক্তির খবর পৌঁছাতে, মানুষের একান্ত পুরুষকারের ওপর জোর দিলেন। মিলল না ঘন প্রাণের সামগ্রিক সুস্থতা। শ্রীনিত্যগোপাল এলেন বুদ্ধ-অদ্বৈতের মাঝখানে সমন্বয়ের দিব্য রসের খবর পৌঁছাতে।

শ্রীনিত্যগোপালের শেষ উপদেশ—"পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিবেন। পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোককে ভ্রাতৃভাবে দেখিবেন ও পরস্পর সাহায্য করিবেন।" বাস্তব জীবনেরও শেষ কথা মানুষকে ভালবাসা আর অধ্যাত্ম জীবনেরও শেষ কথা মানুষকে ভালবাসা। তাই শ্রীনিত্যগোপাল এই দুই দিকেরই স্থান ও মান নির্দ্দেশ করে যুগাবতার।

তাঁর জন্মবাসরে আজ তাঁর চরণতলে জানাই প্রার্থনা—হে যুগদেবতা নিত্যগোপাল, সর্ব্বমতবাদে পিষ্ট মনুষ্যত্বের কোলে তোমার জন্ম পরিগ্রহ সার্থক হোক—তুমি আবার নতুন জন্ম লাভ কর। বিশ্ব-হৃদয় তোমাকে ভালবাসিবে, তোমার বিশ্বকে ভালবাসিবে। তোমার বিশ্ব-নাগরিকত্বের ছন্দে আর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মন্ত্রে বিশ্ব হৃদয় তৃপ্তিময় হোক, শান্তিময় হোক, সুন্দরময় হোক।

সাময়িকী

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল জন্ম-স্মরণ :—

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল—যাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম যোগাচার্য শ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব নয়নারায়ণ আশ্রমের দেবতা ও ইষ্ট। ১৩৮২ বঙ্গাব্দের ২৪শে চৈত্র বাসন্তী অষ্টমীতে তাঁহার ১২৩তম জন্ম-তিথি নয়নারায়ণ আশ্রম সতীর্থ ভক্তার সঙ্গে নীরবে স্মরণ করে। ভোর ৪টায় সমবেত প্রার্থনা, সকাল ৮টায় বাল্যভোগ, দুপুরে পূজা ও বিবিধ সঙ্গীত, দ্বিপ্রহরের ভোগ ও জন পঁচিশ ভক্তকে প্রসাদ বিতরণের পর বিকাল ৪টায় কয়েকটি সঙ্গীতের পর শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও তৎ-প্রদত্ত বর্তমান যুগ-দর্শন সংক্ষেপে হইলেও প্রায় এক ঘণ্টা মোটামুটি ভাবে আলোচিত হয়। শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের যে সামগ্রিক জীবন-দর্শন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহা-রাজের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আজও সর্বসাধারণের নিকট তথা তাঁহার আশ্রিত জনদের নিকটই পৌঁছান যায় নাই। কেননা জড়-অজড় দ্বৈত-অদ্বৈত প্রভৃতি পরস্পর-বিপরীতের সমন্বয়ের যে সামগ্রিকতায় চিন্তাধারা যুগের আকাশে বাতাসে, বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের পাতায় তাহা ধরা পড়িলেও একান্ত দ্বিভিন্নমী বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে সে সামগ্রিকতাকে সচেতন ব্যবহারে আয়ত্ত করা আজও সহজ হইয়া উঠে নাই, আবার একান্ত গতিধর্মী ভোগবাদগ্রস্ত জড়বাদী পাশ্চাত্যও নূতন পথের জিজ্ঞাসু হইলেও সামগ্রস্যকে জীবনের মধ্যে নিতে আজও পারে নাই। তাই শ্রীনিত্যগোপাল-তত্ত্ব ও জীবন কালের অপেক্ষায় ধীরে, অতি ধীরে মানুষের সচেতনতায় আসিতেছে। নিজেকে যিনি 'নিত্যানন্দ ব্রহ্ম সনাতন' বলিয়া আত্মধ্যান লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আগমন-বার্তা অলক্ষ্যে ঘোষিত হইয়া গিয়াছে—তবু আজও তিনি আসিতেছেন—আসিতেছেন—আসিবেন। আমরা শুধু অপেক্ষা করিয়া থাকিব, প্রস্তুত হইতে চেষ্টায় থাকিব—তিনি উদ্ভাসিত হইবেনই তাঁহার আপন জ্যোতিতে—শুধু সময়ের অপেক্ষা।

রবীন্দ্র জন্ম-স্মরণে :—

একজন বন্ধু প্রায় বিশ বৎসর আগে বলে-ছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী প্রভৃতি ছাড়া আর বই অচল, উহারা কালজয়ী নয়'। এ কথার প্রসঙ্গে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথকে খুব কম লোকই বোঝেন। রবীন্দ্র-নাথ 'অচল', ইহা এক হিসাবে সত্য। রবীন্দ্র-নাথের 'ভাষ্য' না করা হইলে উহা আরও দীর্ঘ দিন অচল থাকিবে। যেহেতু কেহ রবীন্দ্রনাথ বোঝে না, সেই হেতুই তাহা চলিবে না। উজ্জ্বল-ভারত তো রবীন্দ্রনাথের বহু গ্রন্থের 'ভাষ্য' দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ না চলিলে এ জাতিও চলিবে না। 'রবীন্দ্রনাথ অচল' অর্থ জাতি অচল। রবীন্দ্রনাথের পরের কথা এ যাবৎ কেহ বলেন নাই। গান্ধীজী কতকটা ভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কথা কিছু কিছু বলিয়াছেন। তুলনা চলে না।

কর্মক্ষেত্রে ধর্ম-প্রচেষ্টা গান্ধীজীর অবদান। বিদ্যমানতা দুইয়েই সমানভাবে প্রকট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি গান্ধীজীর ছিল কি? পরস্পর-বিপরীত সত্যদ্বয়ে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাত্মাজী moralist, রবীন্দ্রনাথ artist। রবীন্দ্রনাথ হাসিক, মহাত্মাজী ভাবুক। অথচ মৌলিক সাদৃশ্যও আছে।—১৬.৮.১২৫৭।

রবীন্দ্রনাথ যদি জাতির জীবনে ফুরিয়ে গিয়ে—অচল হন—তাহলে এ জাতির দুর্দিন ঘোচাবার লোক নেই। আর রবীন্দ্রনাথকে বোঝা হয় নি বলেই যদি তিনি অচল হন—তাহলে আমাদের বাঁচবার আশা আছে। রবীন্দ্রনাথকে বুঝি নি বলেই আজও তিনি অচল—তিনি ফুরিয়ে যান নি এখনও। ১২৫ বৎসর আগে তিনি এসেছিলেন, এরই মধ্যে তাঁর কথা পুরোণো হয়ে গেছে এত অল্প তাঁর রচনা ছিল না। রস-সাধক রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা আবৃত্তি করতে পেয়ে জাতি নিশ্চিন্ত—মনে করল খুব বুঝেছে। কিন্তু তাঁর সমস্ত রচনার পেছনেই যে একটি দার্শনিক পটভূমিকা আছে, যা ছেয়ে বিরাটকে, ব্যাপককে ছুঁয়ে যায়, তেমনি গভীরতায় অতলে ডুব দেয়, তাঁর সমস্ত চিন্তাধারা যে নূতন জীবন-চেতনার দ্যোতনা আনে—জাতি সে সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত অবহিত নয়। সে পটভূমিকা, সে নূতন চেতনা জাতির জীবনে ফল ফলে জাতির চেহারা বদলে যেত কবে। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা দুইটি বিপরীত সত্যকে তিনি মিলিয়েছেন—যেখানে দেখা যাচ্ছিল প্রাচ্য পাশ্চাত্য শুধু বিরুদ্ধ, শুধু পরস্পর-স্পর্ধী, সেখানে তিনি এমন যোগাযোগের করে মিলিয়ে তুলেছেন যে কখন যে দুই সত্যতার সেই তীব্র বিরোধটা ধরে পড়েছে—তা যেন সাধারণ মানুষ টেরই পেল না। কথাটি সম্পূর্ণ ঠিক হল না—বিজিত বিজেতার সম্পর্ক ছিল বলেই অনেকখানি নিঃসঙ্গে রূপান্তর ঘটেছে—কিন্তু এর পরেও যে চিন্তাশীলতার ক্ষেত্রে বিপরীতকে রবীন্দ্রনাথ মিলিয়েছেন—তার প্রমাণ তাঁর সমস্ত সাহিত্য জুড়ে। পাশ্চাত্যের ঐকান্তিক গতিতত্ত্বকে তিনি উপনিষদের মধ্যে স্থিতি-গতির সামঞ্জস্যপূর্ণ মন্ত্রে পরিপাক করবার পথ পেয়ে জাতির সামনে তা তুলে ধরেছেন—এইখানেই তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য—তাই তিনি অচল হন নি—তাঁকে এখনও অনেকদিন ঘুরে বুঝতে হবে। এখনও ঐকান্তিক জড়বাদ তথা গতির উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিক্রিয়া জাতির জীবনের পদে পদে—সে কি উপনিষদের 'তদ্ এজতি তদ্ ন এজতি'—র, কিংবা 'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে' মন্ত্রের সার্থকতা চিন্তায় বা ব্যবহারে সম্ভব করতে পেরেছে? রবীন্দ্রনাথ কি ফুরিয়ে গেছেন? তাই একটি নিজস্ব কবিতা :—

'আমার রাজার বাড়ী কোথায়
কেউ জানেনা সে তো।
সে বাড়ী কি থাকত যদি
লোকে জানতে পেত।
রূপো দিয়ে মোড়া গাঁথা,
সোনা দিয়ে ছাত,
থাকে থাকে সিঁড়ি ওঠে
পান্না হীরের সাত।
সাত-মহলা কোঠায় সেথা
থাকেন দুয়োরাণী

সাত রাজার ধন মাণিক গাঁথা
গলায় মালাখানি
আমার রাজার বাড়ি কোথায়
গোন্‌য়া, কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব
আছে যেইখানে।

—শিশু তার কল্পনায় তাহার অবাস্তব অসম্ভব অনেক কিছু ভেবে—বড়য়াও বা করবে ভাষান্তরে—চট্ করে নিজেকে নামিয়ে আনল তার আয়ত্তাধীন পরিচিত ছোট্ট কোণটুকুতে—ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেইখানে—এইখানে তার আশ্রয় ও অভয়—যত ভালই লাগুক আকাশে উড়তে—গৃহকোণটুকু থাকলেই তা ভাল—ফিরতে হবে সেই ছাদের পাশে তুলসি গাছের টব আছে যেইখানে। অসম্ভব কল্পনা—আকাশে ওড়া—আর গৃহকোণটুকুর আশ্রয় ও অভয় উভয়ই যে একত্র চাই—জীবনের এত বড় সত্য কথাটি রবীন্দ্রনাথের ঐ শিশু-কবিতাটিতেও—কিন্তু এতখানি দার্শনিক বিস্তার যে এই ছোট্ট সুন্দর কবিতাটুকুর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তা কতজন উপলব্ধি করতে পারবে? তাই বলি রবীন্দ্রনাথকে বুঝি নি বলেই তিনি চলতে পারেন নি—এখনও দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে বুঝতে হবে। তাতি সুদ্ধ হতে তাঁকে বোঝা দরকার।

ভগবান বুদ্ধদেব অন্য-স্মরণ :—

ভারতবর্ষের স্থিতিধর্মী চিন্তাধারার প্রবর্তক এক কথায় আচার্য শঙ্কর, আর বুদ্ধদেব হচ্ছেন Father of Democracy—গতিধর্মের প্রকাশক। বুদ্ধদেব-প্রচারিত চিন্তাধারার মূল অর্থের সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। আমরা শুধু জানি বুদ্ধদেব অহিংসা-ধর্ম প্রচার করেছেন, কিন্তু তিনি যে জীবনের গতিধর্মকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর জীবনবাদ স্থাপনা করেছেন, সেটা আচার্য শঙ্করের ঠিক উল্টো—একথা আমরা জানি না বললেই হয়। গতিকে স্বীকার করলেই অশুভ, চঞ্চলতাকে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকে নিজেকে একান্ত সত্য করে ফেলেছিলেন বলে দুইজনেই জীবন সম্বন্ধে সত্য কথা বলতেও মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য হয়ে গেলেন। জীবনের গতিধর্মকে স্বীকার করে বুদ্ধদেব মানুষের মূল্য সর্বাগ্রে স্থাপন করেছিলেন—প্রাণকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু 'বেদ' না মেনে যে শক্ত morality-র উপর তিনি তাঁর চিন্তাধারাকে দাঁড় করিয়েছিলেন, সেই 'শক্ত morality-র কঠিন পেষণে সে প্রাণ অন্তর্হিত হইল। বর্তমানে চলিতেছে বুদ্ধযুগ; প্রাণ-সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ক্ষণিকবাদের ভিতর দিয়া সমাজকে মুক্তি-ক্ষেত্ররূপে, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্ররূপে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের প্রতিভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন'। তাই বুদ্ধদেবের চিন্তাধারা সম্বন্ধে আমাদের অনেক কিছু জানবার আছে। অথচ পুরুষোত্তম-দর্শনের দুই অপরার্ধ—শঙ্কর-দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন। একান্ত করে দেখলে এঁরা প্রত্যেকেই জীবনের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়েন—কেননা জীবন একান্ত গতিও নয়, একান্ত স্থিতিও নয়—জীবন এই দুইকে নিয়ে দুইয়েরই ঊর্ধ্বে। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখছেন, 'বৌদ্ধদর্শন যখন পুরুষোত্তম দর্শনের একটি বিচিত্র রূপ, তখনই তাহার বাস্তবের উপর্য্যাখ্যান সত্য বাস্তব; অন্যথা সে নিজের মধ্যেই নিজে ফাঁকি, শূন্য। উৎপাদ-ক্ষণ ও নিরোধ-ক্ষণের তরঙ্গে তরঙ্গে দোল খাইতে খাইতে অনন্ত কাল চলিয়াছে। পুরুষোত্তম-স্বভাব কোন একটী আশ্বা-

দনেই আটকাইয়া যাইবে না। সে একান্ত উৎকেন্দ্রিক নয়, সে একান্ত নিরোধও নয়,-সে একান্ত সৎও নয়, একান্ত অসৎও নয়। সে দুইয়ের অতীত, অথচ দুইয়ের সমন্বিত সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মবস্তু। আচার্য শঙ্কর যেমন নমস্য, ভগবান বুদ্ধও তেমনি নমস্য—ভারতের বুকে দুইয়েরই অবদান প্রচুর—এবং দুইকেই নূতন করে নূতন পটভূমিকায় বুঝতে হবে—তাহলেই তাঁদের আশীর্বাদ আমাদের জীবনে প্রকাশিত হবে। আমরা বুদ্ধ পূর্ণিমায় পুণ্যশ্লোক ভগবান তথাগতের জন্ম, সত্যলাভ ও মোহনির্বাণের দিনটিকে স্মরণ করে তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

শ্রীশ্রীনিতাগোপাল-ভক্ত শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের মহাপ্রয়াণকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে। আজ হইতে ১৮ বৎসর আগে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীশ্রীনিতাগোপালের পুণ্য সমাধি-ক্ষেত্র বালিগঞ্জ-স্থিত মহানির্বাণ মঠে (১১৫ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯) শ্রীশ্রীনিতাগোপালের জন্মতিথি বাসন্তী অষ্টমী এবং নবমী দশমী তিনদিন শ্রীনিতাগোপাল-জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে ভাষণদানান্তে আলোচনা-কালে অচেতন হইয়া পড়েন। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞানলাভ হওয়া সত্ত্বেও তিনি আর সুস্থ হন না। সুখলাল কারণানি হাসপাতালে দ্বাদশী দিন ভোর ৫-৪০ মিনিটে তিনি ৯২ বৎসর বয়সে। তাঁহার পুণ্যদেহ হাসপাতাল হইতে মহানির্বাণ মঠে ও তথা হইতে বাগুইআটী-স্থিত তৎপ্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রমে আনীত হয় এবং রাত্রি ৮টার পর ঐ স্থানে সমাধি দেওয়া হয়। চলিয়া যাইবার মাত্র দুই বৎসর আগে এই বাগুইআটী গ্রামে নরনারায়ণ আশ্রম স্থাপন করিয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীশ্রীনিতা-গোপালের সেবাপূজা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই ১৮ বৎসর ঐ সেবাপূজার সঙ্গে তাঁহার জীবনদর্শন আচরণ ও প্রচারের প্রচেষ্টা এবং সেই সঙ্গে সমাজ-কল্যাণ-মূলক কাজ—দুইটি শিশুদের বিদ্যালয়, একটি ঔষধালয় ও মেয়েদের একটি সেলাইস্কুল—চলিতেছে। স্বরূপ বিশ্বরূপ সমন্বিত পুরুষোত্তম-সাধক শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের মহাপ্রয়াণকে স্মরণ করি—তিনি আছেন—রূপান্তরে আমাদের মধ্যেই আছেন—এইখানেই আছেন। তাই নরনারায়ণ আশ্রম চলিতেছে, চলিবে। তাঁহার মুক্ত স্বচ্ছ জীবন নূতন সমাজ-গঠনে পথ-প্রদর্শক—আমরা তাঁহাকে ও তাঁহার জীবন-দেবতা শ্রীশ্রীনিতাগোপালকে বুঝিবার ও বুঝাইবার অনলস প্রয়াস চালাইয়া যাইব।

গীতাশাস্ত্রী যুগাচার্য জগদীশ চন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা

মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা টিপ্পনী ভাষ্য রহস্যাদি ও বিস্তৃত মূল্যবান ভূমিকাসহ। শঙ্কর, শ্রীধর, বলদেব, বঙ্কিম, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গীতাচার্যগণের মতালোচনা পূর্বক সম্পাদিত। অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা ও ভক্তিমূলক উপসংহার। জ্যাকেট সহ কাপড়ে বাঁধাই ১৫·০০ টাকা। প্লাষ্টিকের জ্যাকেট সহ ১৭·০০ টাকা।

শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর শ্রীগীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ। "যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলাভাষায় শ্রীজগদীশ চন্দ্রের গীতা। "যতদিন বাংলাভাষা থাকবে জগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।" ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

গীতার অন্যান্য সংস্করণ

বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০	নিত্য পাঠ্য গীতা	১·৫০
সুলভ পকেট গীতা	২·৫০	সন্ধ্যাপাঠ্য ক্ষুদ্র গীতা	১·০০
লঘু গীতা	২·৫০	ঐ প্লাষ্টিক জ্যাকেট সহ	১৫·০০

জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫·০০	ভারত আত্মার বাণী	৭৫·০০
কর্মবাণী	১·৫০	Soul of India speaks	৭·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১৫·০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বগরামে বাঙালী	৪·০০	ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৩·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০	মানুষের মত মানুষ	১·৩০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৫·০০	বঙ্কিমের গল্প	১·৫০
বাংলার ঋষি	৫·০০	বিদ্যাসাগর	৩·০০
বাংলার বিদুষী	৩·৫০	ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের	
বাংলার মনীষী	২·৫০	শরীর ও শক্তি	৩·০০
জীবন গড়া	০·৭৫	নীরোগদেহে দীর্ঘ জীবন	২·৫০
রাজর্ষি রামমোহন	৩·০০	সরল যোগ-ব্যায়াম	৩·০০
আচার্য জগদীশ	৪·০০	যোগ-ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য	৩·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২·৫০	ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	২·৫০	যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৫·০০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০		

ব্যবহারিক অভিধান ১৪·০০

সর্বদা ব্যবহার্য সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনব অভিধান। পরিবর্ধিত সংস্করণ। শব্দসংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার

প্রে সি ডে সি লা ই ব্রে রী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

তুমাকে তুমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণত্ব। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, তুমিহীন তুমার উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। দুইকে একত্র অন্বিষ্টা পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে।

"On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious man will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man namely the exploitation of man by man.

Occasional Speeches--Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ গড়বার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের [illegible] মুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে—

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

॥ মুদ্রিত ॥

১। ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
২। বেদান্ত (চতুঃসূত্রী)
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)
ঈশোপনিষৎ
কেনোপনিষৎ
কঠোপনিষৎ
প্রশ্নোপনিষৎ
ঐতরেয়োপনিষৎ
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
মুণ্ডকোপনিষৎ
শ্রীনিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে ৫·০০
স্বরাজের পূর্বরূপ ০·৫০
গীতাজয়ন্তী ০·০৬
উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা) ০·৫০
মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে
পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা ৩·০০
(গান্ধী স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)
১৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১২·০০

॥ পাণ্ডুলিপি ॥

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
২। দশ বৎসরের বিপদগ্রী, পত্নীবিয়োগ, ভারত ভ্রমণাদি।

॥ প্রতিভা রায়ের ॥

নারী-প্রগতির জন্মকথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য
নিত্যগোপাল ও শিষ্যা সুধার কথা ০·৩১
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ৬·০০

10 MAY 1976

॥ শ্রীমতী রেণু মিত্রের ॥

১। সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল ১·৫০
২। রবীন্দ্রনাথের ঘরেবাইরে ২·০০
৩। শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন ৩·০০
ওরিয়েন্ট বুক কোং প্রকাশিত
৪। রবীন্দ্র-হৃদয়
৫। প্রাথমিক শিক্ষা

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম: বাগুইআটি, পো: অধিনীনগর, থানা-বেলেঘাটানগর, কলিকাতা-৫৯) ২৪ পরগণা।

শ্রীবিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পো: অধিনীনগর, কলিকাতা-৫৯ হইতে প্রকাশিত, প্রিন্টিং সেন্টার, (১/১, বে, বি, লাইব্রেরী) হাতিয়াড়া, হইতে মুদ্রিত।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত-প্রতিষ্ঠিত
বরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল বাণী ॥

"[illegible]-অনিত্য সমন্বয় আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়। "এই বিশ্বই আমার মহামঠ"
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব সমন্বয়।"

[illegible]-আশ্বিন '৮৫. সম্পাদিকা— [illegible] ১১শ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

গীতাবাদ্বী মনস্বী জগদীশ চন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা

মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা [illegible] ও বিস্তৃত মূল্যবান ভূমিকাসহ। অক্ষর, শ্রীধর, মধুসূদন, বঙ্কিম, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গীতাচার্যগণের মতালোচনাপূর্বক সম্পাদিত। অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা ও ভক্তিমূলক উপসংহার। জ্যাকেট সহ কাপড়ে বাঁধাই ১৫·০০ টাকা।

শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অমর কীর্তি। তাঁর শ্রীগীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ। "যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলাভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা"। "যতদিন বাংলাভাষা থাকবে, জগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।" ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

গীতার অন্যান্য সংস্করণ

বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০	মিতা পাঠ্য গীতা	১·৫০
সুলভ পকেট গীতা	১·৫০	সদাপাঠ্য ক্ষুদ্র গীতা	১·০০
লঘু গীতা	২·৫০	ঐ প্লাস্টিক জ্যাকেটসহ	১·৫০

জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫·০০	ভারত আত্মার বাণী	৭·৫০
কর্মযোগী	১·৫০	Soul of India speaks	৭·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০

সুলেখক শ্রীসুনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	
বীরত্বে বাঙালী	
বিজ্ঞানে বাঙালী	
বাংলার কবি	
বাংলার বিদুষী	
বাংলার মনীষী	
জীবন গড়া	
রাজর্ষি রামমোহন	৩·০০
আচার্য জগদীশ	৪·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০

শ্রীনিলীমা ঘোষ এম, এ, বি, টি

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৩·০০
মানুষের মিত মানুষ	১·৩০
বঙ্কিমের গল্প	১·৫০
বিদ্যাসাগর	৩·০০

ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের

শরীর ও শক্তি	৩·০০
নীরোগদেহে দীর্ঘজীবন	২·৫০
সহজ যোগ-ব্যায়াম	৩·০০
যোগ ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩·০০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৩·০০
যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৫·০০

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৪·০০

সর্বদা ব্যবহার্য সর্বাঙ্গসুন্দর অভিধান। পরিবর্ধিত সংস্করণ। শব্দ সংখ্যা প্রায় ৬৫ হাজার।

প্রে সি-ডে সি লা ই ব্রে রী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

উদ্বোধন

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৮৩, খ্রী: ১৯৭৬ উনত্রিংশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিত দুইটি পত্রের অংশ

"...যাহারা কিছু করিয়াছে, আগে প্রাণের ভিতর সাড়া পায়, পরে তাহার অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া জবাব পাওয়া যায়। সব জবাব দিয়া রওয়ানা হওয়া কাহারও কপালে হয়ও নাই, হইবেও না। তাই তো ঋষি দিবার কথা বড়র দল বলেন। 'নূতন যুগের ভোরে' গানটি প্রণিধানযোগ্য। বুদ্ধির অবশ্য দাবী বটে সকলের সব প্রশ্নের জবাব দিয়া রওনা হওয়া। কিন্তু অনিশ্চয়েই দেখে বুদ্ধি কতটুকু পথ দেখাইবে? তাই তো প্রাণ-সাধনার কথা সব যুগ-সাধক বলিয়াছেন। অনিশ্চয়ের-সাগর পাড়ি দিতে হইলে প্রাণকে কাণ্ডারী করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ... নিজের জীবনে যদি কোথাও প্রেরণা পাইয়া থাক যাহার ভিতর অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সমাধান আছে, যাহা অনিশ্চয়তার ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে সব আগত অনাগত প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হইবে, তবে তাহাকে সম্বল করিয়া যে কয়েকজনের মধ্যে পার ছড়াইয়া দেও। সকলের সব প্রশ্নের জবাব আজই দেওয়ার মত বুদ্ধির অযৌক্তিক দাবী পরিত্যাগ কর। মানুষের যত কিছু প্রশ্নের জবাব আজই দিয়া উঠিতে না পারার একটা প্রকাণ্ড দুর্বলতা তোমাকে পাইয়াই আছে। সে আজ নয়। মহাত্মাজী কবে কয়টা প্রশ্নের কয়টা মনঃপূত জবাব দিয়াছেন বলিতে পার কি? কে তাঁহার জবাব শুনিয়া চরকা চালাইয়াছে? তবুও তিনি বলিয়া যান। বিশ্বের সেবায় আত্মপ্রত্যয়ই প্রথম মূল সম্বল; অবশ্য বিশ্বের সব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া সে নিজের মধ্যেই নিজে যাচাই করিবার চেষ্টা করিবে। নিজের মধ্যেই কি আজই সব মীমাংসা হইবে? তাহাও হইবে না। তাই বৃহৎ কাজে intuition না জাগিলে বুদ্ধির হিসাব দিয়া অগ্রসর হইতে গেলে আটকাইয়া যাইতে হইবে অচিরাৎ। ... "

অপর একটি পত্রে পুনরায় লিখিতেছেন—

"তুমি লিখিয়াছ, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সকল জবাব দিয়া যেদিন নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব, সেই দিনই কাজ হইবে। ... অহিংসার বিরুদ্ধবাদীদের সব জবাব দিয়া গান্ধীজী অহিংসামন্ত্র শুনান নাই। যাহার নিজের জীবনে তত্ত্ব সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছে, তিনি নিজের কাছে মোটা-মুটি সকল প্রশ্নের জবাব পাইয়াছেন, তিনিই জন-সাধারণের কাছে তাহা বলিবেন। 'কি হবে কি হবে না' এই ভাবনায় বসিয়া থাকিলে সব প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া কাজে নামিবার লালসা থাকিলে কাজে নামা আর হইবে না। যে যাহার দৃষ্টি-ভঙ্গিতে static ইহা মনে রাখিও। তুমি চাও দৃষ্টি ভঙ্গির সমন্বয় জীবনের মধ্যে, তুমি কেমন করিয়া তাহাদের static দৃষ্টি ভঙ্গির দাবী ও সমস্যা সমূহের সমাধান করিবে? কেননা তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি static হওয়ায় তার দাবীর মধ্যে ও সমাধানের মধ্যেও ভুল রহিয়া রহিয়াছে। তুমি materialism ও idealism এই দুই দৃষ্টি ভঙ্গির সমন্বয় চাও। কিন্তু তুমি materialist-দের সব

দাবী ও তাহার মীমাংসা কি করিয়া পারিবে? যেমন তেমন করিয়া 'Eat drink and be merry' হওয়ার দাবী কি তুমি পূর্ণ করিতে পারিবে? যেখানে মূল দৃষ্টি ভঙ্গির rigidity পরিবর্তন দরকার হইবে, সেখানে rigid দৃষ্টি-ভঙ্গির rigid দাবীগুলির rigid জবাব কি করিয়া দিবে? প্রত্যেক দৃষ্টিভঙ্গির সুবিধাও আছে, অসুবিধাও আছে। ···অরাজ হইলে সকলেরই সুবিধা হইবে মনে ভাবিয়া যদি ভাবিতেছে আমাদের অসুবিধাই যদি থাকিল কিছু বাড়িয়া চলিল, তবে স্বরাজ কিসের জন্য? সুবিধা যেটুকু আছে তাহা তো থাকিবেই, অসুবিধা টুকু যদি তুমি দূর করতে না পার, তবে আর তোমার স্বরাজে আমাদের কি লাভ? ইহাদের সঙ্গে জবাব দিয়া কি পারিবে বেণু? নিজে বোঝ, নিজে বিশ্বাস কর, নিজের জীবনে আয়ত্ত কর। সমাজীয়দের মধ্যে বোঝাপড়া কর, জীবনে জমাইয়া তোল, জন-সমাজের বুকের মধ্যে বসিয়া তাহা ছড়াইয়া দেও। নিজের মধ্যের প্রশ্নও মীমাংসিত হইবে, অন্যের প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারিবে। সারা জগতের সারা দৃষ্টিভঙ্গির জবাব দিতে গেলে তাহার মাঝে নিজেকে হারাইয়া ফেলিবে। এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিবে না। যে যাহার কথা বলিয়া যাও, যতদূর পার নিজের জীবনের সঙ্গে ও তাহার জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া লও। সেখানে বোঝাপড়া হইয়া গেলে বিশ্বের সব জায়গায় তাহা মিলিবে। কয়েকটা বাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়া ৩×৫=১৫ শিখিলে বিশ্বের মধ্যে তাহা মিলিবেই। কয়েকটা জীবনের মধ্যে সকল শ্রেণীর প্রশ্নের শেষ জবাব বুঝিয়া লও, বিশ্বের পিছুপিছু হৈ হৈ করিতে হইবে না। প্রশ্ন আছে কাহার? জবাবই বা কি দিবে? ওগো জীবন-পথের পথিক, বাক্যবাগীশ মত-বিলাসী শ্রুতি-বিপ্রতিপন্ন মানুষের partial প্রশ্নের জবাব দিয়া হয়রাণই হইবে, অবসন্ন হইবে, পথ বাহির হইবে না। নিজেদের জীবনের মধ্যে মীমাংসা করিয়া শুধু বলিয়া যাও, শুনুক আর না-ই শুনুক। সব প্রশ্নের জবাব হইবে না, হয় না। তবু ঘাবড়ানো চলিবে না। ভগবান বেদব্যাস সকল পুরাণ লিখিয়াও নিরাশায় বলিয়াছেন, 'ঊর্দ্ধবাহু হইয়া চীৎকার করিয়া আমার কথা বলিলাম, কেহ শুনিল না'। লক্ষ কণ্ঠে স্পষ্টভাবে বলিয়া যাও বহু ছাপাইয়া, প্রবন্ধ লিখিয়া, ছোট গল্প লিখিয়া, গান রচনা করিয়া, যতখানি পার খাপ খাওয়াইয়া বলিতে চেষ্টা কর। তাহাও একদিনে হইবে না, তাহাও সময়-সাপেক্ষ। প্রথমে দিতে হইবে একটা মতবাদের ধাক্কা, তাহার পর তাহার প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুব্ধিত হইবে জনসাধারণের মনে বিশ্বাস। ধাক্কা দেও পুরুষোত্তম-প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া। নিজের ক্ষেত্রে নিজে দৃঢ় থাকিতে পেরিলেই মানুষ তোমার কাছে মাথা নোয়াইবে। যদি তোমার মত বিশ্বের সুরে বাঁধা থাকে তবে তো কথাই নাই। নিজের দৃঢ়তাই হইতেছে সবচেয়ে বড় জবাব। তুমি যাহাকে জীবনের রক্তমাংসের মধ্যে আয়ত্ত করিয়াছ তাহাই হইবে সত্য কথা কাটাকাটির মধ্যে চরম জবাব। এই জবাব দিবার জন্য প্রস্তুত হও।···

নদীটার মধ্যে কচুরীপানার ঠাসাঠাসি ছিল, কাল রাত্রিতে হঠাৎ তাহা চলিয়া গিয়াছে। জীবনের পথ রোধ করিয়াও এমনি কত জঞ্জাল ঠাসাঠাসি করিয়া থাকে, হঠাৎ কোন্ ইঙ্গিতে, কোন্ লাগরের কোন্ বান ডাকিয়া তাহা ভাসাইয়া লইয়া

যার কে জানে? তাঁহার কাছে মাথা নত করিয়াই কর্মীকে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হয়। বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর জীবনের সাক্ষীরূপে না থাকিলে, উহাদের উপর প্রচণ্ড বিশ্বাস না করিলে বিচারের হাতে পানি মিলিবেনা, বিচার কর্মীর তরী ডুবিই করিবে। বিশ্বাসকে সঙ্গে লইয়াই বিচার—ইহা পুরুষোত্তম-জীবনের সাধনার কৌশল। ..."

[প্রথম পত্রটি ২৮. ৮. ১৯৪৭ এ এবং দ্বিতীয় পত্রটী ৩. ৯. ১৯৪৮ এ লিখিত]

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ সমালোচনা

শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়

"On the literary stock-exchange reputation fluctuates notoriously, and it is premature to conclude that the world outside will not some day rediscover Tagore."

আজ থেকে তের বছর পূর্বে যখন দেশে বিদেশে রবীন্দ্র শতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপনের সমারোহ চলছিল তখন এই কথাগুলি বলেছিলেন জনৈক বিদেশী সাহিত্য-সমঝদার। কথাটা পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবী মহলে বহুলাংশেই সত্য, কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় বিদেশের সাহিত্যে ও সংস্কৃতির ঘাটে তাঁর যে ও যতটা জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা গেছে, এখন তা দেখা যায় না।

কিন্তু এদেশের বেলায় একথা ঠিক খাটে না। নৃত্যগীত, নাটক এবং বিশেষ করে গান অর্থাৎ রবীন্দ্রসঙ্গীতের দৌলতে কবির জনপ্রিয়তা ক্রম-বর্ধমান বলেই মনে হয়। তবু অতিশয়োক্তিতে আমরা রবীন্দ্রনাথকে গান আর নৃত্যনাটকের সীমিত গণ্ডীর মধ্যেই যেন আবদ্ধ রাখতে চাই। তাঁর বিপুল-প্রসারিত ও বিচিত্র প্রতিভাদীপ্ত জীবনের অন্য দিক গুলির প্রতি যেন কিছুটা ঔদাসীন্যই প্রকাশ পায়। এর কারণ অবশ্য অতি স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষের স্বভাবই হচ্ছে সহজ পথ বা shortcut বেছে নেওয়া। গান আর নাচের অনুশীলনকেই যদি আমরা রবীন্দ্রচর্চার সহজসাধ্য উপায় রূপে বেছে নেই তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে! রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় কবি, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, রবীন্দ্র-নাথ মহাকবি। যে ভাবেই তাঁকে দেখিনা কেন তাঁর তুঙ্গস্পর্শী খ্যাতি ও গৌরবে আমরা বিস্ময়-বিমূঢ়।

কিন্তু খ্যাতি, যশ ও গৌরবের পথ কোনো দিনই কোমল কুসুমাস্তীর্ণ নয়। "Not roses roses all the way." দুর্গম পথস্তং। যশো-গৌরবের পথ চিরদিনই কণ্টকাবৃত। কিন্তু আজ রবীন্দ্রনাথের স্মরণোৎসবের দিনে একথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, বিপুল খ্যাতির অধিকারী রবীন্দ্র-নাথকেও একদিন বহু বিরূপতা ও অনেক বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অনেক কটু-কঠোর মন্তব্য বর্ষিত হয়েছিল তাঁর প্রতি। অনেকেই তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন। অনেকেই সেদিন স্বচ্ছন্দ-

চিত্তে তাঁর প্রতিভাকে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। অবশ্য গুণগ্রাহীর অভাব কোনো দিনই রবীন্দ্রনাথের হয়নি। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বহু মনস্বীই প্রভাত-রবির প্রতিভার অসামান্যতার আভাস পেয়েছিলেন। তাঁরা মুক্তচিত্তে বাংলা সাহিত্যের পূর্বগগনে রবিরশ্মির আবির্ভাবকে জানিয়েছিলেন স্বাগত। কিন্তু তার ব্যতিক্রমও ছিল কিছু কিছু। সমকালীন কবি ও সাহিত্য সমালোচক কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের অভিনব প্রকাশ ভঙ্গী এবং রবীন্দ্র কাব্যের ভাষা ও ভাবধারা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। সেই শ্রেণীর কয়েকজন বিরূপ সমালোচকের কথা আজ স্মরণ করায় কোনো ক্ষতি নেই। কেননা, সমালোচনার নিকষেই প্রতিভা কালোত্তীর্ণ বলে প্রমাণিত হয়। রবীন্দ্র নাথের বেলাতেও এ-কথা খাটে।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে ছিলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। তিনি ছিলেন parody-তে সিদ্ধহস্ত।

ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরার কাছে ছড়ায় লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—

তোদের কেলে সারাটা দিন
আছি অমনি একরকম।
খোপে বসে পায়রা যেমন
কচ্ছে কেবল বকবকম্।

কালীপ্রসন্ন ব্যঙ্গ করে লিখলেন—

উড়িসনে যে পায়রা কবি
খোপের ভিতর থাক চাকা।
তোর বক্ বকুম্ আর কোঁস কোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাবমাখা!
তাও ছাপালি গ্রন্থ হল
নগদ মূল্য—এক টাকা।

* * *

কালীপ্রসন্ন অন্যত্র বলছেন—

মাছ খেতেছ বেশ করেছ
জলচরের জাত।
আর ভেসো না আর ভেসো না
হবে কুপোকাৎ।
কতই সাধে বাচ্ছে কবির,
আহা মরে যাই।
পায়রা ছিল, মাছ হয়েছে,
মাচ্ছে উড়ো ঘাই!
কবি তুমি মানুষ বটে
হ'লে পায়রা মাছ।
সেলে স্থলে, শূন্যে জলে
বাকি কেন গাছ?

এই সব বাঙ্গোক্তি অনেক ক্ষেত্রেই বেশ রূঢ় ও অশালীন।

রবীন্দ্রনাথের আর এক বিরূপ সমালোচক ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদক সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র)। রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত "পসারিণী" কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা একেবারে নস্যাৎ করে সুরেশচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন—

"এই কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কি উৎকট দার্শনিকতায় ও উদ্ভট আধ্যাত্মিকতায় উন্মত্ত প্রলাপ নহে? 'নির্জন গুপহরে' কবি যদি আধা-চাকা বাঁধা বটতল দেখাইয়া কোনও পসারিণীকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে কি মনে হয় যে সসীম অসীমকে

আহ্বান করিতেছেন? * * * নির্জন দুপুরে শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতলায় পশারিণী ও কবি অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হইয়া গেল! ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথের পশারিণীর হাতে ঝাঁটা ছিল না, তাই রক্ষা! নতুবা কি হইত, বলা যায় না। হে ভগবন্, রবীন্দ্রনাথ নবযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব,—তুমি উহাকে এই অন্ধ ভক্ত-সম্প্রদায়ের নির্লজ্জ স্তাবকতা, নির্ভর্সা খোসামুদি ও নিরবচ্ছিন্ন বিড়ম্বনার নরক হইতে উদ্ধার কর।"

সংশ্লিষ্ট কবিতাংশ—

"দেখা দেখ শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতল;
ঝুলে কূলে ভরা দীঘি কাকচক্ষুজল।
থাক তব বিকি কিনি ওগো শ্রান্ত পশারিণী
এইখানে বিছাও অঞ্চল।"

অপর একজন প্রতিকূল সমালোচক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

"বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যের যে আকার ঠিক করিয়া গিয়াছেন তাহা আর সহজে বদলাইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র ছাঁচের উপর একটু কারিকুরী করিয়াছিলেন মাত্র, ছাঁচ বদলান নাই। রবীন্দ্রনাথ ছাঁচ বদলাইতে চাহিতেছেন, তাহা হইবার নহে। কারণ, বিদ্যাসাগরী ছাঁচ বাঙ্গালার সর্বত্র পঞ্চাশ বৎসর কাল স্কুলে, কলেজে, পাঠশালায় সমানভাবে চলিতেছে, সকল সমাচারপত্র ঐ ছাঁচে লেখা। উহা যে সর্বজন-সমাদৃত এবং ব্যবহৃত। উহার ব্যাপ্তি অত্যধিক, উহার গভীরতা প্রগাঢ়। একা রবীন্দ্রনাথ জন-কয়েক চেলা চামুণ্ডার সাহায্যে বাঙ্গালার গদ্য ছাঁচ বদলাইতে পারিবেন না এইটুকু আমরা স্থির বলিয়া জানিয়াই বৈবী-চক্রকে একদিন হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি, পরেও দিব। রবীন্দ্রনাথ যত বড় কবি হউন না, যেমন মেধাবী মনস্বী হউন না, বিশ্বা-মিত্রের সৃষ্টি করিবার উৎকট সাধনা তাঁহার নাই। তিনি বিদেশের ঠাকুর হইলেও স্বদেশের ত্রয়ত্রিংশ জাতির দেবতা হইতে পারেন নাই; তাঁহার ভাষার ব্যাপ্তি নাই, বিস্তার নাই—হইবেও না। কলি-কাতার ছোকরা-মণ্ডলে তিনি ঋষি হইতে পারেন, স্বয়ংসিদ্ধ দুই একজন সাহিত্য-সেবীর গাত্রকণ্ডূতির হেতু তিনি হইতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালার সাধারণ শিক্ষিত সমাজে তাঁহার প্রভাব বড়ই কম। তিনি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন ততদিন একটা গুজুক চলিতে পারে—চলিবেও। যাহারা দেশের দশ-জনকে লইয়া চলে, তাহারা রবির খোসখেয়াল অবহেলা করে। তবে স্বেচ্ছাচারের শাসন হওয়া কর্তব্য।"

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করেছিলেন কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্র-লাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন,

"কুনীতি বঙ্গসাহিত্যে ঢুকিয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালা কাব্য খুলিলেই "দুজনে দেখা হোল," "প্রতি অঙ্গ কাঁদে মোর প্রতি অঙ্গ লাগি" সে 'চারু বদন', 'রচেছি শয়ন' 'সে আসে ধীরে', 'সে কেন চুরি করে চায়' এই-ই-সব পাওয়া যায়। বাঙ্গালা কাব্যে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনার অভাব, অন্যদিকে তেমনই মানুষের মনঃপ্রকৃতির বর্ণনার অভাব। আমাদের দেশের কবিরা রমণীর পীন পয়োধর ও সরস অধর ছাড়া আর কিছুই জানিলেন না, বুঝিলেন না। যে দেশের প্রকৃতি নীলিমায়, শ্যামলতায়, পর্বতে উপত্যকায়, ক্ষেত্রে নির্ঝরে, সৌরভে, ঝংকারে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশকে পরাস্ত করিয়াছে, তাহার সন্তানগণ সেদিকে

একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে!"

A prophet is seldom honoured in his own land কথাটা যেমন সত্য, a poet is seldom honoured in his own age কথাটাও অনুরূপ সত্য। সমসাময়িক শক্তিশালী লেখক ও প্রভাবশালী মনীষী অনেকেই রবীন্দ্র-প্রতিভার যথাযোগ্য মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয় নি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে নিন্দা অপেক্ষা স্তুতি জুটেছে অনেক অনেক বেশী। তবু একথা সত্য যে, নিন্দা ও অপবাদের ঝড় তুফান পার হয়েই তিনি যশোগৌরবের শিখরে আরোহণ করেছেন। প্রশস্তির প্রবাহ প্রায় অব্যাহত চললেও, জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত তাঁকে বাক্‌বিদ্রূপের কষাঘাতও সইতে হয়েছে।

'শনিবারের চিঠির' সজনীকান্ত দাস, বিদগ্ধ কবি সুধীন দত্ত আর অতিযৌবনতায় স্থাবক বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি অনেকেই রবীন্দ্র-সমালোচনাকে ব্যঙ্গ মৌলিকতা জাহির করার হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেছেন। সাম্যবাদীদের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ একজন বুর্জোয়া কবি, সুতরাং নিন্দনীয় এবং পরিত্যাজ্য। এ-ছাড়াও আছেন অনেকে যারা রবীন্দ্রনাথকে স্বপ্নবিলাসী, অবাস্তব ইত্যাদি অপবাদ দিয়ে থাকেন। ভবিষ্যৎ বিশ্লেষকগণ তাঁর আরও নানা দোষ আবিষ্কার করবেন—সে কথাও ঠিক। তবু এ-কথা স্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথ কালের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছেন। ভাগ্যের উত্থান-পতনের মতো নিন্দা-স্তুতির আবর্তনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লোকমানসে অক্ষয় আসন লাভ করেছেন। কাব্য ও সাহিত্যের চিরন্তনতা নির্ধারিত হয় ভাব-সম্পদের দ্বারা, প্রকাশভঙ্গী দ্বারা নয়। ভাষার রূপ ও রচনাশৈলী কালে কালে বদলায়, কিন্তু content অর্থাৎ ভাববস্তু টিকে থাকে। ভাবের প্রগাঢ়তা বা চিন্তার অভিনবত্বের রবীন্দ্রনাথ ম্লান নহেন। তাই তথাকথিত আধুনিক সাহিত্যিকগণ পুরনো ও বাসী হয়ে গেলেও রবীন্দ্রনাথ থাকবেন চিরনবীন, টাটকা, তাজা। আজ আর রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকে কেউ উদ্ভট, উদ্ভ্রান্ত স্বপ্নালাপ বলে ধিক্কার দেয় না। বিষয়বস্তু ভাষা ও রচনাশৈলীও আজ অচল। রবীন্দ্রনাথের স্টাইলই আজ সর্বজন-গৃহীত।

রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচকগণ একটি জিনিস ভুলে যান। কালিদাস হিমালয় সম্বন্ধে বলেছেন—

"অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি-
জাতম্।
একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ
কিরণেষিবাঙ্কঃ॥"

নগাধিরাজ হিমালয় নানা রত্নের আকর, কিন্তু বড়োই হিমশীতল। কিন্তু সেজন্য তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির কোনো হানি ঘটে নাই। চাঁদের কলঙ্ক তার কিরণরাশির মধ্যেই ডুবে আছে। নানা গুণবিভূষিত ব্যক্তিরও এক আধটু দোষ থাকা স্বাভাবিক। সে দোষ ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

আজ কালজয়ী, নিখিল মানব-চিত্ত জয়ী কবি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূজায় মনে পড়ে— "Golden Treasury"র প্রখ্যাত সঙ্কলয়িতা প্যালগ্রেভের কথা—

Poetry, I hope, may be found by many a lifelong fountain of innocent and exalted pleasure; a source of ani

mation to friends when they meet; and able to sweeten solitude itself with best society,—with the companionship of the wise and the good, with the beauty which the eye cannot see, and the music only heard in silence.

রবীন্দ্র-কাব্যের মাধুর্য, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুরসুধা, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাপ্তি-বৈচিত্র্য এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের কর্ম ধর্ম সাধনাপূত জীবন কথা আমাদের মনকে আনন্দে ভরে দেয়, হৃদয়ে জাগায় নব নব ভাব এবং জীবনের লক্ষ্যকে করে দেয় উদার, ঊর্ধ্বমুখী। তাই ত রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রিয় কবি, আমাদের পরম বান্ধব, আমাদের আপনার জন। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের অশেষ ঋণ। কর্মী কবি শিল্পী দার্শনিক শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিয়েছেন অনেক। পাব আরও অনেক। রবীন্দ্র-প্রতিভার অবদানে মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা হয়েছে শতগুণে সমৃদ্ধ ও সঞ্জীবিত। তাঁর কাছ থেকে আমরা অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করতে পারি অপরিমেয় সুখ-কল্পনা, অক্লান্ত কর্ম-প্রেরণা, প্রগাঢ় জ্ঞান-গাম্ভীর্য ও অনাবিল বিশ্রাম-শান্তি।

সংস্কৃতির মিলন

শ্রীবিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কে একবার বলেছিলেন পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে। এর নিহিতার্থ এই যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মানুষ মানুষের কাছে আরও দ্রুত ও সহজভাবে আসছে। মিলন হয়েছে সহজ। এখন চৌরঙ্গীতে যুবক যুবতীদের যে বেশে লন্ডন ভ্রমণরত দেখবেন, টোকিওর গিনজা অঞ্চলেও ওদের প্রায় ঐ বেশেই দেখতে পাবেন। যে যুগে পৃথিবী মানুষের কাছে অপরিচিত ছিল সে যুগেও মানুষে মানুষে এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে মিলন হয় নি তা নয়। তবে জিনিসটা অনেক মানুষের অনেক মেহনৎ, অনেক আত্মত্যাগ, সময়ে সময়ে অবরদস্তি এবং সর্বশেষে দীর্ঘ সময়ের অভি-ব্যক্তির ফলে সংঘটিত হয়েছে। বর্তমানে এই মিলন অতি দ্রুতভাবে হচ্ছে। এর কারণ শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিই নয়। এর একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও আছে। শিখেদের কাছে তাদের 'কৃপাণ' পবিত্র হলেও শত্রুনিধনে রাইফেল অনেক বেশী প্রয়োজনীয় এবং ব্যবহৃত, যেমন পৃথিবীর অন্য জাতি বা সম্প্রদায়ও একই প্রয়োজনে ঐ একই অস্ত্র ব্যবহার করে, এবং তা স্বাভাবিক কারণেই। তবে সংস্কৃতির দ্রুত মিলন ঘটে জন-গণের অংশ গ্রহণে, কখনও বিচারের মধ্য দিয়ে, কখনও গড্ডালিকা প্রবাহে।

বর্তমান আলোচনাটির পরিধি অবশ্য অনেক সঙ্কীর্ণ: বাঙলা সংস্কৃতি এবং তাও এপার বাঙলায়। বাঙলা বলতে মোটামুটি বুঝি রবীন্দ্রনাথকে। একে

তো তিনি একাই একশো, না—লাখ, কোটি। তা ছাড়া এখনও বাইরে উনিই তো মুখ রেখেছেন। কোন অবাঙ্গালীর রবীন্দ্রনাথকে অপমান করা মানে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকেই অপমান করা। কিন্তু 'এও বাস্থ, আগে কহ আর'। এই সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা প্রবহমান। তাদের মধ্যে ক'টি শীর্ষস্থানীয় চিন্তা নিয়ে আলোচনা করে বোঝবার চেষ্টা করব—এগুলি কি বা কিসের বাণী বহন করে আনে।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ডেপুটি হয়েও ডেপুটিদের অপদস্থ করতে ছাড়েন নি, মাইকেল মধুসূদন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে থেকেও 'একেই কি বলে সভ্যতা' লিখেছেন। আমাদের মত ইতর জনদের কথা অবশ্য আলাদা। তবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যে অন্ধ অনুকরণ প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে চিহ্নিত হয়ে এসেছিল, স্বাধীনতার পরবর্তী বৎসরগুলিতে তা যেন প্রবল হয়ে উঠেছে, সরকারের আমদানী নীতির কড়াকড়ি সত্ত্বেও। সংস্কৃতির সহজ আমদানী রোধ করা কি কোন শুভ ব্যবস্থার পক্ষে সম্ভব? সরকার অবশ্য বেছেগুছে জনগণের পক্ষে হিতকর ও অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রীগুলির আমদানীতেই পক্ষপাতী, কিন্তু জনগণ মনে হয় বেপরোয়া আমদানীই চান। বেশ কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এক ঘোষণায় বাঙ্গালী কর্মী পুরুষদের ঘরে সাদা সেন্ডি ও হাফ্‌প্যান্ট পরতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এখন তাঁরা লক্ষ্য করুন ইন্দোনেশীয় বাটিক লুঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার তাঁদের ঐ ঘোষণা পত্রটি কি রকম ম্লান হয়ে গিয়েছে। ভারত তথা বাঙ্গলা একদিন ইন্দোনেশিয়াকে দিলে এখন নিচ্ছে—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে' অনেকটা এই রকম আর কি?

এই সংস্কৃতির একটি ধারার বাহক বিজ্ঞানেরা। এঁরা বিদ্যুতের ধাক্কের মত মার্কিন ছাঁদের বাড়ি, স্টিরিও, ফটল্যাণ্ডের ঘরণার জলে তৈরী হুইস্কি, রেফ্রিজারেটর (ওঁদের ভাষায় ফ্রিজ), শীততাপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র, কৃত্রিমতন্তুতে প্রস্তুত বস্ত্র, আমদানী করা সাড়ী—ইত্যাদি চিন্তা ভাবনা প্রচারের কেন্দ্র। এদের কথায় থাকে প্রচুর ইংরিজী। টেলিভিশন ও ভূগর্ভরেল নিয়ে এঁরা চিন্তিত। কারণ ওদেশে এসব এখন পুরোণ হয়ে গেছে। তবে আছে—রবীন্দ্র সংস্কৃতিও আছে। বাড়ির ভিতরে বা বাইরে একটু একটু কারুকার্য, ড্রইংরুমে গুটি একখানা রবীন্দ্রনাথের বই, এই সব। তবে স্টিরিওর জন্যে বেশীর ভাগ পপ্ সঙ্গীত বা হিন্দী-বাংলা চটুল গান পাবেন। কিছু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও। এঁদের মতে রবীন্দ্র-সংগীত চিত্ত বিনোদনের পক্ষে অনুপযুক্ত, সংগীত শাস্ত্রানুযায়ী অবমাননের। লক্ষ্য করলে দেখা যায় ব্রিটিশ সিংহের পৃথিবীব্যাপী স্বদেশ (বা অন্য কথায় সাম্রাজ্য) ও স্টার্লিং-এর দাপট অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ফ্যাসনের প্রভাবও ক্ষীয়মান। নোতুন সূর্য মার্কিন ডলার। তাকে কেন্দ্র করে আছে দোদুল্যমান ফ্যাশনের ঝালর।

সংস্কৃতির অন্য একটি ধারায় বিভিন্ন উপধারাতে রবীন্দ্রনাথ কখনও ভীতিপ্রদ, কখনও অবহেলিত, কখনও বা অজ্ঞাত। রেডিওর প্রভাবে অবশ্য খুব বেশী হেরফের হয়েছে বলা যায় না। এঁদের অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা বড় শক্ত। এঁদের বোঝান যায় না যে রবীন্দ্রনাথ সকলের ছিলেন বলেই বড়। বহু জায়গায় তিনি পাণ্ডিত্য বা গতানুগতিক শিক্ষাকে অকেজো বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি যে বিরাট প্রাণ-শক্তির ধারক ছিলেন তা না খুঁজে ইচ্ছের বা অনিচ্ছের তাঁর

রচনার মধ্যে কাঠিন্য বা দার্শনিকতা খোঁজার চেষ্টাকে তাঁর প্রতি অবিচার করা বলব। তবে যেহেতু তিনি সকলের তাই তিনি পণ্ডিতদের আশাও অপূর্ণ রাখেন নি। তা ছাড়া তাঁর সব রচনাই প্রথম শ্রেণীর একথাও কেউ চলক করে বলতে পারেন না। তবে তাই বলে তিনি সকল জায়গায় দুর্বোধ্য সুতরাং রসগ্রহণের পক্ষে অপর্যাপ্ত একথা কি করে বলি? তাছাড়া সাহিত্য সমাজের মানও নির্ধারণ করে, সে মান যে সব সময় সকলের শিক্ষা সংস্কৃতির সমান হবে তা বলা যায় না। ব্রিটিশ জাতি যদি সভ্যতার ইতিহাসে টিকে থাকে, তবে তা তার সাহিত্যের জন্য একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ভাব প্রকাশের সুবিধের জন্য এঁরা অনেক বিকৃত বাঙলা, ভাঙা ইংরিজী বা হিন্দী-উর্দু প্রয়োগ করেন। এগুলির কিছু বা অশ্লীল, কিছু বা সব সময় সকলের কাছে প্রয়োগের অযোগ্য। ভাষার ভাব কখনও অতি সরল—কখনও ইঙ্গিতপূর্ণ: দোহাই—ভাষাকে সহজ ও সর্বজনগ্রাহ্য করা। রুচির এই স্বাধীনতার হয়ত আইনের বাধা নেই। তবে শিক্ষা ও বিবেচনাকে যতক্ষণ না মানব-মনের অবাঞ্ছিত অঙ্গ বলে ঘোষণা করছি ততক্ষণ একটু বাধা দিতেই হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে যদি জনগণের দোহাই দিয়ে অপর্যাপ্ত বলে ঘোষণা করা হয় তবে রাশিয়ার সংস্কৃতি কেন এদের প্রভাবিত করে না? মনে হয় এর কারণ চটক: বা মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকে খোঁচা দেওয়া, বা অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই সঙ্গে আছে, অপরের মনোভাবের প্রতি ঔদাসীন্যতা। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজী বিনা কারণে কোন ধারণাকে আঁকড়ে থাকা পছন্দ করতেন না। তিনি দেখিয়েছেন বুদ্ধদেবের চিন্তার তাৎপর্য যুগপৎ অহিংসা ও সহিষ্ণুতা। ঐনীবীসাবুল হাসানাৎ অশ্লীল কথার উপযোগিতাও অস্বীকার করেন নি। কিন্তু স্থান, কাল, পাত্র বলে একটা কথা তো আছে? দ্বিতীয়তঃ যাঁরা আজ এর মধ্যে ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা খুঁজে পাচ্ছেন অচিরেই এগুলি তাঁদের কাছে ভোতা হয়ে যাবে—যেমন হয় এক অস্ত্র বারবার ব্যবহার করলে। তৃতীয়তঃ এই শিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিকেরা সর্প যেমন হরিদত্তকে বলেছিল তেমনি 'চিতিকাং দীপিকাং পশ্য ভগ্নাং কটাং মমৈব চ' (আমার দ্বারা দষ্ট তোমার পুত্রের চিতা দেখ আর তোমার প্রহারে ভগ্ন আমার কণা দেখ) অর্থাৎ তোমরাও ডুবলে আমাদেরও ডোবালে এমন আর্তনাদ করবে না তো?

সভ্যতার অঙ্গ ধারাগুলি উপস্থিত আলোচনা না করলেও চলবে। প্রশ্ন হল এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি। আমাদের শিক্ষা যেখানে 'সর্ব সমন্বয়' সেখানে আমরা সংস্কৃতির কোন অংশকেই অগ্রাহ্য করে উড়িয়ে দিতে পারি না। এই বিভিন্ন বৈসদৃশ্যতা, কাম্য-অকাম্যের সমন্বয়ে আমাদের নোতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠবে এই আশা। 'রবীন্দ্রনাথকে বুঝি নি বলেই আজও তিনি অচল—তিনি ফুরিয়ে যান নি।' সেই অক্ষয়ত্ব বিশ্বভারতীর আমাদের ভবিষ্যৎ সভ্যতাকে আরও সুষমা-মণ্ডিত করে তুলবে এ আশাও নিতান্ত অমূলক নয় নিশ্চয়ই।

সৃষ্টির পরিব্যক্তি

ড: গুরুদাস কুমার

সর্ব্বগ্রাসী মহাকাল চলিতেছে দ্রুতগতিতে। আপন বৈভবে তাহারই মুখে গড়িয়া উঠিতেছে মানুষের অপ্রতিহত শক্তি অর্থাৎ বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও আবিষ্কার : নিত্য নূতন সৃষ্টি হইতেছে—যে সৃষ্টি ধ্বংসের রূপান্তর মাত্র। এই সৃষ্টির মধ্যে নিহিত আছে জৈব বিবর্ত্তনের ধারা ও তাহার ক্রমবিকাশ। সৃষ্টির মূল উৎস হইল জীবদেহের অসংখ্য কোষের বিভিন্ন জনন বা জেনেটীক পদার্থ—যেমন নিউক্লিক অ্যাসিড, প্রোটিণ, এনজাইম, জীন ইত্যাদি। এই সকল রাসায়নিক পদার্থের আদি কণাগুলি জীবের প্রজনন ও বিবর্ত্তনের এক অভিনব অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। তাহার ফলে সৃষ্ট হইতেছে নূতন নূতন প্রজাতি, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে ও ক্ষুত্রাতীত বংশগতির বাহক জীনের বিন্যাসে।

জৈব ধারায় রূপান্তরিত হইতেছে জীবের অতিক্ষুদ্র এক কোষবিশিষ্ট কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি জীব হইতে বহু কোষযুক্ত প্রাণী, বৃক্ষলতা, জলচর, উভচর জন্তু, অতীতের বৃহৎ আকার সরীসৃপ জন্তু, পক্ষী বিভিন্ন প্রকার স্তন্যপায়ী জীব; নর ও বানরের মধ্যবর্ত্তী প্রজনন পদার্থের স্বাভাবিক বিন্যাসে ও ক্রমবিকাশে বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ জীব বুদ্ধিমান মানবের আবির্ভাব।

লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রাচীন শৈলস্তরে নিহিত বহু জীবের কঙ্কাল বা জীবাশ্ম আবিষ্কারের ও অনুশীলনের ফলে জানা গিয়াছে অতীতের ইতিহাসে কালের কবল হইতে রক্ষিত বহু লুপ্ত প্রাণীর অস্তিত্ব ও উহাদের বিচিত্র জীবনযাত্রা। ক্রম বিকাশের ধারায় বানর হইতে মানুষের উত্তরণের পথে হিমালয়ের পাদদেশে প্রাপ্ত নর ও বানরের মধ্যবর্ত্তী বহু মানুষরূপী প্রজাতির জীবাশ্মে সাক্ষ্য প্রমাণিত হয় যে প্রায় ১৫—১৮ লক্ষ বৎসর পূর্বে মধ্য এশিয়ায় নর ও বানর গোষ্ঠীর এক অভিনব জৈব পরিবর্ত্তন ঘটে। যাহার ফলে মানুষরূপী আদি মানবেরা বানরগোষ্ঠী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রাথমিক প্রাগৈতিহাসিক গুহা মানব ও পরে বর্ত্তমান প্রাজ্ঞ ও মননশীল মানুষের ধারায় রূপান্তরিত হয়।

পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতে বিবর্ত্তনের ধারায় জীবকোষের ক্ষুত্রাতীত ক্ষুদ্র জনন পদার্থগুলি নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল। পরিবেশ অনুযায়ী জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহারা নিয়ন্ত্রিত ও রূপান্তরিত হইতেছে। বিভিন্ন প্রজাতির আমূল, বিপুল ও সুদূর প্রসারী পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের ধারা সৃষ্টির অবশ্যম্ভাবী পরিব্যক্তি।

আধুনিক বিজ্ঞানের চরম অগ্রগতি ক্রমশঃ অবলুপ্তি ও বিনাশের পথে যাইতেছে। কিন্তু প্রকৃতির ক্রম বিকাশ পরিব্যক্তির ধারার মূল প্রেরণা—

জীবের অন্তরস্থ বিকাশ। প্রাকৃতিক বিবর্তনের চরম লক্ষ্য পার্থিব অমরত্ব ও ভগবৎ জীবন লাভ, প্রকৃতির সাথে মানুষের সচেতন সহযোগিতা; মানুষের জীবন-চলার ছন্দে আনিতে হইবে এক ঐশী লক্ষ্য। উপনিষদের সেই শাশ্বত সত্যের মহানির্ঘোষ বাণী—'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—আমরা সেই অমৃতের অধিকারী। বিশ্বের চরম রহস্য আনন্দ। আনন্দ হইতেই বিশ্বের অখণ্ডিত জীবের উদ্ভব, আনন্দেই অবস্থিতি ও আনন্দেই তাহাদের সার্থকতা ও পরিণতি।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

১৯৫৫

ঠাকুর, তোমার কৃপায় বুদ্ধিতে বুঝিতেছি 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'-র অর্থ কি; প্রাণ দিয়া বুঝিতে দেও। ঐ মন্ত্র শুধু লক্ষ্যার্থেই সত্য নয়, উহা বাচ্যার্থেও সত্য। ঐ যে সামনের তামার ছোট গ্লাসটা, ওটা গ্লাস হিসাবেই ব্রহ্ম। 'দারুতে ব্রহ্ম নয়, দারুই ব্রহ্ম'—তোমার লেখা সম্পূর্ণ সত্য। কামে ব্রহ্ম, ক্রোধে ব্রহ্ম, লোভে ব্রহ্ম, মোহে ব্রহ্ম, মদে ব্রহ্ম, মাৎসর্যে ব্রহ্ম, পিতৃত্বে ব্রহ্ম পুত্রত্বে ব্রহ্ম, স্ত্রীত্বে ব্রহ্ম, কন্যাত্বে ব্রহ্ম, মাতৃত্বে ব্রহ্ম, প্রতি সম্পর্কেও ব্রহ্ম। প্রতি মানুষের সঙ্গে সম্পর্ককে কি ব্রহ্ম মূল্যই না দিতে চাহিলাম। তাই আমার জীবনে চরম 'ছাড়া' বলিয়া কিছু নাই, অতি বিজাতীয়ের সঙ্গেও সাবধানে মিলন-ভূমি রাখিতে হইবে। মানুষের মনের উর্দ্ধে, মতের উর্দ্ধে নিশ্চয়ই একটি মিলন-ভূমি আছে। উহাই শঙ্করের ভাষায় ব্রহ্ম বা G. C. M.। যত বিরোধই থাকুক, তবুও মিলিত হইবার ক্ষেত্র থাকা চাই। ব্যক্তির সঙ্গে না পারি, তাহার জাতির সঙ্গে মিলিব, জাতির সঙ্গে না পারি তাহার বিশ্ব-নাগরিকত্বের সঙ্গে মিলিব, সেখানে না পারি আত্মার আত্মায় মিলিব। 'I differ to meet'। প্রত্যেকে যখন আসা তখন তাহাকে পাইতে হইবে—কখনও বা রাখিয়া, কখনও বা ছাড়িয়া। রাখা ও ছাড়ার উর্দ্ধে পাওয়া। কত যন্ত্রণা মানুষ দিতেছে, তবুও কি বলিতে পারি তোমাকে চাইনা? সে আমার আমি বলিয়াই তাহাকে আমার চাই। আমি আমাকেই চাই। চরম না-চাওয়া আমার কপালে নাই বলিয়াই মানুষ আমার লাঞ্ছনা করিতে পারিতেছে। তোমার জয় হউক। কুমার প্রিমিয়ারে এল সন্ধ্যায় রেণুর চিঠি লইয়া যায়। আজও ব্রুক পায় নাই। রেণুর সেক্রেটারী বোর্ডের বই পড়া শেষ হয়। সন্ধ্যার পর সুরেনবাবু আসেন, তাহার বক্তৃতা (বিশ্বকর্ম

পূজা) উপলক্ষে তাহাদের বাড়খানার জন্ত নিয়া যান। প্রতিভার জন্ত আরও ৫৲ টাকা ও রেণুর জন্ত ৫৲ টাকা দিয়া যান। নির্মলনলিনীর স্বামী মারা যাইবার খবর কাল তাহার পুত্র দিয়াছে। আমি একটি চিঠি দেই।···১৪ই সেপ্টেম্বর।

ঠাকুর, যোগস্থ হইয়া, সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, নিভৃতে অনিদ্রিতে সদা হইয়া তোমার কর্ম করিব। আমার জীবনের জোয়ার ভাঁটা তোমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হউক। ইহাতেই আমার বৈশিষ্ট্য। জোয়ার ভাঁটা বিশেষরূপে আমার তো আছেই; তোমার সঙ্গে আমার যোগ নিবিশেষ। তুমি কি চাও যে আমার প্রকৃতির উপর দাঁড়াইবার কোন স্থান না থাকুক, আমি একান্ত ভাবে তোমার করুণা স্নেহ প্রেমের উপর দাঁড়াই? সেই আত্মরোমতা না আসিলে কি প্রকৃতি-পুরুষ সমন্বয় আসিবে না? তাই কি আমার সকল আয়োজন করিয়া দাঁড়াইতেছে? কেউ তো আমার প্রাণের কোন্ স্তরে দাঁড়াইয়া আমি চলি ফিরি ব্যবহার করি তাহা বোঝে না। শাস্ত্রের কথা, শঙ্কর বুদ্ধ প্রভৃতির দর্শন বুঝিবার মত একটা সূক্ষ্ম দৃষ্টি তুমি দিয়াছ, আমি পড়িয়া পাই নাই। মানুষের কথার বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ, ব্যঙ্গার্থ কি তাহা আমি কিছু বলিলে মানুষ আমার উপর রাগ করে। মানুষের ভুল যে কত গভীরে থাকে তাহা বুঝাইতে গেলে তাহারা রাগ করে। মিনু গোপার সঙ্গেও বুক লইয়া ছড়াছড়ি করিতে হয় আমাকে? এ কি দুর্গতি আমার! আমাকে তুমি কোলে করিয়া রাখ। বিমলার এক চিঠি আসে নবদ্বীপ হইতে। সারা জীবন প্রত্যেকের সঙ্গে একাত্মতার সাধনা করিয়াছি। অপর পক্ষের সুখ দুঃখকে নিজের করিয়া, তাহাদের যথাযথ মূল্য দিয়া, সুষম বুদ্ধি না রাখিয়া এক করিতে চাহিয়াছি। কাহারও standpoint বুঝিতে তো আমার কষ্ট হয় না। প্রতি standpoint-কে আমার standpoint-এর সঙ্গে এক করিয়া দুইকে মিলাইয়া পথ বাহির করিতে চাহিয়াছিলাম। পারি নাই। যখন আমার সঙ্গে তর্ক করে, তখন বেদনা বোধ হয়। আমি তো তাহারই পক্ষের লোক। আজ নির্বিচারে মানিবার কথা তাই বলি। ইহাতে অন্ধতা বুঝায় যদি, তবুও উপায় নাই। দ্বিতীয়বার যখন সমস্ত উল্টাইয়া যাইবে, তখন দুই ধারার resultant হিসাবে অন্ধতা কাটিবে। 'মোহ' প্রথমে দরকার। একটা স্থিতিভূমি না থাকিলে রক্ষা হইবে কি করিয়া চঞ্চল মন? প্রথমবার শুরু স্থিতিভূমি, পরে আমি স্থিতিভূমি। দুইবারে আমি মোহ-মুক্ত হইব।···১৫ই সেপ্টেম্বর।

ঠাকুর, চিরকালই পিছনে থাকিতে চাহিয়াছি, ঘরে থাকিতেই ভাল বাসিতাম। মানুষের সামনে দিয়া যাইতে হইলে পা সরিত না, মেয়েদের মত। তোমার কাছে বলিয়াছিলাম ছগলীতে, 'প্রকৃতি আমার মেয়েদের মত, অথচ আমাকে করিয়াছেন পুরুষ'। তুমি হো হো করিয়া শুধু হাসিলে। এই আমাকে তুমি টানিয়া রাস্তায় বাহির করিয়াছ। এমন ছোট মানুষের তুমিই গর্ব বাড়াইয়া দিয়াছ। কি একটা বুকের মধ্যে আসিল ধীরে ধীরে তোমার স্পর্শ লাভের পর। বলিতাম, 'ঈশ্বর আসিবে আমার দুয়ারে'। পিছনে থাকিয়া দেশসেবার গৌরব আমার ছিল। মহাত্মাজী আমার বাড়ীতে (বরিশালে বগুড়া পাড়ার বাসা-কালীন) দুইবার যান। প্রথমবার আমার ছেলে থাকাকালীন, দ্বিতীয়বার আমি উপস্থিত ছিলাম।

বড়র বাড়ীতে ছোট গেলে ছোট বা বড় কাহারও মর্যাদা থাকে না। মহাত্মাজী বস্তু আমার মত ছোট মানুষের বাড়ী যাওয়ার জন্য। আমি বস্তু আমার বাড়ীতে তিনি গিয়াছিলেন বলিয়া। দেশ-বন্ধু দাসের সঙ্গে বরিশাল কনফারেন্সে দেখা। সকলকেই পথে পাইয়াছি। তোমার জয় হউক। রেণু একবার 'সিনি ম্যানদনে' যায় বিজ্ঞাপনের জন্য। দেখা হয় না। কাল ১১ টায় যাইতে হইবে। মিনু বড় উতাক্ত করা আরম্ভ করিয়াছে। সে বলে তাহাকে নরম পাইয়া বাসি সাগু খাওয়ানো হইতেছে। অথচ তাহার লিভারের বেদনা সে ২ দিন পূর্বেও অস্থির ছিল। কুমার কাল বীরেনের ওখানে তাহার পথ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিবে। সারা জীবনের পথ-চলা আজ ব্যাহত হইতেছে: সহ্য অনেক করিয়াছি, আর সহ্য হয় না। 'একতুমঃ ভূয়া' সাধনা কি আমার এইভাবে ব্যর্থ হইবে? আমার যে দম গেল। সতীন্দ্র দাসগুপ্ত আজ ঈশোপনিষৎ নিয়া যায় পড়িবার জন্য। ··১৬ই সেপ্টেম্বর।

ঠাকুর, তোমার কৃপায় আমি যেন কৃষ্ণ-বিশ্বাস ও তাঁহার বিশ্ব-বিশ্বাস রাখিয়া চলিতে পারি। তোমার হাতে গড়া এই বিশ্ব কি আমার জন্য ফাঁদ পাতিতে পারে? মানুষকে বিশ্বাস করিয়া কে কি জিজ্ঞাসা করিয়া ঘরে আনি নাই। যেমন পাইয়াছি, তেমনিই বুকে তুলিয়া লইয়াছি। দো-তরফা পথে আমি চলি নাই। ইংরেজের বিচার মানিয়া লইয়াই তাহাকে জয় করিয়াছি। মহাপ্রভু সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে গজাদীসের যুক্তি মানিয়া লইয়াই তাঁহাকে জয় করিয়াছিলেন। মানিয়া জয় করা ইহাই ভারতীয় পদ্ধতি। গুরু-বাক্য মানিয়া লইয়াই গুরুকে জয় করিবার কৌশল আমি শিখিয়াছি। বাবা যেদিন বলিয়াছিলেন, 'বাহির হও আমার ঘর হইতে', চোখের জলে অপ্রতিবাদে বাহির হইয়াই তাঁহাকে জয় করিয়াছি। শরৎ চন্দ্রের সাবিত্রীও 'দাসী' বলিয়া পরিচয় দিয়া দাসীত্বের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল। মায়াকে প্রাণ খুলিয়া স্বীকার করিলেই মায়াকে জয় করা যায়। লড়াই করিলে সে আরও বদ্ধ হয়। এই পথই সনাতন পথ। এক-তরফা পথই চিনিয়াছি। প্রত্যেক পক্ষকে নিজ পক্ষ মনে করিয়াছি। সারা জীবন এইভাবে আমি চলিয়াছি। আমি জানিতাম অন্য পক্ষও আমার আত্মা, আমিই। পুরুষও আত্মা, প্রকৃতিও আত্মা। কাহাকেও ভিন্ন পক্ষ বলিয়া ব্যবহার আমি করি নাই। তাহার সুখদুঃখ, তাহার স্বার্থ আমারই। আমি 'পৃথকভূত' হইয়া কাহাকেও ভালবাসি নাই। 'একীভূত' হইয়া ভালবাসাই আমার জীবনব্রত। সে ব্রত যেন রক্ষা করিতে পারি।·· বইর উপর রেণুর রিপোর্ট লেখা আজ শেষ হয়। বৈকালে প্রতিভার বোন-পুত্র শ্রীপতি আসে। অবনী চট্টোপাধ্যায় আসে। অতীত বর্ত্তমান সামঞ্জস্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। 'সহনিক্ষা ও তাহার ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধ উল্লেখ করিয়া 'কথং কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী' তাহা আলোচনা করি। মাখন বাবু আসে। সুদামার উপাখ্যান বলি। অর্থাভাব পূরণের সংকল্প লইয়া সুদামা গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা মুখ ফুটিয়া বলেন নাই। কৃষ্ণও কিছু দেন নাই মুখে বলিয়া। এমনি হয়। বড়র কাছে চাহিতে হয় না: তাঁহার ভালবাসার কাছে পড়িয়া থাকিলে যে যে সংকল্প লইয়া আছে তাহা অজ্ঞাতসারে সিদ্ধ হয়। গুরুর কাছেও চাহিতে

হয় না, পড়িয়া থাকিয়া সেবা করিলে দিতে হয়। ...১৭ই সেপ্টেম্বর।

ঠাকুর, তোমার বিশ্ব তোমারই মত সত্য। তোমার বিশ্ব বলিয়া ইহা আমার আদরের, আমারই বিশ্ব। ইহার উপর আমার নিত্য অধিকার। তোমার যাহা কিছু সব আমারও বটে, আমার আদরেরও বটে। ইহাকে ভোগ করিবার অধিকারও আছে। তাই বলিয়া জীবনে যথেচ্ছ ভোগ করি নাই। তোমার 'ধনে'র কতটুকু ব্যবহার করিয়াছি? ১৯০৬ হইতে ১০৭ আমহার্ষ্ট স্ট্রিটে মেসে থাকাকালীন হইতে তেল ব্যবহার করি নাই, জীবনে একটি মাত্র কোট (তাহাও স্ত্রিপতির দেওয়া) গায়ে দিয়াছি, ধুতির খোট গায়ে দিয়া শীতও কাটাইয়াছি। স্কুল ছাড়িয়াছি পরে জামা জুতা পরি নাই, স্কুলেও ইন্‌স্পেক্টার আসার দিনই শুধু, অন্য দিন শুধু চাদর। বৃন্দাবনে যখন ছিলাম দুধ ছানা দই রাবড়ী ঘৃতান্ন কিছুই খাই নাই। গোবিন্দকে হাতে হাতে না দিয়া খাইব না এই ছিল মনের আশা। তুমি ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলে, 'তোমার নাকি কৃষ্ণ-প্রেম নাই?' সত্যি বল, আমার কি কৃষ্ণ-প্রেম আছে? তাহাই হউক। শ্রীকৃষ্ণে প্রেম হউক, তাঁহার বিশ্বে প্রেম হউক। সন্তোষ গোপাল অধিকারীর বিছানার চাদর রঙ্গ (?) একটি এতির ছেঁড়া চাদর গায়ে দিয়া কলিকাতার সব সভায় বক্তৃতা দিয়াছি। প্রয়োজন আমার কত কম ছিল। আমি ছিলাম খাওয়া পরা চলা ফেরার স্বতন্ত্র। বৃন্দাবনে ২ খানা কাপড় ছিল। স্নান করিয়া একখানা পরিতাম, ভিজাখানা গায়ে জড়াইতাম। এত হালকা ছিলাম বলিয়া আজও পথ চলিতে পারিতেছি। কাহারও উদ্বেগের কারণ হই নাই। পরমুখাপেক্ষীও হই নাই। ১২টার পর খুব বৃষ্টি হয়। কুমার প্রবন্ধের জন্য প্রিয়দারঞ্জনবাবু, হেমেন্দ্র প্রসাদ বাবু, নগেন মুখোপাধ্যায়ের নিকট যাই। ৫টার সময় পাঠ আরম্ভ হয়। ঐশ্বর্য ও মাধুর্য লাভের আরশা পাঠ হয়। আমি তোমার—ঐশ্বর্য, তুমি আমার—মাধুর্য, পরাভক্তির অধিকারীর দুইয়েরই আস্বাদন হয়। 'শান্তিরাম তুই বগল বাজা, সোলোকে তোর ভিজল গাজা' গল্প করি। রস ও ফলের সম্বন্ধের কথা হয়। Sensuous-Intellectual-Intuitional process-এর আলোচনা হয়। Skin ও flesh বাদ দিয়া reality-কে নেওয়া ভাবের সাধনা। চাকুরিয়ার শীতল মুখোপাধ্যায় আসিয়াছিলেন। উজ্জ্বলভারতের গ্রাহক বাবদ ৩৲ টাকা ও ঈশোপনিষদের বাবদ ২৲ টাকা দিয়া যান। নগেন মুখোপাধ্যায় ও তাহার পুত্র সন্ন্যাসী আসিয়াছিল। নূতন লোক আসে। মেয়েরাই নূতন নূতন আসে। আজিকার আলোচনার শেষে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলাম। 'কারের বাচা মনসা' ইত্যাদির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আর সামলাইতে পারিলাম না। ...১৮ই সেপ্টেম্বর।

ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় একদিন যে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে একক্রমে ১৪ রবিবার বক্তৃতার মধ্যে সভাপতিরূপে আমার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'বক্তার শাস্ত্রের ভিতর এক নূতন দৃষ্টি খুলিয়াছে', সে তো তোমারই প্রভাব। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটীর প্রচারক রূপে আমাকে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিতে গিয়া পাটনার পূর্ণেন্দু মোহন সিংহ মহাশয়ের নিকট হীরেনবাবু, পি, এন মুখার্জী (রিটায়ার্ড ইন্‌স্পেকটার জেনা-

রেল অব রেজিষ্ট্রেশান) ও পত্রার সম্পাদক রাজেন্দ্র মুখার্জী যে লিখিয়াছিলেন, 'He has a life, he has a call of the life, he feels the life' —সেই life তো তোমারই life-এর অংশ। তুমি আমার গর্ব বাড়াইয়াছ। আমি তোমাময় হইব, তোমার মাঝে ডুবিব, তোমার মাঝে ডুবিয়া তুমি হইয়া তোমাকে সৃষ্টি করিব, বিশ্বের বুকে exhibit রূপে উপস্থাপিত করিব। ঐশ্বর্য ও মাধুর্য দুই দিয়া তোমাকে আস্বাদন করিব। ঐশ্বর্যে আমি নাই, তুমি আছ; মাধুর্যে তুমি নাই আমি আছি। অদ্বৈতাবস্থাপ্রাপ্ত পরম প্রেমকলা পরা-ভক্তিতে সিদ্ধ ভক্তে ইহাই তো তোমার মত অবস্থা। তোমার জয় হউক। বরিশালের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার পরেশ চ্যাটার্জী এক-দিন আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ওর মধ্যে মালিক ঢুকেছে'। তুমিই তো আমার মালিক, আমি দাস। শারদীয়া সংখ্যার matter প্রস্তুত হয়, দারোয়ানকে দেওয়া হয়। আশ্বিনের পত্রিকা পরশু পাওয়া যাইবে। রাত্রি ৯টায় ধীরেন আসে। প্রস্রাব বোধহয় বারে অনেক কমিয়াছে। প্রস্রাবের চাপটা বোধহয় কমিয়াছে। তেমন হুড়াহুড়ি করিয়া প্রস্রাবের জন্য ছুটিয়া যাইতে হয় না। অপেক্ষা করা যায়। রেণু ১০টায় বাহির হইয়া প্রেস ও গিনি ম্যানসনে যায়।···১৯শে সেপ্টেম্বর।

ঠাকুর, এই বিশ্ব যে 'মাত্রা'দ্বারা গড়া—একান্ত নিষ্কাম বা বাসনা দ্বারা গড়া নয়, দেশ-কাল-পাত্র বিশেষে মাত্রা রাখিয়া চলাই যে 'সংযম', সংযম যে negative নয়, তাহা তোমার কৃপায় বুঝিয়াছি। কিন্তু মন-বুদ্ধি either-or ছাড়া তো বোঝে না। হয় গা ঘেষাঘেষি করিয়াই থাকিব, নয় দূরে সরিয়া যাইব—ইহাই তো মানুষ বোঝে। কোন্ ছন্দে চলিলে এই দুইয়ের সমন্বয়ের ফলে মাত্রা রক্ষিত হইতে পারে, এই মাত্রা রক্ষার ফলে সংযম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা তো শরণাগত ভক্ত ছাড়া বুদ্ধিমান সাধকের বোধগম্য হইবে না। হয় সংসারে থাকিব, না পারি চলিয়া যাইব—ইহাই তো ছিল এতদিনকার বৈরাগ্য। কিন্তু এমন একটি পর সংযম বা পর বৈরাগ্য আছে, যেখানে সংসার করিয়াও বৈরাগী থাকা যায় বা বৈরাগী হইয়াও সংসার করা যায়: চাই চক্ষু, কৌশলটি দেখা। তোমার দৃষ্টিতে একান্ত নিষ্কামীও অসংযমী, একান্ত সকামীও অসংযমী। তাহারই পর বৈরাগ্য বা পর সংযম প্রতিষ্ঠিত, যাহার সকামতায় ফুটিয়া উঠে নিষ্কামতা, নিষ্কামতায় ফুটিয়া উঠে সকামতা। তুমি ইহার মূর্তিমান দৃষ্টান্ত। আমার জীবনে তোমার জয় হউক। কুমার পেটের উদ্বেগে সারা দিনরাত অসাড়ে পড়িয়া রহিল। রেণু ১১টার পর বাহির হইয়া সেকেণ্ডারী বোর্ড আর এডুকেশানে রিভিউ-এর রিপোর্ট দেয়, পরে ইষ্টার্ণ রেল, প্রেস সিণ্ডিকেট, বাটা, ক্যালকাটা কেমিকাল, হরিদাসবাবু প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করিয়া ৩টার পরে ফেরে। আমি ৫টায় মঠে যাই। রমাপতি বাবুর সঙ্গে কথা হয়, সুধাংশু ডাক্তারের সঙ্গে কথা হয়। ৭টায় ফিরিয়া আসি। কার্তিকের সংখ্যার প্রথম প্রুফ দেয়। ···২০শে সেপ্টেম্বর।

ঠাকুর, সকলে বলে—আমি যে পথের কথা বলি এবং যে পথের নির্দেশ তোমার কাছ হইতেই পাইতেছি বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে পথ ছাড়া অন্য পথ বর্তমানে না থাকিলেও উহা খুব

কষ্টকর। কষ্টকর বৈ কি! মানুষ এক ধারায় (either-or) চলিতে পারে, কেননা মন বুদ্ধি ঐ পথ ছাড়া বোঝে না। কিন্তু লক্ষ লক্ষ বৎসরের অভিজ্ঞতায় আজ বুঝিয়াছে যে, কোন একটি ধারাই মানুষের সব সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম নয়। দুই ধারার অনবরত ক্রিয়া প্রতি ক্রিয়ার ফলে দুইটিই আজ অনেকটা নিস্তেজ, ক্লৈব্য প্রাপ্ত। আজ একান্ত জড়, রস, প্রবৃত্তি চলিবে না, একান্ত অক্ষর ভাব নিবৃত্তিও অচল। আমি তো পাইয়াছি ক্ষর-অক্ষর সমন্বয়ের, রস-ভাব সমন্বয়ের, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সমন্বয়ের পথ। আমি পাইয়াছি দুইয়ের পুরুষোত্তম-মাত্রা বজায় রাখিয়া চলিবার পথ। এ পথ ধরিয়া না চলিলে মানুষ কি তাহার প্রতিক্রিয়া সহ্য করিতে পারিবে দেহ-প্রাণ-মনের এই অবস্থায়? মানুষ আজ অবস্থার কাছে বন্দী। এই বন্ধন-দশা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে চাই তোমার শরণাগতি, প্রকৃতির কোনও একটি ধারা তাহাকে মুক্তি দিতে পারিবে না। চাই সমন্বয়ের সাধনা, চাই পুরুষোত্তম-সাধনা, চাই নিজের মানদণ্ড ছাড়িয়া তোমার মানদণ্ডকে স্বীকার করিয়া তোমা হইতে রওয়ানা হওয়া। রেণু ১১টায় বাহির হইয়া ফেরে রাত্রি ৭-১০ মিনিটে। শরীর তো ভাল নয়। পথের দিকে তাকাইয়া থাকি। মিনু যমুনা ভাড়ামাসের টাকা (১১৲) লইয়া ৯টায় দক্ষিণেশ্বর যায়। সন্ধ্যা ৮টায় বি, কে, পাল আসেন। ৯টায় যান। মিনিস্টারের সুযোগে কাম প্রাদুর্ভূত হয়। সেই জন্যই তো বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে শরীরে মনে থাকিতে হইবে। বিশ্বরূপ হইলে মদন মোহিত হয়। ব্যক্তিগত সাধনার কাহিনী-কথন নিশ্চয়ই হেয়। মানুষ তো আসে, পরিচ্ছিন্ন। তাহার সাধনা ও সিদ্ধি সব পরিচ্ছিন্ন। যে 'বুদ্ধি' মাত্রিক, তাহার সিদ্ধান্তও মাত্রিক। মাত্রিক বুদ্ধি লক্ষণাধারা ব্রহ্ম-বস্তু নিরূপণ করিলে তাহা কি অ-মাত্রিক হইবে? মন-বুদ্ধির সিদ্ধান্তে দ্বৈত অদ্বৈত সব মাত্রিক। ব্রহ্মের বুদ্ধিদ্বারা তিনি কি তাহা বুঝিতে হইবে। 'অনন্তশক্তা। ভদ্রবুদ্ধঃ বুদ্ধিলক্ষণাদভাবম্'—শাণ্ডিল্য সূত্র। এক বস্তু সবই মায়া। উহা ব্রহ্মের উপরে অধ্যাস মাত্র। ব্যক্তিগত সাধনার ফল একান্ত যে-কোন মতবাদ। ভগবানের জীবনে জীবন মিলাইলেই সম্ভব সমন্বয়-সিদ্ধি। রেণুর বাবার আজ বাৎসরিক মৃত্যু-তিথি। সে ঠাকুরকে ভোগ দেয়। আজ সন্ধ্যায় উদ্বোধন-তাগাদা আসে।...২১শে সেপ্টেম্বর।

ঠাকুর, তুমি 'সমন্বয়ের বিপদে' মানুষকে ফেলিয়াছ, অথচ সমন্বয় ছাড়া গতিও তো নাই। সমন্বয়ের নামে মানুষ সুবিধাবাদী হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দেহাত্মবাদ, অধ্যাত্মবাদ সব আজ সুবিধাবাদের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। মন-বুদ্ধির স্তরে সমন্বয় হয় না। সমন্বয় হয় পুরুষোত্তম-স্তরে, মন-বুদ্ধি লয়ের স্তরে। মন-বুদ্ধির স্তরে দাঁড়াইয়া সমন্বয় চাহিলে সমন্বয় সুবিধাবাদেরই প্রশ্রয় দিবে। যখন সংসারও সত্য, সন্ন্যাসও সত্য, তখন গেরুয়া পরিয়া সন্ন্যাসী হইব, আর শিষ্যশিষ্যা লইয়া আশ্রম জমি করিয়া বেশ আরামে দিন কাটাইব। কোনও বাদের অসুবিধা মনবুদ্ধি নিবে না। সে সর্ববাদের অসুবিধাগুলি বাদ দিয়া সুবিধাগুলি নিবে। অথচ সত্যিকারের সমন্বয়বাদী নেয় সর্ববাদের অসুবিধাগুলি। আমি সংসারীর ঝঞ্ঝাট লইলাম, পরিবারজন বিষকে বুকে করিয়া চলিলাম, আবার সন্ন্যাসের সুবিধা শিকু করিয়া সুখে দিন কাটানো তাহাও

ছাড়িলাম। সমস্ত সংসার-সন্ন্যাসের উর্দ্ধে, নারায়ণের স্তরে [illegible] যে মানুষকে শেষ পর্যন্ত অসুবিধার মধ্যেই ফেলে তাহা কি সুবিধাবাদীর দল বোঝে? তোমার কৃপায় আমার সমস্ত-উপলব্ধি হউক।" কুমার প্রতিভা ও সন্ধ্যার পর মিনু উজ্জ্বলতারতের ব্যাপার লাগায়। ঢাকেশ্বরী হইতে কাগজ প্রেসে আসিয়াছে কি না, না আসিলে ঢাকেশ্বরীতে খবর দিবার জন্য কুমারকে পাঠাই। রেণু ১১টায় পর বাহির হইয়া ৭টায় ফেরে। সুলেখার বিজ্ঞাপন পাইয়াছে। 'সমস্যের বিপদ' প্রবন্ধ পূজার জন্য লিখিতে আরম্ভ করি। কাঁকুরগাছার নিকুঞ্জবিহারী ঘোষ সকালে কথা কহিতে আসে।...২২শে সেপ্টেম্বর।

১৩১৬ সনে চৈত্র মাসে প্রথম যেদিন বৃন্দাবনে যাই নগেন্দ্রনাথ রায়ের ওখানে পুরাণ সীতানাথের মন্দিরে উঠি, সন্ধ্যায় সেবাকুঞ্জেও গিয়াছি। আরতি হইবে, শুনিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু একজন লোক কেবল তাড়া করিতেছে। পিছনে সরিয়া বসিলাম। তবুও তাড়া। আরও পিছনে সরিয়া বসিলাম। তাড়া আর শেষ হয় না শেষে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তখন আর কেহ তাড়া করে না। আরতির শেষে পূজক একটি 'পানের খিলি' প্রসাদ আমাকে দিল। প্রথম দিন বৃন্দাবনে আসিয়াছি, প্রসাদ পাইলাম। সমস্ত বৃত্তান্ত নগেন বাবুকে বলিলাম। নগেনবাবু বলিলেন, 'আপনি যে ব্রজধামে আসিয়াছেন, তাহা স্বীকৃতি লাভ করিল রাধা-গোবিন্দের দরবারে। আপনি ধন্য। পান-প্রসাদ যে সে পায় না'। আমরা সকলে ঐ পান-প্রসাদ বণ্টন করিয়া পাইলাম। এইরূপ কত স্নেহ-স্পর্শ যে রাধারাণীর পাইয়াছি, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মনে হইত যেন তাঁহারা আমার কাছে [illegible] দেখিতাম। ঠাকুর, তোমার জয় হউক।...রেণু ১০টায় বাহির হইয়া যাবে একবার আসিয়া ফেরে ৭টার পর। আশ্বিনের উজ্জ্বলপ্রত্যুষে ১১টায় ডাকে দেওয়া হয়। পুরী যে গোপাকে নিয়া করিব।...মীনুকে নিয়াও শান্তি নাই।...২৩শে সেপ্টেম্বর।

ঠাকুর, আজ রাধাষ্টমী, তোমার প্রেম ও নাম-রস আমার জীবনের সকল স্তরে সকল সমস্যার ভিতর অবতরণ করুক। তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকা ছাড়া আমার উপায় নাই। আমার সমস্যাগুলি কি সমাধানের পথে আসিবে না? মঠে পুলিনবাবু চণ্ডীপাঠ করেন, রাধাগোবিন্দবাবু চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন, বীরেনবাবু মহাভারত ও পূর্ণেন্দুবাবু ভাগবত পাঠ করেন। তাহারা সবাই তুমি কোথায়? তোমার কি পাঠ করিবার মত কিছু নাই? তোমার জীবন নাই, গ্রন্থ নাই? দেখিয়া তো কাহারও কোন বেদনা দেখি না। শুনি, পাঠ খুব ভাল হইতেছে। ইহাই তো আমার সর্বপ্রধান সমস্যা। যাহার জীবন ছিল, গ্রন্থ ছিল অদ্বিতীয় এবং যাহা মানুষ জানিতে পারিলে তাহার সকল সমস্যার সমাধানের পথ পাইত, তাঁহার জীবন ও গ্রন্থ মানুষের কাছে উপস্থিত করিতে পারিলাম না, এ কি কম দুঃখ! আমি আর পারি না। যাহা হয় কর। রেণু সকালে বাহির হইয়া প্রায় ২টায় ফেরে। তখন দুপুরের খাওয়া খায়। বৈকালে পি সাহার কাছে যায়।... ঔষধ নিয়া আসে। ৪টার পর গোপা ও প্রতিভা গোলাম মহম্মদ রোড, বিরজা ও জিতেশ গুহের পত্রিকাগুলি দিয়া আসে। বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন বৈদ্যনাথ-দেওঘর-বৈদ্যনাথের এক চিঠি লইয়া। ২৮. ১৯. ৩০শে সেখানে এক আলোচনা হইবে, সেখানে যোগদানের জন্য। শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় যাওয়া উচিত নয় বলিয়া দিলাম। আমার কবিতা, গল্প ইত্যাদি আলোচনা হয়।...২৯শে সেপ্টেম্বর।

বর্ষায় জল-কাদা এড়াতে বাটার বর্ষাজয়ী মাণিকজোড়

স্যানডাক ও ভলকান **Bata**

'প্রাণ বলিতে নাম হইতে আলো পর্যন্ত সব স্তরের স্বয়ংমূল্য বজায় রাখিয়া অথচ প্রতি স্তরের সঙ্গে অপর স্তরগুলির interpenetration ও permeation রহিয়াছে। সব স্তরের এই interpenetration ও permeation যে প্রাণে সম্ভবপর, সেই প্রাণেরই বলত পুরুষোত্তম। প্রাণের মধ্যে প্রাণ-অপানাদির ক্রিয়াশক্তিও রহিয়াছে তো নিশ্চয়ই; তবে উহাদের interpenetration ও permeationও সেখানে রহিয়াছে। ভাগবত লিখিতেছেন, 'প্রাণস্য হি ক্রিয়াশক্তিঃ বুদ্ধেবিজ্ঞানশক্তিতা'। ওই প্রাণকে কি vitality বলিলেও ঠিক হইবে না, কেননা vitality তো এক-স্তরাপ্রিতই আছে। প্রাণ অন্ন, vitality, conscious life, intellectual life, intuitional life-এর সমন্বয় বলিতে হইবে। যাহাদ্বারা বিশ্বের সমস্ত experience-এর ব্যাখ্যা চলে, যাহাদ্বারা conscious, unconscious সব স্তরের ব্যাখ্যান সম্ভব হয়, তাহাই পুরুষোত্তম-দর্শনের প্রাণ। সর্বশক্তি সমন্বয়-মূর্তিই প্রাণ। এই প্রাণ ও প্রজ্ঞা অভিন্ন। একই সত্যকে দেখিবার জন্য দুইটি standpoint মাত্র। প্রাণ প্রতিপন্ন করে রস, প্রজ্ঞা প্রতিপন্ন করে বিশ্বের ভাব। রস-ভাব-সমন্বয়ই বিশ্ব।'

— শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

— ১২ই অগ্রহায়ণ ১৩৫১

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। ছুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে।

"On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man namely the exploitation of man by man.

Occasional Speeches—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে —

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত	পাণ্ডুলিপি
ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)	১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	২। দশ বৎসরের দিনপঞ্জী, পত্রাবলী, ভাষণ ইত্যাদি।
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)	
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	
ঈশোপনিষৎ	
কেনোপনিষৎ	
কঠোপনিষৎ	
প্রশ্নোপনিষৎ	
ঐতরেয়োপনিষৎ	
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ	
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	
মুণ্ডকোপনিষৎ	
শ্রীনিতাগোপাল—জীবনে ও দর্শনে ৫·০০	
স্বরাজের পূর্ণরূপ ০·৫০	
গীতাজয়ন্তী ০·০৬	
উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা) ০·৫০	
মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা ৫·০০ (গান্ধী স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)	
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১২·০০	

ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রের
নারী-প্রগতির জন্মকথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিক্ষা
নিতাগোপাল ও শিক্ষা সুধার কথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমতী রেণু মিত্রের	
১। সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিতাগোপাল	১·০০
২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	২·০০
৩। শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন	
ওরিয়েন্ট বুক কোং প্রকাশিত	
৪। রবীন্দ্র-সুন্দর	৫·০০
৫। প্রাথমিক শিক্ষা	৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইহাটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, (ভায়া-দেশবন্ধুনগর, কলিকাতা-৫৯) ২৪ পরগণা।

1 3 JUL 1978

বিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইহাটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, কলিকাতা-৫৯ হইতে প্রকাশিত, প্রিন্টিং সেন্টার, (C/o. কে. বি. লাইব্রেরী) লাভিয়াডা, হইতে মুদ্রিত।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল বাণী ॥

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্ব-নাগরিক"

"এই বিশ্বই আমার মহাতীর্থ"

শ্রাবণ-ভাদ্র '৮৩, ১৯৭৬ সম্পাদিকা— রেণু মিত্র ২১শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশ চন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা

মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা টিপ্পনী ভাষ্য রহস্যাদি ও বিস্তৃত মূল্যবান ভূমিকাসহ। শঙ্কর, শ্রীধর, বলদেব, বঙ্কিম, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গীতাচার্যগণের মতালোচনাপূর্বক সম্পাদিত। অধ্যাত্মপ্রসঙ্গিক সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা ও ভক্তিমূলক উপসংহার। জ্যাকেট সহ কাপড়ে বাঁধাই ১৫·০০ টাকা। প্লাষ্টিকের জ্যাকেটসহ ১৭·০০ টাকা।

শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর শ্রীগীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ। "যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলাভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা"। "যতদিন বাংলাভাষা থাকবে, জগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।" ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

গীতার অন্যান্য সংস্করণ

বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০	নিত্য পাঠ গীতা	১·৫০
সুলভ পকেট গীতা	২·৫০	সদাপাঠ্য ক্ষুদ্র গীতা	১·০০
পদ্য গীতা	১·৫০	ঐ প্লাষ্টিক জ্যাকেটসহ	১·৫০

জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫·০০	ভারত আত্মার বাণী	৭·৫০
কর্মবাণী	১·৫০	Soul of India speaks	৭·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
সুলেখক শ্রী অনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ,		শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি, টি	
ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০	ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৩·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০	মানুষের মতমানুষ	১·৩০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৫·০০	বঙ্কিমের গল্প	৯·৫০
বাংলার ঋষি	৫·০০	বিদ্যাসাগর	৩·০০
বাংলার বিদুষী	৩·৫০	ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের	
বাংলার মনীষী	২·৫০	শরীর ও শক্তি	৩·০০
জীবন গড়া	০·৭৫	নীরোগদেহে দীর্ঘজীবন	২·৫০
রাজর্ষি রামমোহন	৩·০০	সহজ যোগ-ব্যায়াম	৩·০০
আচার্য জগদীশ	৪·০০	যোগ ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২·৫০	ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	২·৫০	যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৫·০০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০		

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৪·০০

সর্বদা ব্যবহার্য সরলাকৃতি অভিনব অভিধান। পরিবর্ধিত সংস্করণ। শব্দ সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার।

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

উজ্জ্বলভারত

শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৮৩, খ্রীঃ ১৯৭৬ উনত্রিংশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

বিপ্লবী শ্রীকৃষ্ণ

শ্রী রেণু মিত্র

বর্ণাশ্রম-অনুমোদিত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হয় না যে মাসটিতে, বিপ্লবী চূড়ামণি প্রাণ মন আকর্ষণকারী অথচ দুর্বোধ্য একটি মানুষ—তাঁর সবচেয়ে পরিচিত নাম শ্রীকৃষ্ণ—জন্মেছিলেন সেই ভাদ্র মাসটিতে। শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্র মাসেই শুধু জন্মান নি—এমন ভাবে জন্মেছিলেন সংসারী-দৃষ্টিতে যা দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা। অত্যাচারী রাজা নিজের হত্যাকারী বলে যে জন্মাতে পারে তারই নিধন-প্রয়াসী হয়ে জন্মাবার আগেই তার পিতামাতাকে নিজের আয়ত্তে রেখে ছিলেন, কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। শৃঙ্খলিত সেই পিতামাতার কোলে ভাদ্র মাসের অষ্টমীতে তথা বাদলের ধারাবর্ষণের মধ্যে যাঁর জন্ম হয়েছিল—স্বয়ং ভগবান বলেই তাঁর দুর্ভাগ্য দেখানেই শেষ হয় নি—ঐ ধারা-বর্ষণের মধ্যেই পিতামাতার কোল তাঁকে পাল্টাতে হয়েছিল—চলে আসতে হয়েছিল গোপ-পল্লীর নন্দ-যশোদার ঘরে। এহেন কৃষ্ণ সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে পূজাও মানুষের কম পান নি, গালিও মানুষের কম খান নি। মহাভারতের পাতা উল্টালেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবু তিনি অখিলাত্মার আত্মা—এ স্বীকৃতি তাঁর কেউ মুছে ফেলতে পারে নি। শ্রীকৃষ্ণ-বস্তুকে বুঝি নি—তবু তাঁকে প্রণাম করতে ভাল লাগে—অর্জুনের সাথে সুর মিলিয়ে বলিতে ভাল লাগে—

'কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বতঃ এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥
পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ
কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব'

ভাগবতের ভাষাতেও আর একবার প্রণাম জানাই—

'ওঁ কৃষ্ণেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং
বর্হাবতংসপ্রিয়ম্
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং
পীতাম্বরং সুন্দরম্
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিততনুং
গো-গোপসঙ্ঘাবৃতং

গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং
দিব্যাঙ্গভূষং ভজে।'

কৃষ্ণকে কেন প্রণাম জানাবো ? কেননা :

'বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরৌষ্ঠাৎ
পূর্ণেন্দু সুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বং অহং ন জানে'।

আরও কেননা :

'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদং চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ'।

কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বং অহং ন জানে—কেন ? কৃষ্ণ-কথা শুনলে, হৃদয়ঙ্গম করলে, আচরণে আনতে পারলে হৃদ্‌রোগ কাম আশু বিদূরিত হয়। কাম কি বস্তু ? যা কিছুকে—তা বস্তু হোক বা ভাব হোক—উপযুক্ত মূল্য দিতে না পারাই কামুকতা। কোন একটা ঘটনাই কাম নয়। দেশ কাল পাত্র সম্বন্ধে মাত্রা-জ্ঞান জন্মালেই কামুকতা দূর হয়। সেখানে যখন যেটা শোভন নয়, সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর নয়, তা করাই কামুকতা। যা খেলে, যতটুকু খেলে, যখন খেলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব—তা তেমন করে খাওয়াও কামুকতা। এই মাত্রাজ্ঞানহীনতা দূর হয় তেমন জীবন-কথা শুনলে বুঝলে আয়ত্ত করলে, যাঁর জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই মাত্রা-জ্ঞান পূর্ণরূপে প্রকাশিত। তাই মানুষ-দেহে শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম, ভগবান। যেমন করে ব্যবহার করলে বিষয় প্রসাদ হয়—বিষয়ের বিষদাঁত ভেঙে যায়—শ্রীকৃষ্ণ তেমন করেই বস্তুকে, ভাবকে ব্যবহার করেছেন। মাত্রাজ্ঞানেই বিষয় প্রসাদ হয়—তার মধ্যেই কামুকতা দূর হয়।

এই মাত্রাজ্ঞান জন্মাতে পারে যখন ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ-জীবনানুসারে তথা পাশ্চাত্য দার্শনিক অরবিন্দের মতেও এই কথা মেনে চলে যে, 'Spiritual life is at the same time a self-life and a cosmic life'। ব্যক্তি যদি শুধু ব্যক্তি-জীবন যাপন করে, বিশ্ব-জীবন (cosmic) থেকে যদি সে দূরে থাকে, সর্ব মানুষকে ভালবেসে, নিজের সমস্ত চলাবলা দিয়ে যদি সে মানুষের সেবা-বুদ্ধিতে জীবন পরিচালনা না করে, তাহলে কোন মানুষ মাত্রাজ্ঞান লাভ করতে পারে না। বিশ্ব থেকে নিজেকে বিবিক্ত করে নিলেই সব কিছুর অর্থ ও রূপ বদলে যাবে—তখন বস্তু বা ভাবের reorientation মানে আর rearrangement নয়, তখন সব কিছুকে বাদ দেবার চেষ্টাই সংযম; আর যত বাদ দিতে চাওয়া যাবে তত আরও তার প্রতি আকর্ষণ বাড়বে—তখন আরও দৃঢ় করতে হবে সেই বাদ দেওয়ার সাধনা:—দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের অন্যান্য সাধনা বলতে এই বোঝাত। কিন্তু বিশ্বের রূপ ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন সেই পুরুষোত্তম কৃষ্ণ—বিশ্বকে হজম করে যিনি বিশ্বম্ভর, বিশ্বরূপ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে কি সেই রূপে আমরা দেখেছি ?

বিষটা মানুষের either or-এর বুদ্ধি সেই কৃষ্ণকে পূজো করেও এই চিন্তাতেই অভ্যস্ত যে কৃষ্ণই সত্য, সুন্দর; তাঁর হাতে গড়া এই বিশ্বটা সত্য নয়, সুন্দর নয়—এ শুধু ফাঁদ—মানুষকে কেবল বন্ধনে আটকানোই তার কাজ। তাই যুগ যুগ ধরে কৃষ্ণ-পূজা করেও তাঁর বিপ্লবী জীবনের অর্থ আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয় নি. তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু

কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে কেঁদে কৃষ্ণকে ছোট বড় বহু মানুষের ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন বটে—বর্ণাশ্রমী ভারতবর্ষে যেটা একটা মস্ত পদক্ষেপ—তবু যে-কৃষ্ণ বলিল অর্থাৎ ভূমা, নৈষাং মাল্প সুখমস্তি—সে-কৃষ্ণকে কি আমরা নিতে পেরেছিলাম? আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা তথা কম্যুনিজমের চূড়ান্ত বস্তুতান্ত্রিকতার বন্যায় যখন ভারতের মানুষ আকণ্ঠ ডুবে গেছে—বিশ্বের মানুষও বস্তুর চাপে আত্মহারা হয়ে শান্তি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না, তখন শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বকেই বর্তমান যুগের ভাষায় পাই যখন শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ শেখালেন, 'পূর্ণজ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান। পূর্ণ জ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান। সর্ব জড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণ জ্ঞান'; কিংবা 'অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ। অল্প অগ্নিও অধিক অগ্নি হইতে পারে। পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ। পরিমিত সচ্চিদানন্দও অপরিমিত সচ্চিদানন্দ হইতে পারেন'; কিংবা 'নিত্য অনিত্য সমন্বয়, বা জ্ঞান অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার সমন্বয়। আকার নিরাকার সমন্বয়। সাকার আকার নিরাকার সমন্বয়। জড় অজড় সমন্বয়। চৈতন্য অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-অদ্বৈত সমন্বয়। সর্ব সমন্বয়'; কিংবা 'জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র সত্য চন্দ্র নয়। দূর হইতে মরুভূমির স্বচ্ছ বালুকারাশি দেখিয়া মৃগের জল বোধ হয়। বালুকাময় প্রদেশ সত্য, সেটা যাহা তাহা সত্য, কিন্তু জল-ভ্রমটা মিথ্যা। জগৎ সত্য, কিন্তু মায়াবশতঃ জগৎকে আমাদের যাহা বোধ হয় তাহা মিথ্যা'—তখন এইসব বৈজ্ঞানিক ভাষায় প্রকাশিত দার্শনিকতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-জীবন অনেকখানি সহজ হয়ে আসে। তাই শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ তাঁর স্বল্প জীবনে শত শতবার নির্বিকল্প সমাধিস্থ হয়েও সগৌরবে ঘোষণা করে গেছেন, 'আমি বিশ্ব-নাগরিক'। 'এই বিশ্বই আমার মহা-মঠ'। তাই তো শ্রীকৃষ্ণের জীবন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোগোপসঙ্ঘাবৃত বহু ঘটনা-আকীর্ণ বিস্তৃতময়।

ছোটর মর্যাদাদানকারী পোষণধর্ম শ্রীকৃষ্ণকে আজ বড় প্রয়োজন তাঁর বিপ্লবী সত্তা দিয়ে আমাদের বিপ্লবী করে তুলবে এই জন্য। শৈশব থেকে যদি এ ভাবনা না দেওয়া যায় যে, আমিই প্রতিষ্ঠিত হব তা নয়, সকলকে নিয়ে আমি প্রতিষ্ঠিত হব, তাহলে বড় হয়ে সে সমাজ-সেবা করবে তা হয় না। শিশুকে ছোটবেলা থেকে জানাতে হবে সবাইকে নিয়ে একসাথে তাকে বাঁচতে হবে, একলা সে বাঁচবে না। তাই তো গো-গোপসঙ্ঘ-বৃত শিশু-কৃষ্ণের সঙ্গে সবাইর সম্পর্ক হৃদয়ের—সবাইকে ভাল না বাসলে সবাই মিলে বাঁচব এ অনুভূতি সহজ হয় না—যুক্তিতে খানিকটা পৌঁছন যাওয়া যায় বটে। সকলের সুখ দুঃখ যখন আমার মধ্যে সহজ স্পন্দন জাগায়, তখনই সেটা জীবন্ত সমাজ সৃষ্টির ভিত্তি হতে পারে। নইলে জোর করে কতকগুলি মানুষকে একত্র বাস করালেই তা জীবন্ত সমাজ সৃষ্টি করতে পারবে না—অভ্যাস খানিকটা সাহায্য করলেও। মানুষের মধ্যে ব্যক্তি-সত্তা ব্যক্তি-চেতনা অত্যন্ত প্রবল—অথচ দ্বিতীয় না থাকলে তার ব্যক্তি-আস্বাদনই যে হবে না এটা খুব ছোট থেকেই তার মধ্যে সহজ করে তোলা দরকার; তাকে জানতে হবে একক হয়েও সে গোষ্ঠ-প্রেম মধ্যে বিধৃত এবং পারস্পরিক সম্বন্ধটা হবে ভালবাসায়—নইলে কামের বিকৃতির বিভিন্ন প্রকাশ

ব্যক্তি মানুষকে হতচেতন করবেই। এইখানে আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত কৃষ্ণ-জীবন। ভালবাসার মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের মধ্যে মানুষ হিসাবেই আছেন, আবার ভালবাসার মধ্য দিয়েই তিনি মানুষের আত্মাস্বরূপে মানুষের ইষ্ট হয়ে আছেন। পরাণ-বল্লভ এই কৃষ্ণ তাই যুগ যুগ ধরে ভারতের মাটিতে বেঁচে আছেন—তাঁর বিপ্লবী সত্তাটুকু ছাড়াও। আজকের সমাজ-চেতনায় তাঁর সর্বক্ষেত্রের ঐ বিপ্লবী সত্তাটুকু প্রকাশিত করে তুলতে হবে—তাহলেই ব্যক্তি থেকে আজ যেখানে দলীয় সত্তা-দ্বারাও মানুষ সেই নিষ্পেষণেরই শিকার হয়ে রইল, সেই অবস্থা থেকে তার মুক্তি ঘটতে পারে। তাই এই ভাদ্র মাসে তাঁরই আবাসিত এই বিশ্বের মধ্যে, এই বিশ্বের সঙ্গে তাঁকে অনুধ্যান করি, তাঁর চলার পথের অনুসারী হয়ে বিশ্ব পোষণঘন চিহ্নাশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক, বস্তু বা ভাবকে বা যে কিছুকে তার উপযুক্ত মর্যাদা দেবার মাত্রা-জ্ঞান মানুষের মধ্যে প্রস্ফুটিত হোক—তবেই পচাগলা এই বিশ্বটির চেহারা বদলে যাবে—তখন আলো-বাতাসের আকাশ তলে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের হাত ধরাধরি করে প্রত্যেকে সহজে বলতে পারব 'আমি আনন্দিত'।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

১৯৫৫

আমার রাধাষ্টমী আজ। প্রার্থনায় যোগদান করি। আমার পরাণ-পুতলী রাধারাণী, তোমাকে ডাকিয়া খুঁজিয়া পাই নাই। তুমি অযাচিত ভাবে, স্বেচ্ছায় আমার জীবনের মাঝে আসিয়াছ। কোনও কূলে তুমি নাই, কূলত্যাগিনী। আমিও তোমার সঙ্গে চলিব। ওগো, অভিসারিণী, ওগো বিপ্লব-ময়ী, বৃষভানুদুলালী, কৃত্তিদানয়নমণি, শ্রীকৃষ্ণ-রঙ্গিণী, শ্রীকৃষ্ণ-ভামিনী, আমার জীবন-বল্লভা, বিনীতা-বিদগ্ধা, পত্না প্রকৃতি, আমার প্রকৃতি তোমার প্রকৃতিতে গড়িয়া উঠুক। আমি তুমি হইব। তোমার আসন রচনা করিব এই অপরা প্রকৃতির বুকে—এই সংকল্প লইয়াই না পথে বাহির হইয়াছিলাম? পথের দুই ধার—সংসার ও সন্ন্যাস, আত্মা ও অনাত্মা, আকাশ ও মাটির দিক—দুইতে অনবরত অব্যাহত ভাবে আক্রমণ চলিতেছে। শুধু তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া পথ-চলায় যেসব কিছু অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছি। ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত আমার দেহ তোমার চরণে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইব। বর্ষাণ, বর্ষাণ—রাধারাণীর জন্মভূমি বর্ষাণ—আমায় কৃপা কর। আমার জীবন-ধন শ্রীরাধা আমার হউন। সকালে বহুদিন পর প্রার্থনায় যাই। ৭টায় পাঠ আরম্ভ হয়। 'রাধা-তত্ত্ব'

সম্বন্ধে আলোচনা। যেন এক চোখের মুক্তি পাঠ করে। ইহার দার্শনিক ব্যাখ্যা নেই। 'মন্ত্র-ধ্রুব ভাব'-প্রেম দুই জোড় করি। কেহ নাহি জিতি কেহ নাহি হারি'। পূর্ণের এক নূতন অর্থ। দুই-ই সম মূল্য। নিতাগোপালের শক্তি-শক্তিমান যোগ পাঠ করা হয়। সাংখ্যের অন্ধ প্রকৃতি চক্ষু পাইল পুরুষের কাছ হইতে পুরুষের স্পর্শে, সাংখ্যের পঙ্গু পুরুষ পা মাগিয়া নিলেন প্রকৃতির কাছ হইতে। সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ বিকলাঙ্গ। ভক্তে তাঁহারা পূর্ণাঙ্গ হইলেন। রাধা-তত্ত্ব মায়াবাদের দার্শনিক ও সমাজ-গঠনের প্রতিবাদ। 'রাধা-সুধানিধি' হইতে কয়েকটি কাহিনী পরে বর্ষাশেষে সেই বাবা-জীকে রাধারাণী কর্তৃক চরু খাওয়ার কথা সম্প্রতি বলি। শীতল বাবু ও তাহার স্ত্রী আসেন। সত্যেন্দ্র ও তাহার স্ত্রী আসে। বুঁদে প্রসাদ দেওয়া হয়। বর্তমানে মেয়েদের সামনে বিনীতা বিদগ্ধা রাধারাণীর জীবন পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। নচেৎ রক্ষা নাই। পুরুষের তাড়নার অন্ধ মেয়েরা বিচার করিবার মত দৃষ্টি-শক্তি পাইলে সমাজ সুস্থ হইবে। 'প্রেম করবি সুপুরুষ জানি'। ২৫শে সেপ্টেম্বর।

ঠাকুর, আমি সারা জীবন (বুদ্ধি হওয়ার পর হইতে) জীবন্ত রক্ত মাংসের পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছি। মাটির পুতুল পূজা করি নাই। মানুষের পূজা করিয়াছি। কোনও পুতুলে কি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলাম? মঙ্গল ঘট বসাইলাম। পূজাই বুঝি হইল না। মানুষ পাইবার জন্য কি আরাধনাই না করিয়াছি। মানুষের পিছনে সারা জীবন ছুটিয়াছি। মানুষ পাইবার জন্য যে বিরাট হাহাকার, তাহা কি কেহ বুঝিল? কেহ কি আমার বেদনার সাড়া দিল, আপনার হইল? যে প্রাণ দিয়া মানুষ চাহিয়াছিলাম, সে প্রাণের কাছে কেহ কি ধরা দিল? কেহ কি আমার ঠাকুর, ঠাকুরের দর্শন নিল? যাহার যাহা আছে, সে তাহা নিয়াই বেশ আছে। আমি ভাসিয়া চলিলাম। স্বরাজ-আন্দোলনে প্রার্থনা করিয়াছি – "মা, স্বরাজ যেন মেয়েদের হাত দিয়া আসে"। মেয়েরা যে সমাজে বড় ছোট। তাই এই প্রার্থনা। মেয়েদের জীবনে রাধারাণীর প্রতিষ্ঠা করিব, ইহাই তো সারা জীবনের আশা। সে আশা কি নিষ্ফল হইল? যাহা হয় করিও। বেলা ৯টার পরে বাহির হইয়া ফেরে প্রায় ২টায়। খাইয়া আবার যায়। ফেরে ৭টায়। কুমারও ঘুরিয়া আসে। বৈকালে নকুলেশ্বর বাবু আসেন। ২ ঘণ্টা থাকেন। রাধাষ্টমীর আলোচনার কথা বলি। 'সহশিক্ষা ও তাহার ভবিষ্যৎ' তিনি দুই-বার পড়িয়াছেন। তিনি বলেন, 'দৌড়ের চরমে না গেলে মানুষ শুনিবে না। তবু আপনাকে বলিয়া যাইতে হইবে'। জাতির তরুণ তরুণীরা যদি এইভাবে কামের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, তবে ভবিষ্যৎ যে একেবারে অন্ধকার। আমি সতর্ক-বাণী শুনাইয়া যাইব। আমার কণ্ঠ ক্ষীণ। তবুও আমার বলা ছাড়া গতি নাই রাধারাণীকে পাইয়াছিলাম পথে বাহির হওয়া এইসব মেয়েদের উদ্ধারকর্তা রূপে। তাঁহার কথা শুনাইয়া যাইব। যদি কাহারও ভাল লাগে। সন্ধ্যার পর সেবানন্দ আসে। তখন সুহৃৎবাবু ও কনক আসে। সুহৃৎ-বাবু তাঁহার প্রবন্ধ দিয়া যান। ২৬শে সেপ্টেম্বর। সত্যব্রত একদিন বলিয়াছিল, 'আমরা ভাই-বোনেরা বসিতে চাই'। আমি বলিলাম 'বেশ,

আমি চলিতে চাই। আমি চলিলাম'। যেখানে-'চলা' নাই, সেখানে বসা যে কি ভীষণ, তাহা আমি বুঝিয়াছি। আমি চলিতে চলিতে বলিব, বলিতে বলিতে চলিব। উপনিষদের 'আসীনঃ দূরং ব্রজতি' মন্ত্র, ঠাকুর, আমি তোমার কৃপায় জীবনে আস্বাদন করিব। আমার tight হইয়া বসা চলিবে না। সে যে কি ভীষণ মৃত্যু তাহা আমি বুঝি। তেমন মরণ আমি মরিব না। আমার সারা জীবন 'চলা'র জীবন। সেই কবে পথ চলা আরম্ভ করিয়াছি, আজও চলিতেছি। এ চলার শেষ নাই। কত লোক আসিল, কিছু দূর আমার সঙ্গে চলিল, শেষে বসিয়া পড়িল। আমি রুদ্ধ হৃদয়াবেগে চোখের জল মুছিতে মুছিতে চলিলাম। চলা ছাড়া তো আমার গতি নাই। ঐ যে কে সামনের দিকে আমায় ডাকে—'চরৈবেতি, চরৈবেতি'। যাহাকে কাছে পাইয়াছি, বুকে তুলিয়া লইয়াছিলাম। তাহারা বুক হইতে নামিয়া গেল। বুকটা বুঝি আমার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই ভাঙ্গা বুক লইয়াও ঠাকুরকে বুকে লইয়া চলিব। পথ, ওগো পথ, তুমি আমার নারী জীবনের সঙ্গী। তুমি আমার, আমি তোমার। তুমি আমি ঠাকুরের। রেণু ১২টায় বাহির হইয়া ফেরে ৭টার পর। মলিনা চুপুরে আসে।···সন্ধ্যার পর ব্রজেন্দ্র চালদার ও তাহার ভাগিনের শচীন্দ্রনাথ আসে।··· 'সন্তরণের রহস্য' প্রবন্ধ আজ শেষ করি। নীরোদ বাবুর ওখানে রেণু আজ গিয়াছিল। সিমেন্ট সরাইয়া নিতে বলিয়াছে, সে ঘরে দুর্গাপূজা হইবে। আজ রাত্রিতে ৪টার সময় ঘুম ভাঙ্গে। এক ঘুমে এতক্ষণ দীর্ঘ মাসের মধ্যে ঘটে নাই। ২৭শে সেপ্টেম্বর।

ঠাকুর, নারী মূর্তিমতী বাধা, জটিলতা, মায়া। তুমি সেই বাধাকে দার্শনিকভাবে, ব্যক্তিগতভাবে অস্বীকার করিয়াছ। আমি উহাকে সামাজিক ভাবেও স্বীকার করিয়াছি। এমন প্রেম-মন দেও যাহাতে ঐ বাধা জটিলতা মায়া অন্তর্হিত হইয়া পারস্পরপ্রাপ্ত হয়, জীবনের মুক্ত সাবলীল অব্যাহত গতি বজায় থাকে: জীবন তো সহজ নয়, বাধাই জীবনকে বক্র করে, জটিল করে। পুরুষ সোজা যাইতে চায়। ইহাই তাহার স্বরূপ। নারী তাহাকে curve করে, বক্র করিয়া দেয়। তাই নারীকে, মায়াকে এ দেশের দর্শন-শাস্ত্র কৈবল্যের অন্তরায় স্থির করিয়াছে ও মায়ার সঙ্গকে বিবেকের দ্বারা ছিন্ন করিতে চাহিতেছে। পুরুষের চক্ষু আছে, পা নাই; প্রকৃতির পা আছে, চক্ষু নাই। অন্ধ লোকেরা যদি পথে চলিতে থাকে, তবে ঠোকাঠুকি করিয়া মরিবে নিঃসন্দেহ, নয়তো প্রত্যেকে পগারে পড়িয়া মরিবে। চক্ষুষ্মান পঙ্গু পুরুষ না থাইয়া মরিবে। জীবনের এই দুই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে পুরুষ প্রকৃতি সমন্বয়, বাধা ও অবাধার সমন্বয়। বাধার টুকরাগুলি যদি অবাধ-গতি হয়, তবে কি শোচনীয় পরিণতি হয়? মেয়েরা বাধা বলিয়া মেয়েদের সঙ্ঘ হওয়া একরূপ অসম্ভব। এই কথা সরোজিনী দেবী (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের ভগিনী) আমাকে বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'ভাই, তুমি মেয়েদের সঙ্ঘ গড়িতে চাও? একটি কথা বলিয়া রাখি—যদি ১২টি মেয়েকে একত্র রাখ, তবে অন্ততঃ ১৩টি হাঁড়ি করিও। একত্র এক হাঁড়িতে তো খাইবেই না, অন্ততঃ ঝগড়া করিয়া রোজ একটি হাঁড়ি ভাঙ্গিবেই।' পুরুষেরাই একমাত্র নারী-সঙ্ঘ রচনা করিতে পারেন।

তখন নারীর ধারা অদ্বৈতময়ী বলিয়া অমৃতময়ী। রেণু ১১টার পরে বাহির হয়। ···ভাগবতের যে সূত্রে মুক্তির উপর কটাক্ষ আছে? 'মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ' 'ন কাময়ে অপুনর্ভবম্ বা'—'নৈতান্ কৃপণান্ বিহায় বিমুমুক্ষে', 'যে ক্লিশ্যন্তে' ইত্যাদি···। আমার কথা স্পষ্ট ভাবে বলি। পরিচ্ছিন্ন মনবুদ্ধির মুক্তিও পরিছিন্ন, ভক্তই চরম ও পরম মুক্ত।

মিনু তাহার ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ভাল ভাবে চলিলেই আমি খুশী। আমি তো সকলকে বুকে করিয়াই রাখিয়াছি।

২৮শে সেপ্টেম্বর

ঠাকুর, তোমার দর্শন যে কতবড় বিপ্লবাত্মক, অথচ মানব জাতির পক্ষে পরম কল্যাণকর, এক বিস্ময়ের বস্তু, তাহা যত দিন যাইতেছে তত বুঝিতেছি। সমস্ত 'প্রত্যয়ের' উপর, সকলের সব hypothesis-এর উপরই তো তোমার প্রশ্ন। 'তুই যে কেমন দয়াময়ী কেউ জানে না আমার চেয়ে।' 'দয়া'-শব্দের নূতন অর্থ তুমি দান করিলে। 'পূর্ণ', 'এক', 'নও' প্রভৃতির অর্থ তুমি ব্যাপক ও dynamic করিয়া দিয়াছ। সবলের সব এতদিনকার যুক্তিস্থলের আরও পিছন হইতে তুমি যাত্রা করিয়াছ। Law of undistributed middle-এর পিছনে অবস্থিত 'মধ্যমপ্রাণ' হইতে তোমার যাত্রারম্ভ। আমি কেমন করিয়া ইহাকে মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া দিব? আমায় শক্তি দেও, সুযোগ দেও। এত রিক্ত আমি, আমার এই আবেষ্টন কি পরিপাক করিতে পারিবে না? উজ্জ্বলভারত কি তোমাকে বহন করিয়া মানুষের দরবারে লইয়া যাইবে না? অবশ্য কোনও suggestion দেওয়া চলে না। তোমার চেয়ে তো তোমার দর্শন কেউ ভালবাসে না। তবু তোমার সেবক হিসাবে এই কথা মাঝে মাঝে মনে হয়। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। রেণু ১০।।টায় বাহির হইয়া ফেরে সন্ধ্যা ৬।।টায়। নীলুর এক চিঠি আসে। সারা জীবন কর্মের মধ্যেও জ্ঞান-ভক্তি সাধনা সমানভাবে বজায় রাখিতে পারিয়াছি, ঠাকুর, তোমার কৃপায়। তাই রাজনীতির আবর্তের মধ্যে পড়িয়াও চোখের জল হারাই নাই। আমি বাঁচিয়া গিয়াছি। কর্মের ঝঞ্ঝাট আমাকে বিব্রত করে নাই, জ্ঞানের শুষ্কতা জীবনকে রসহীন করে নাই, ভক্তির ভাবালুতার মধ্যে ডুবিতে পারি নাই। শুধু তুমি সঙ্গে সঙ্গে ছিলে বলিয়া। আমার জীবনে কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির ত্রিবিধ আস্বাদনের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটিয়াছিল। কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি পরস্পর নিরপেক্ষ ও পরস্পরাপেক্ষ আমার জীবনে। কোনও একটীকে একান্ত করিয়া নিবার দুর্ভাগ্য আমার হয় নাই। ঠাকুর, তোমার জয় হউক। ২৯শে সেপ্টেম্বর

যেদিন হইতে 'নরনারায়ণ আশ্রম' নরনারায়ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কসের দায়িত্ব ভার নিয়াছিল এই আশায় যে উদ্বৃত্ত লভ্য অর্থ নরনারায়ণ আশ্রমের আদর্শ প্রচারের ভার লইবে, সেইদিন হইতেই নরনারায়ণ আশ্রমের সেবকগণ বিভ্রান্তিতে পড়িল। কর্ম কেমন করিয়া জ্ঞান-ভক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারে তাহা আমি জানিতাম। তাহারা ইহা আমার কাছ হইতে নিল না। তাহারা জ্ঞানের সাধনা, ভক্তির সাধনা পরিত্যাগ করিল, কর্মী হইল, আমার সঙ্গে ব্যবধান বাড়িল। নরনারায়ণ আশ্রমকে দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে হইল। কর্মীরা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। একা আমি রহিলাম। আজ যাহারা সঙ্গে আছেন

তাহারাও বোধ হয় ভুলিয়া যাইতেছেন যে এখানে আদর্শ লইয়াই থাকিতে হইবে। যাহারা আসে, তাহারা তাহাদের সংসারের কথা নিয়াই আসে। কোনও সমাধান তাহারা চায় না। কেন আমি ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের কথা নিয়া থাকিব? বিষয়ের কথা শুনিতাম, যদি সমাধানের পথ দেখানো যায়। কিন্তু ঠাকুর ছাড়া কি করিয়া সমাধান মিলিবে? আমার তো ঠাকুর ছাড়া দিন চলিবে না। ঠাকুর আমার জীবনের সকল সমস্যার সমাধান। সারা দিন প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় রেণু বাহির হইতে পারে নাই। কুমার বাহির হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর ধীরেন আসে। ছেলেপুলেদের জামা তৈয়ারীর কাপড় দিয়া যায়। দুপুরে ঘুমের পর হইতে প্রসাবের উদ্বেগ বেশ বাড়ে। সকালে পুলিন ও শচীন্দ্রনাথ আসিয়াছিল।

৩০শে সেপ্টেম্বর

আমার প্রাণের ঠাকুর, তোমার স্পর্শ আমায় রক্ষা করিয়াছে। এত জটিলতা ও আবিলতার মধ্য দিয়া আজও চলিতে পারিতেছি মাথা উঁচু করিয়া তোমারই কৃপায়। তুমি অদ্ভুত। শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে তোমার কত পার্থক্য অথচ তোমরা দিলে অভিন্নহৃদয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, আর তুমি অবধূত। তিনি কামিনী কাঞ্চনে ভীত, তুমি নির্ভীক। তুমিই এই যুগের একমাত্র বান্ধব। ...এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ, না-মানার যুগ। এ যুগকে তুমি ছাড়া কে বাঁচাইবে? তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করার কোনও পথ না পাইয়া বেদনায় আমার দিন কাটে। তুমিই আমার জীবনের একমাত্র বন্ধু। তুমিই আমার আছ। কেহ তো তোমার জন্য ছুটিয়া আসিল না? কাহাদের লইয়া তোমার আদর্শের কথা বলিব? কেমন করিয়াই বা তোমাকে বিশ্বের মধ্যে ছড়াইয়া দিব? ভাবিয়া কূল পাই না। আমাকে সুযোগ দেও। রেণু ৯॥টায় বাহির হইয়া পথে কিছু খাইয়া ফেরে ৪টায়, তখন খায়। কুমার খাওয়ার পর বাহির হয়। বিজ্ঞাপন আশানুরূপ মিলিল না। সারা জীবন আমার চলিয়াছে 'এক তরফা' সমাধানের চেষ্টায়। দো-তরফা মীমাংসা করায় যে বুদ্ধি লাগে তাহা আমার নাই। ভগবানও তো এই পথ ধরিয়া চলেন। 'অনন্ত' হইলেই তিনি যোগক্ষেম বহন করিতে পারেন। প্রাণের সাধনাই এই। "'অনন্ত' হও, এসায় হও, পৃথকবুদ্ধি ছাড়, তোমাদের সকল দায়িত্ব বহন করিব, নইলে আমি পারিব না"। আমিও একীভূত না হইলে কিছু করিতে পারি না। আমার ভিতরে যে আসিল, আমিও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিব। আমার ভার তুমি লও, আমি তোমার সংসারের ভার লইব। আমার ভার আমার, তোমার ভারও আমার—ইহা হয় না। ইহা নিতান্ত বণিক মনোবৃত্তি। মালা বদল হইলেই আমি সব ভার বইতে পারি। সারা জীবন আপন জনদের বোঝা বইবার জন্য প্রাণপাত করিলাম। কেহ বোঝা বইতে দিবে না, আমি মুটে। বোঝা বইবার চাকুরী আমার যায় যায় হইয়াছে। মানুষের বোঝা টানিয়া নিজের মাথায় আনিবার জন্য কি ছড়াছড়িই না করিয়াছি। মানুষ বোঝামুক্তি চায় না। বোঝা বহা হইবে, মুক্তিও বজায় থাকিবে—এমন সাধনার খবর তো পাইয়াছিলাম। কেহ নিল না।

১লা অক্টোবর

ঠাকুর, শরীরের এই অবস্থা নিয়া কতদূর কি করিব জানি না; তথচ আমার হৃদয় তো মানে না। চলিয়া যাইতে আপত্তি নাই। কিন্তু তোমার দর্শন ও অবধূত জীবনের কথা বলিয়া তো যাওয়া হইবে না। দুঃখ তো সেইখানে। কে বা কাহারা তোমার কথা বলিবার জন্য বসিয়া আছে? অবধূত ও পরমহংসে কত তফাৎ এই যুগকে ইহা না বুঝিলে তো চলিবে না। অবধূত নির্ভীক। বর্তমানের জটিলতম পরিস্থিতির মধ্যে তুমি ছাড়া কে এমন নির্ভয়ে সকল সমস্যা নিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া সমাধান দিয়া গেল? চতুর্দিকে যাহারা আছে তাহাদের মধ্যে তো সাড়া দেখি না। উৎসাহ নাই, কর্ম-প্রেরণা নাই, সমস্যার জন্য কোন তীব্র ছটফটানি নাই। বেশ তাহারা আছে। এই 'বেশ থাকা' মানুষদের মধ্যে দিনের পর দিন থাকিব আমি কি করিয়া? তোমায় লইয়া আমি বিব্রত। তোমার 'জয়' দিয়া যাইতে পারিলাম কৈ? মানুষের জন্য বৃথা প্রতীক্ষা করিলাম। তবু তো কেহ আসিল না। ...শ্রীকৃষ্ণ শব্দের নূতন অর্থের খোঁজ দিয়াছেন, 'উদাসীন', 'করুণ', 'বস্মাৎ ন উদ্বিজতে' ইত্যাদির। 'উদাসীনবদাসীনঃ'—শ্রীকৃষ্ণোক্তি ভাগবতে নন্দমহারাজের কাছে। উদাসীন অর্থ indifferent নয়। গীতাকে তাঁহার স্তর হইতে তাঁহার জীবনালোকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তাঁহার জীবনও 'এককরুণা'। অনন্ত হইলে তবে 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'। সাক্ষাৎ ভজন যাহাদের, তাহারা 'যুক্ততম'। পরোক্ষ ভজন যাহাদের, যাহাদের মন-বুদ্ধির স্তর হইতে সুরু করিতে হয়, তাহাদিগকে অক্ষর-সর্বভূতের সাধনা সমানভাবে চালাইতে হইবে। অক্ষর-সর্বভূত দুই-ই অনন্ত, অন্যোন্যাপেক্ষ, অন্যোন্যনিরপেক্ষ। 'দেবীদাং গুণ-লিঙ্গানাং' শ্লোক ও 'মদ্‌গুণশ্রুতি-মাত্রেণ' শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যাত হয়। 'উপাধিবিধুর' শব্দের ব্যাখ্যাত হয়। সমুদ্র-তরঙ্গ-এর উপাধি-বিধুর সহজ সম্বন্ধই ব্যাপ্তি। 'উপাধিবিধুর স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধঃ ব্যাপ্তিঃ'। ভক্তিতে এই ব্যাপ্তি রহিয়াছে। রামকৃষ্ণদের 'intuitional truth' সম্বন্ধীয় অংশ পঠিত ও ব্যাখ্যাত হয়। জগদীশ-বাবু, শীতল ও তাহার বন্ধু আসিয়াছিলেন, বিলাসবাবু আসে নাই। প্রস্রাবের উদ্বেগ বাড়িয়াছে। ২রা অক্টোবর

ঠাকুর, তোমার জীবনের আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া আমি তোমাময় হইব, তোমার জীবনের বিস্তার ও গভীরতার সম-অধিকারী হইব, তোমাকে আমার দেহে প্রাণে মনে বুদ্ধিতে, বিশ্ব-জীবনে ধারণ করিব, তোমাকে আমার মধ্যে ও আমাকে তোমার ভিতর সৃষ্টি করিব, দিব্য মৈথুনানন্দ লাভ করিব। তুমি আমার জীবনকে অবলম্বন করিয়া তোমার অবধূত জীবন প্রকট কর, আস্বাদন কর। ...আমাকে দেখিয়া বিশ্ব কবে তোমাকে দেখিবে, আমাকে ছুঁইয়া বিশ্ব কবে তোমাকে ছুঁইবে? এমন যেন হই। ইহাতেই আমার চরম ও পরম সার্থকতা। তুমি সাগর, আমি নদী। ...রেণু ৮টার পূর্বে বাহির হয়, মাঝখানে তাহার মাসীর বাসায় খায়, ৪টায় ফেরে। কুমার কোন দিন দিদাই কোন যোগ্যতা দেখাইতে পারে নাই। কোনও impression কোনও পার্টির কাছে দিতে পারে নাই। কর্মশক্তি নাই, কোন দয়দও নাই। স্থবিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সন্ধ্যার পর অমরেশ আসে। ১০৲ টাকা আমাকে দেয়। রাত্রিতে

এখানে খায় শোয়। তাহাকে দিয়া 'সহশিক্ষা ও তাহার ভবিষ্যৎ' পড়াইয়া শুনি। ব্যাঙ্কে টাকার অবস্থা শোচনীয়। এ অবস্থায় কোনও লোক রাখা আর তো সঙ্গত হইবে না। কুমার আসাতে কোন আয় বাড়িল না। সে দিকে দৃষ্টিও তাহার নাই। এত বড় দায়িত্ব মাসের পর মাস বহন করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। সেও বিপন্ন হইবে, আমিও বিপন্ন হইব। শচীর তাহার ভাল নয়, কোন উদ্বেগ তাহার নাই। ডাক্তার দেখায় না। রাত্রিতে দুধ খই, কয়েকদিন চিঁড়া-দই খাইয়াছে। দিনরাত্রি মুখে পান থাকে। কোনও কর্ম-প্রেরণা তাহার নাই। অবসন্ন, শিথিলপ্রযত্ন। কোনও প্রেরণা তো আনিতে পারিলাম না। দুঃখ হয় ওর জন্য। আসিয়াও মানুষ হইল না। কোথায় দাঁড়াইবে? আমি ভাবিয়া আর কি করিব? ঘরে বাহিরে ওর ঝঞ্ঝাট। আপন বলিতে কেহ নাই। কিন্তু আমি আর কি করিতে পারি? ইহাদের মুখের দিকে তো চাহিতে হইবে। রেণুর সঙ্গে প্রাণ খুলিয়াও সে চলে না। কোন আলোচনা করে না। ৩রা অক্টোবর,

ঠাকুর, জীবনে কোনও উপাধিই তো রাখিতে চাহি না। সন্ন্যাস গ্রহণের দিন তোমার কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আমাকে সাদা কাপড়ের উপাধি হইতে আবার গেরুয়ার উপাধির মধ্যে আনিতেছ কোন্ প্রয়োজনে? তোমার শ্রীগুরুদেবকে যেমন তুমি প্রার্থনা করিয়াছিলে, 'আমার যখন যেমন পোশাক পরিতে ইচ্ছা হইবে তেমন পোশাক পরিবার অনুমতি দিন', আমিও আজি তোমার কাছে সেই বর চাহিতেছি। কালকাঠির (বরিশাল) নিকটবর্তী আশপাশা গ্রামের পণ্ডিতমণ্ডলী আমাকে 'বঙ্গরত্ন' উপাধি দেন একটী কাগজে কবিতা লিখিয়া। তাহা বরিশালে কেয়াকালীন নলছিটির নদীতে ফেলিয়া দেই। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী মহাপ্রভুর মন্দিরে সমবেত হইয়া আমাকে 'ভক্তিসিন্ধু' উপাধি দেন। তাহাও গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়াছি। আমার সংসার-সন্ন্যাস, জীব মানুষ-দেবতা সব উপাধি তোমার ভিতর লীন হইয়া 'রসে' গড়িয়া উঠুক। আমার কোনও উপাধি না থাকুক। আমার সকল উপাধিতে ভূষিত হইবার যোগ্যতা লাভ হউক তোমার কৃপায়। তোমার জয় হউক। অমরেশ খাওয়া দাওয়া করিয়া ১০॥টায় চলিয়া যায়। তাহার একটা ঘড়ি মেরামতের জন্য নিত্যব্রতকে দিয়া যায়। রেণু ১০॥টায় বাহির হইয়া ৪টার পর ফেরে। ২০ জায়গায় যায়। গতকাল সন্ধ্যার পর দেবানন্দ আসিয়াছিল। নীলরতনবাবু দার্জিলিং হইতে ফিরিয়াছেন। আজ আসিবার কথা ছিল, আসেন নাই। সন্ধ্যার পর যুগান্তরের রাজেনবাবু আসেন ও প্রবন্ধ দিয়া যান। তাহার সঙ্গে দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হইল, তাঁহাকে অসযোগ করানো হয়। ৪ঠা অক্টোবর

ঠাকুর, পথ ভুলিয়া রাধাকুণ্ড হইতে বর্ষাণ গিয়াছিলাম। সূর্যকুণ্ডে সন্ধ্যার পূর্বে রাধারাণীর সূর্যপূজার সময় উপস্থিত থাকিবার জন্য সেদিন রাধাকুণ্ড হইতে গিয়াছিলাম এবং সেইখান হইতে রাধাকুণ্ডে ফিরিবার পথে পথ ভুলিয়া সন্ধ্যার পরও রাধাকুণ্ডে পৌঁছিতেছি না দেখিয়া মনে হইল পথ ভুল করিয়াছি। মাঠে কৃষকদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সেই গ্রামটীর নাম বোধহয় 'খড় মল্ল'। কৃষকদের ভাষা ঠিক বুঝিতেছিলাম না। তাঁহারা

আমাকে একটি বাঙালী বাবাজীর নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। রাত্রিতে সেখানে ইষ্টগোষ্ঠী করিলাম। সেখান থেকে বর্ষাণ ৭ মাইল মাত্র। রাধাকুণ্ড হইতে ১৪ মাইল। বর্ষাণ যাওয়াই স্থির করিলাম। রাধাকুণ্ডে আমার কম্বোয়া-কম্বল পড়িয়া রহিল। ৮টায় বর্ষাণ পৌঁছিলাম। বাবাজীরা এক মাতাজীর কথা বলিলেন, তিনি রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরের আত্মীয়া। সেখানে ৩।৪ দিন ছিলাম। শ্রীজীর মন্দিরে সন্ধ্যায় যাই। টিলার উপরে সিঁড়ি বহিয়া উঠিতে হয়। উঠিবার সময় দেখি বনী মাড়োয়ারীগণ গলায় রাধা-গোবিন্দের মালা নিয়া নামিতেছে। আমারও একটী মালা পাইবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু আমি যে নিঃস্ব। কেন আমাকে দিবে? বিশেষতঃ সেখানকার পূজারী 'আমার কাছে কিছু নাই' বলায় পর কটমট করিয়া চাহিয়াছিলেন। আমার ভয় হইল। ইহা যেন অটিলার চোখ। যাহা হউক, আরতি হইতেছিল। পিছনে আমি বসিয়াছিলাম। আরতির শেষে (বোধহয়) সেই পূজারীই ভিড় ঠেলিয়া আমার কাছে আসিয়া আমার গলায় একটী ফুলের মালা পরাইয়া দিল আমি নামিবার পথে খুব নাচিলাম গলায় মালা পরিয়া। যে কয়দিন বর্ষাণ ছিলাম ঐ মালা সর্বদা আমার গলায় ছিল। বৃন্দাবনে আসিয়া যমুনার জলে দেই। তুমি সঙ্গে সঙ্গে আছ। রেণু ঠিক দেখিয়া ১২৷৷টার পর বাহির হইয়া সন্ধ্যার আগে। ১০৷৷টার পর কালীচরণ সিংহ আসেন। ১২টার পর যান। ঠাকুরের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। মহাপ্রভুর উক্তি, 'ভাবগ্রাহী জনার্দন' আমি আছিনু কাশীপুরে' গাঠ করিয়া শুনাই। আমারও তো ঐ দশা ঠাকুরের 'দর্শন'রূপ বোঝা লইয়া কেমনে চলিব? অন্ত যদি মূল্য পাইয়া বেচিয়া দিব—ইহাই ছিল মনের আশা। গ্রাহক পাইলাম না। এই বেদনায় আমি কাতর। এত মানুষকে বুকে পুরিবার জন্ত টানাটানি করিলাম। কেহ আসিল না। আমার বুকে আসিলে, আমারই হইলে আমার জীবন ও ঠাকুরের খোঁজ মিলিত। সন্ধ্যায় নীলরতনবাবু আসেন। ঠাকুরের দর্শন ও প্রচারের কথা হয়। ঠাকুর যে অদ্বিতীয়, তাহা বুঝাইতে পারিলাম না। ক্ষিতীশ পাইনদা আশুবাবুর কাছে চিঠি দিয়াছেন সন্ন্যাসীদের ...বদলানো ব্যাপারে। বাসুদেব যদুবংশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ধ্বংসও করিয়াছিলেন। মিতা-গোপালও করিবেন। এই আক্ষেপের

ঠাকুর, আমার সাধক-জীবনের প্রথম যাত্রারম্ভ হয় 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ হইতে। তখন আমি উৎকট কামিনী-কাঞ্চন বিদ্বেষী ছিলাম। মা ছাড়া আর কাহারও মুখের দিকে চাহিতাম না। রাস্তায় মেয়ে দেখিলে চক্ষু বুঁদিয়া থাকিতাম। ইহার বদল হইল ঢাকার চরপাড়ানিবাসী জজ-কোর্টের ট্রান্সলেটার কালীপ্রসন্ন ঘোষ দাদা মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিয়া। তিনি বলিতেন, 'আমি প্রমাণ করিব, কামিনী ব্রহ্ম, কাঞ্চন ব্রহ্ম'। ঢাকায় দীর্ঘদিন তাঁহার সঙ্গ করিয়াছি। তাঁহার স্ত্রী স্বর্ণময়ী আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কত স্নেহ পাইয়াছি তাঁহারই সখী দুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস প্রভৃতি দাদাদের কাছ হইতে। মনের এই অবস্থায় বিবাহ করিতে পারি। ইহারই মধ্যে, ঠাকুর, তোমার শ্রীচরণ-আশ্রয় পাই। তখন আমি ঔষধবাণী ছিলাম, তাহাও কালীপ্রসন্নবাবুর

সম্পর্কের ফলে। একদিন নবদ্বীপে মনে পড়ে ঠাকুর, তোমার সঙ্গে আলোচনা হয় অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, নির্গুণ লইয়া। যুক্তিদ্বারা তোমার সঙ্গে তর্ক করিতেছিলাম। তুমি বলিলে, 'স্বয়ং, ইহার পর যাহা তাহা উপলব্ধির বিষয়'। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'আমার এই উপলব্ধি হইবে তো'? তুমি বলিলে, হাঁ। হইবে'। তুমি মাঠাকরুণের কাছে বলিয়াছিলে, 'নরেনের তর্ক যেন কামনের গোলা'। কুতর্ক যেন জীবনে না করি। সত্য নির্ধারণের জন্য যুক্তিপূর্ণ আলোচনা যেন করিতে পারি। তোমার জীবন লাভ করিয়া তোমারই হইব। রেণু ১১টায় ট্রেন হইয়া বিজাপুরের জন্য যায়। বেরে ৭টার পর। উষাঙ্গিনী কাল মধুর বাসায় গিয়াছে। হেমাঙ্গবাবুর ১০০ টাকার চেক আসে। বিজ্ঞাপনদাতাদের বাড়ী বাড়ী যাওয়ার যাতনা হইতে মুক্ত হইয়া গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ। পত্রিকা গ্রাহকদের জন্য। বিজ্ঞাপনের জন্য যাওয়ার অর্থ ক্যাপিটালিষ্টদের হাতে প্রতিভা বিক্রয় করা। প্রথম 'উদ্বোধন' তো ১ বৎসর বিজ্ঞাপন ছাড়াই বাহির হইয়াছে। আমাদের কথা যাহাতে সুন্দরভাবে, নানা রকম করিয়া মানুষের কাছে উপস্থিত করা যায় সেদিকে লক্ষ্য করা উচিত। কি দীনতাই না বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য স্বীকার করিতে হয়। ২ হাজার গ্রাহক হইলেই চলে। আমাদের মতও প্রচার হয়। জনসাধারণই তো পত্রিকারের মালিক। বিজ্ঞাপন লইয়া পত্রিকা চালানো যে পত্রিকার পক্ষে সম্মানজনক নয়, একথা পত্রিকাওয়ালারা ভুলিয়া গিয়াছে। আমার তো ভুলিলে চলে না। ৬ই অক্টোবর

ঠাকুর, দীক্ষা হবার পূর্বেও তুমি সঙ্গে সঙ্গে ছিলে। দেখা হওয়ার পূর্বেও তুমি আমার ছিলে, আমি তোমার ছিলাম। পরমহংসদেবের কাছ হইতে কালীপ্রসন্নবাবুর মধ্য দিয়া তোমার সঙ্গে যুক্ত হইয়া ছিলাম। 'সর্বই ব্রহ্ম' ইহার কতকটা আভাস কালীপ্রসন্নবাবুর স্পর্শে আসে। ১৩১০ সনের অগ্রহায়ণ মাসে (ডিসেম্বর ১৮৯) বিবাহ হয়। বিবাহ করিবার জন্য যখন কাঁকুরগাছি হইতে শ্রীনগর যাত্রা করি তখন বাহিরে বাদ্য বাজনা হইতেছিল, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতিগণ, বরযাত্রিকগণ সমবেত হইয়াছেন, তখন চতুর্দিকের দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে 'হাউ হাউ' করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সর্বত্র একটা ব্রহ্মভাবের স্ফুরণ হইল। এক জ্যোতিষী বলিলেন, এই আনন্দের মধ্যে কান্না কেন? আনন্দময়ীর স্ফুরণ এইরূপ মাঝে মাঝে তখন হইত। ঘুমের মধ্যে 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিতাম। বিবাহের রাত্রিতে বিছানায় উষাঙ্গিনী আসিলে বলিয়াছিলাম, 'আমার আশীর্বাদে তোমাদের এই মিলন হইল, উঁহার নাম স্মরণ করিয়া শোও'। সারাজীবন তাহাকে লইয়া ও কাছে বসাইয়া ঠাকুরের নাম লইয়াছি। ঠাকুরের কথায় পরিপূর্ণ কত চিঠি লিখিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল যোগমায়ার। তাই সন্ন্যাসেও ছাড়িতে পারে নাই। ইহা তো কোনদিন আমার ত্যাগ বৈরাগ্যের সঙ্গে দেশসেবার পথে বাধাস্বরূপ হয় নাই। তোমার ইচ্ছায় ইহা সম্ভব হইয়াছে। রেণু ৫০টায় বাহির হইয়া ৩৪টায় আসিয়া খাইয়া আবার বাহির হয়, বেরে ৬টার পর।

ক্রমশঃ

সৃষ্টির ক্রমবিকাশ

ডঃ গুরুদাস কুমার

বিশ্বের উৎপত্তি ও জৈব বিবর্তনের প্রবাহমান ধারার বিষয় আলোচনা করিলে জানা যায় যে আদিতে পৃথিবীতে যাহা ছিল সবই জড় পদার্থ। আদি জড়কণার (Molecules) আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলে পৃথিবী প্রথমে উত্তপ্ত (অগ্নিঃ) বায়বীয় ও পরে শীতল বা তরল (অপঃ) পদার্থে পরিণত হইলে জড় কণাগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়া ক্ষিতি বা পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। পৃথিবী আরও শীতল হইলে জীবের মূল উপাদানগুলি অর্থাৎ প্রোটিন (Protein) পদার্থের আদি আণবিক কণাগুলি সাগর ভূমি ইত্যাদির নৈসর্গিক ঘনীভূত আমিনো অ্যাসিড রসায়নিক prebiotic পদার্থে পরিণত হয়।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে প্রোটিন পদার্থের মূল উপাদান, যেমন Amino acid, Enzyme প্রভৃতি, পদার্থের পরিবর্তন ও বিবর্তনের ফলে জীবদেহের জন্ম ও উৎপত্তির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। অধুনা বিংশ শতাব্দীর এক অভিনব জৈব গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে (১৯৪৭) দেখা গিয়াছে যে, কি উদ্ভিদ কি প্রাণী সকল জীবের জীবকোষে ক্রোমোসোম (chromosome) D. N. A. Deoxyribonucleic acid নামক এক প্রোটিন পদার্থও (Nuclecc acid) নিউক্লীক অ্যাসিড কণার দ্বারা গঠিত। A-amino-acid পদার্থ যুক্ত প্রোটিন কতকগুলি দীর্ঘ কণা বিশিষ্ট polypeptide শৃঙ্খলা দ্বারা আবদ্ধ হইয়া D.-N. A. তে রূপান্তরিত হইয়াছে। এইরূপ প্রতি মূহুর্তে জীব জগতের বংশগত ধারার প্রধান উপকরণ কতকগুলি অসংখ্য ও অতিসূক্ষ্ম অবিভাজ্য বস্তু কণার দ্বারা গঠিত। জৈব বিজ্ঞানীগণ ইহাকে 'জীন' (Gene) নামে অভিহিত করিয়াছেন। বিভিন্ন জেনেটিক বা জনন পদার্থের মধ্যে এই জীনই আদি বস্তু। প্রত্যেক জীবকোষের নিউক্লিয়াসের অপরিহার্য উপাদান 'ক্রোমোসোমে' নির্দিষ্ট স্থানে পরস্পর মৈত্র ভাবে জোট বাঁধিয়া থাকিয়া জীবের বংশগত দৈহিক আকৃতি প্রকৃতি ও গঠনের বাহকরূপে কাজ করিয়া থাকে।

ডারউইন (১৯৫৯) প্রভৃতি জৈব বিজ্ঞানীর মতে মূল চারিটি নিয়মে যথা—প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection), বৈষম্য ও পরিবর্তনশীল প্রবৃত্তি (Mutation) পৃথক হইবার প্রকরণ (Variation) জীবন সংগ্রাম (struggle for existence) প্রভৃতি মূল কারণে জীবকণার সংগঠন, সংখ্যা ও পর্যায়ের বিবর্তন ঘটায়। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপযোগী হইয়া জীবের বংশ পরম্পরায় জীবন যাত্রার ধারার সংরক্ষণ ও সহায়ক হইয়া থাকে।

আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ও প্রযুক্তি বিদ্যার ফলে অতীত কালের বহু লুপ্ত প্রাণীর ও প্রাক্ মানবের (Pre-Hominid) অস্তিত্বের সাক্ষ্য ও উহাদের বিচিত্র জীবন যাত্রার ধারার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাদের প্রস্তরীভূত জীবাশ্মে ও জৈব দেহাবশেষে (Fossil remains)। পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তরে নিহিত জীবাশ্মের আবিষ্কারের

ফলে ও রাসায়নিক পদ্ধতিতে উহাদের সময়কালও নির্ভুলভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। সকল জীবের বিকাশ ও প্রাণীর উদ্ভব ও অভিব্যক্তি প্রকৃতির নৈসর্গিক ও ভৌগোলিক পরিস্থিতির সহিত বিশেষভাবে জড়িত। ভূতাত্ত্বিক ও জীবাশ্ম বিজ্ঞানের মতে পৃথিবীর মূল চারিটি ভৌগোলিক বিপ্লব বা অধিকল্প ঘটিয়া গিয়াছে। আদি বা প্রথম কল্পে (Azoic 4 - 5 billion years) প্রাণসত্ত জীবের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। পরবর্তী কল্পে অর্থাৎ পুরাজীবিয় যুগে (palcozoic) ৩ 3600 – 280 Million yrs প্রথমার্দ্ধে এক কোষ ও বহুকোষ বিশিষ্ট অমেরুদণ্ডী প্রাণী ও বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক জীব মৎস ও উভচর প্রাণীর উদ্ভব হয়। পরবর্তী যুগে (Mesozoic) 225 – 136 Million yrs অর্থাৎ মধ্য জীবিয় কল্পে প্রধানতঃ সরীসৃপ প্রাণী ও অতিকায় বৃহৎ সরীসৃপ জীব ও পরে আদি স্তন্যপায়ী জন্তুর আবির্ভাব হয়। প্রায় সাতকোটি বৎসর পূর্বের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কল্প নবজীবিয় (Cenozoic) আরম্ভ হয়। এই যুগে বিভিন্ন প্রকার স্তন্যপায়ী জন্তু ও 'প্রাইমেট' (Primate) অন্তর্ভুক্ত প্যারাপিথেকাস (Parapithecus), প্রো প্লাযোপিথেকাস্ বানর ও মানুষের পূর্ব পুরুষ, মনুষ্য সদৃশ প্রাক্‌মানব প্রাগৈতিহাসিক মানবের আবির্ভাব হয়। এইরূপে ক্রমবিবর্তনের ধারায় প্রাইমেট শাখার নর ও বানরের মধ্যবর্তী বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া উন্নয়ন পদক্ষেপে চূড়ান্ত রূপান্তরিত হয় বর্তমান বিজ্ঞ বা বুদ্ধিমান মানবে।

বিশ্বের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কাহিনী প্রাচীন ভারতের পুরাণ শাস্ত্রেও প্রচলিত ছিল। আর্যঋষিগণ তাঁহাদের শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে বিবর্তনের ক্রমবিকাশ ধারায় যুগের কাল ২০ লক্ষ বৎসর; জলচর, কূর্ম সরীসৃপের যুগ ৯ লক্ষ বৎসর; পক্ষীর আবির্ভাব কাল ১০ লক্ষ বৎসর ও তৎপরে বানর ও মানুষের কাল ৪ লক্ষ বৎসর। পুরাণ আদি শাস্ত্রে মানুষের পূর্ব পূর্ব অবতারেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—মৎস্য যুগে মৎস রূপধারী অবতার হইয়া, কূর্মযুগে কূর্ম, বরাহযুগে বরাহ অবতার প্রভৃতি জলচর ও স্থলচর জীবরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে ভগবানের আবির্ভাব হয়। তৎপরে পশু, অর্দ্ধেক পশু অর্দ্ধেক মানবরূপী নৃসিংহ অবতার ও ক্ষুদ্রকায় বামন অবতার ইত্যাদি বিভিন্ন যুগে সৃষ্ট জীবের দেহ ধারণ করিয়া লীলা করিয়াছিলেন। বামন হইতে দীর্ঘ বলিষ্ঠকায় মননশীল বিজ্ঞ মানব– পরশুরাম, রাম, বলরাম প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। এইরূপে পুরাণাদির ক্রমবিকাশবাদ আধুনিক বিজ্ঞান মত পূর্ণ সমর্থন করে।

সর্ব্বগ্রাসী মহাকাল চলিতেছে দ্রুত। আপন বৈভবে ভাস্বরের পথে গড়িয়া উঠিতেছে প্রগতিশীল মানবের অপ্রতিহত শক্তি— বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও আবিষ্কার। নিত্য নূতন সৃষ্টি, যে সৃষ্টি ধ্বংসের রূপান্তর মাত্র। যে সৃষ্টির মধ্যে নিহিত আছে জৈব বিবর্তনের ধারা। সৃষ্টির মূল উৎস হইতে ইহারা বহিয়া আসিতেছে অবিরাম গতিতে। এই ধারায় জীবের অতি ক্ষুদ্র কোষ হইতে রূপান্তরিত হইতেছে এককোষ বিশিষ্ট কীট পতঙ্গ, বহুকোষযুক্ত জলচর, উভচর, সরীসৃপ পক্ষী স্তন্যপায়ী জীব ও সর্বকোষে নর ও বানরের জেনেটীক বা প্রজনন পদার্থের বিস্তারে বর্তমান শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের আবির্ভাব।

সামগ্রিক ভাবে প্রত্যেক প্রজাতির জৈববারা অবিরাম গতিতে ছুটিতেছে। জীবকোষের রাসায়নিক প্রক্রিয়া নিয়তই প্রাকৃতিক পরিবেশে রূপান্তরিত হইতেছে। জীবের আমৃত্যু বিপুল ও সুদূর প্রসারী পরিবর্তনশীল ক্রম-বিকাশ অবশ্যম্ভাবী পরিব্যক্তি।

কলিকাতা
২২.৬.১৯৪৫

নারায়ণেষু,

স্নেহের রেণু, তোমার পত্র কাল সকালে পাইয়াছি। ...আমি আজ পর্যন্ত কোন লেখাপড়াই আরম্ভ করিতে পারি নাই। গরমের জন্যও কতখানি, স্বাভাবিক ক্লান্তির জন্যও। শুইয়া শুইয়া অনেক সময় ঠাকুরের দেওয়া নাম লই। ...সবকিছুর অর্থ খুঁজিতে গেলে মাথা গরম হইয়া উঠে। তোমার সারা জীবনব্যাপী রোগে ভোগার কারণই কি আজ পর্যন্ত পাইয়াছ! ...পাপবাদের অর্থই যখন পুরুষোত্তম-দর্শনে অন্য রূপ হইয়া গিয়াছে, তখন সকলের সব সিদ্ধান্তই অন্যরূপ হইবে। পুরুষোত্তম-দর্শন 'উর্দ্ধমূলে'র খবর পৌঁছাইয়াছে। পুরুষোত্তম-দর্শনের কর্ম জ্ঞান ভক্তি সব উর্দ্ধমূল। ঋষিদের দৃষ্টি অধোমূল; তাই তাঁহারা বলেন, 'পাপোঽহম্ পাপকর্মাহম্ পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ'। বেদান্ত শুনাইয়াছেন, 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'সোঽহম্', 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি। সমাজের যুগ যুগ ব্যাপি চিন্তাধারাকে আজ চালিয়া সাজাইতে হইবে। অধোমূল ও উর্দ্ধমূল এমন বিচূরী পাকাইয়া গিয়াছে যে, ইহার তুলনামূলক দৃষ্টি চোখে আঙুল দিয়া ধরাইয়া দিতে না পারিলে কিছুতেই মানুষকে সচেতন করানো যাইবে না। তোমার সেই অনসূয়াদেবী গত রবিবার প্রতিভার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তাহাকে কিছু বোঝানো সহজ নয়। সকলের অবস্থাই প্রায় তদ্রূপ। যে যাহা কিছু বুঝিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে তাহা হইতে অন্য কিছুই বুঝিতে রাজী নয়। অথচ সে আমি আবার আসিবে। হাওয়ার মধ্য হইতে কতখানি বিপ্লব সব মানুষই পাইয়াছে, কিন্তু ঋষিপ্রচারিত অধোমূল পাপবাদ, কর্মবাদের সঙ্গে উহা এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে বিশুদ্ধ বিপ্লবের দেবতা আজ আর ঠাঁই পাইতেছেন না। এই জন্যই তো চাহিয়া ছিলাম একদল সূক্ষ্মবিশ্লেষণ চতুর অথচ synthesis-এ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ মানুষ যাহারা বজ্রমুষ্টিতে পরগাছা উপরাইয়া ফেলিয়া বিশুদ্ধ পুরুষোত্তম-দর্শনকে স্থাপিত করিবার উন্মাদনা ও সাহস রাখে....

কাল — আসিয়া বলিল, 'আসিতে আসিতে ভাবিতেছিলাম সারা জীবনই পিছনে পিছনে ছুটিলাম...'। ইহার ভিতরে একটা ব্যর্থতার সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে-কথা সে-ও স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। আমি বলিলাম, "ছুটিতে হইবে—ইহাই তো জীবনের কথা। তবে যাহার পিছনে ছুটিলে ছোটার বিরতি আসে, সেখানেই ছোটার ব্যর্থতা। পুরুষোত্তমানন্দ হয়তঃ অনন্ত ছোটার পথ খুলিয়া দিতে চায়, এইখানে হয়তঃ চরম সার্থকতা মিলিবে। আর ছোটাই যদি সত্য হয় তবে চরম সার্থকতাও কিছু থাকে না। যাহা চরম সার্থকতা তাহা নিশ্চয়ই ছোটা নয়, ছোটার বিরাম। নিত্য নূতন আবেষ্টন যখন আছে অতীতের পুঞ্জীভূত সংস্কার জমিয়া যখন প্রকাণ্ড দুর্ভেদ্য প্রাচীরের সৃষ্টি করিয়াছে, তখন চরম সার্থকতা লাভ হইবে কি করিয়া? ব্যক্তিগত জীবনের চলা ও আবেষ্টনের প্রভাব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট

দৃষ্টি যদি অব্যাহত থাকে, তবেই বলিব সার্থকতা মিলিয়াছে। আমি কোথায় সার্থক হইয়াছি? ...তবুও আমার ছোটার বিরতি হইয়াছে বলিব না কেননা সব আবেষ্টনকে বদলাইবার সময় হয়ত: বা শক্তিও আমার নাই। আবেষ্টনের কাছে মাথা নোয়াইয়াছি বটে, কিন্তু দৃষ্টি আমার বিলুপ্ত হয় নাই আমি আবেষ্টনের সঙ্গে identified হই নাই, অন্ধ হইয়া তাহাকে সুব্যাখ্যা দিতে চাহি নাই। আবেষ্টনের সঙ্গে কতখানি না চলিলেও আবেষ্টন ছাড়াছাড়া হইয়া যায়, পক্ষান্তরে আবেষ্টনের সঙ্গে identified হইলেও সে পাইয়া বসে। আবেষ্টনকে control করিতে হইলে আবেষ্টনের সঙ্গে কতখানি চলিতেও হইবে, দিব্য দর্শনদ্বারা তাহার ঊর্দ্ধেও থাকিতে হইবে। আবেষ্টনের প্রভাব আমি জানি। —যে চলন করার পক্ষে তোমার অসুবিধা রহিয়াছে অথচ তাহাকে বাদ দিয়াও চলা সঙ্গত বা সম্ভবপর নয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে দৃষ্টি খুব স্পষ্ট রাখিয়া, তাহার সঙ্গে identified না হইয়া ভবিষ্যতের পথ খোলা রাখিয়া, ব্যাপকতর আবেষ্টনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য সজ্ঞানে প্রচেষ্টার জন্য আকুলি বিকুলি দেখিলেই আমি তৃপ্ত। আবেষ্টন ষোল আনা হাতের মধ্যে আসিবে, এ আশা আমি করি না, সম্ভবপরও নয়। চাই পরিষ্কার দৃষ্টি ও চলার দুর্গম লালসা। হওয়ার তো একটা absolute রূপ নাই। অনন্ত হওয়ার রাস্তা নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হওয়ার অর্থ কি? চাই অনন্ত পথ চলিবার সাহস এবং সেজন্য চাই নিজ জীবন ও প্রতি নিঃশ্বাস নূতন আবেষ্টনের সম্বন্ধে সত্য বাস্তব পরীক্ষার দিব্য দর্শন।" তবে পাওয়া ও হওয়া যে অনন্ত। স্থির পাওয়া কিছু আছে কি? চাই শুধু দিব্যদর্শন, পথের দিব্য খোঁজ। আমি ইহা দেখিলেই তৃপ্ত হইব। তখন অনন্ত পথে অনন্ত কাল চলিলেও আর ভুল হইবে না, ভুল হইলেও আটকাইবে না।...।

পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

'যে জীবন পবিত্র নয় তাহা কখনও শান্তিময় নয়। জীবনকে সৎ চিন্তা, সৎ কার্য ও সৎ সঙ্কল্পদ্বারা পবিত্র করিতে চেষ্টা কর, ধন্য হইবে। ...যাহারা সেবা করিয়া নিজের সুখ কামনা করে তাহারা কি কখনও সুখলাভে সমর্থ হয়? যাহারা নিজের সুখের জন্য অপরের সেবা করে, তাহারা কি বেশী দিন সেবা করিতে পারে? সেবা করিতে গেলেই অনেকখানি নিজের স্বার্থ ও সুখ বিসর্জন দিতে হয়। সেবাব্রত অবলম্বন করিলে অনেক যাতনা গঞ্জনা হিংসার সঙ্গ করিতে হয়। তুমি কি আশা কর যে ভালবাসিয়া সব সময় প্রতিদান পাইবে? 'ভালবাসিবে বলিয়া ভালবাসিবে'—ইহাই ভালবাসার কথা। ভালবাসা তো দোকানদারী নহে যে সেবার বদলে কিছু পাইতে হইবে। যিনি শ্রীমিত্যগোপালকে পাইতে কামনা করেন তাহাকে অপরের নিন্দা গঞ্জনা সহ্য করিয়া কোন কামনা না রাখিয়া যথাসাধ্য সেবা করিয়া যাইতে হইবে।'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

"'শিমুল কাঠই হোক আর বকুল কাঠই হোক যখন জ্বলে তখন আগুনের চেহারাটা একই'— এ কথাটা মোটামুটি বাহিরের দিক হইতে সত্য হইলেও তলাইয়া দেখিলে সত্য নয়। দুই আগুনে রূপগত গুণগত পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। কয়লার আগুন ও কাঠের আগুনের রূপ ও গুণ কি এক? কোনও আগুন নীলাভ, কোনও আগুনের রং খুব লাল; এইরূপ নানা রকমের রূপবিশিষ্ট, গুণ-বিশিষ্ট আগুন রহিয়াছে। কুলকাঠের আগুনের গুণ, ঘুঁটের আগুনের গুণ ও কয়লার আগুনের গুণ সম্পূর্ণ পৃথক। সব আগুনের রূপ ও গুণ এক হইলে বুদ্ধির পক্ষে সুবিধা হইত, শীঘ্র শীঘ্র প্রকৃতির ক্ষেত্রেই একটা একত্বের আবিষ্কার করা সহজ হইত। কিন্তু এইরূপ সহজ হওয়া তো প্রকৃতির মধ্যে নাই। প্রতি ঘটনা নূতন, প্রতি ঘটনার মীমাংসাও নূতন। কোনও পুরাতন ঘটনার পুরাতন মীমাংসা দ্বারা কোনও নূতন ঘটনার মীমাংসা হয় না। মোটামুটি সাদৃশ্য থাকিলেও প্রত্যেকটির প্রকৃতি ভিন্ন, মীমাংসাও ভিন্ন। বুদ্ধি সব ঘটনাকে এক মানিয়া এক মীমাংসা দ্বারাই সকলের মীমাংসার প্রচেষ্টা করিয়াছে। বুদ্ধির মীমাংসা হইতেই মায়াবাদের উদ্ভব। প্রত্যেক ঘটনার বিচার ও মীমাংসা পৃথক, ইহা যোগমায়া-বাদের সিদ্ধান্ত। কাজেই মায়াবাদের 'এক' ও যোগমায়াবাদের 'এক' এক বস্তু নয়।

— শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে।

"On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious man will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man namely the exploitation of man by man.

Occasional Speeches—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে —

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত	পাণ্ডুলিপি
ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)	১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	২। দশ বৎসরের দিনপঞ্জী, পত্রাবলী, ভাষণ ইত্যাদি।
২য় খণ্ড (৩য় অধ্যায় পর্যন্ত)	
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	
ঈশোপনিষৎ	
কেনোপনিষৎ	
কঠোপনিষৎ	
প্রশ্নোপনিষৎ	
ঐতরেয়োপনিষৎ	
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ২·৫৭	
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ·৫০	
মুণ্ডকোপনিষৎ	
৯। শ্রীনিতাগোপাল—জীবনী ও চর্চা ৫·০০	
১০। স্বরাজের পূর্ণরূপ ·৫০	
১১। গীতাজয়ন্তী ·০৬	
১২। উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা) ·৫০	
১৩। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা ৩·০০ (গান্ধী স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)	
১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১২·০০	

23 AUG 1976

৺প্রতিভা রায়ের	
নারী—প্রগতির জন্মকথা	১·২৫
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য নিতাগোপাল ও শিষ্যা সুধার কথা	·৩১
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৫·০০

শ্রীমতী রেণু মিত্রের	
১। সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিতাগোপাল	
২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	
৩। শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন ওরিয়েন্ট বুক কোং প্রকাশিত	
৪। রবীন্দ্র-হৃদয়	
৫। প্রাথমিক শিক্ষা	

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি, পো: অশ্বিনীনগর, (ভায়া-দেশবন্ধুনগর, কলিকাতা-৫৯) ২৪ পরগণা।

শ্রীবিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পো: অশ্বিনীনগর, কলিকাতা-৫৯ হইতে প্রকাশিত, প্রিন্টিং সেন্টার, (C/o. জে, বি, লাইব্রেরী) হাতিয়াড়া, হইতে মুদ্রিত।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

No-5

পূজার দিনের ধ্যান

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ—

অধিবাস : মা, আমার আমি, আমার মনবুদ্ধি, আমার দেহমন-প্রাণ, আমার জীবনে ব্যবহার-যোগ্য সকল বস্তুকে অধিকার করিয়া তোমার বাসস্থান রচিত হউক।

সপ্তমী পূজা : অতীতের সু ও কু সংস্কার যেন নূতন সৃষ্টির পথে বাধা না হয়; প্রতিটি আবেষ্টনে 'at home' অনুভব করিতে হইবে, কোন আবেষ্টনেই পরাজিত হওয়ার অধিকার সপ্তমী-পূজার সাধকের নাই।

অষ্টমী পূজা : বিশ্বের সব কিছুকে অনন্তভাবে পাওয়া, প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাণ খুলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার সঙ্গে একাত্ম হইয়া নব্য রচনা অষ্টমী দিনের সাধনা।

নবমী পূজা : কামনেত্রে বিশ্ব-প্রকৃতির দিকে চাহিলে কিছুতেই সে কামুকের কাছে মাথা নত করিবে না। মাটি জল অগ্নি বায়ু সারা প্রকৃতি, শ্রমিক নারী অন্নবস্ত্র কিছুকেই ভোগ করা চলিবে না। ভজনার ভিতর দিয়া আপন করার সাধনা নবমী পূজায়।

বিজয়া : বিপ্লব, শৃঙ্খলা ও পরস্পর-ভাবনার মধ্য দিয়াই বিজয় লাভ হয়।

ভালো কাগজ ! বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা !! মজবুত বাঁধাই !!!

সচিত্র সপ্তকাণ্ড কৃত্তিবাস রামায়ণ

শ্রী অনিল কুমার বিদ্যাভূষণ

সম্পাদিত

সুদৃশ্য চিত্রাবলী

রাজ সংস্করণ—২৪ টাকা

সুলভ সংস্করণ—২২ টাকা

সাধারণ সংস্করণ—১৮ টাকা

—: প্রাপ্তিস্থান :—

সাক্‌সেস্‌ পাবলিশিং হাউস

১ নং বিধান সরণী, কলিকাতা-১২

উজ্জ্বলভারত

সূচীপত্র

শারদীয়া : ১৩৮৩

	শ্রীশ্রীদুর্গা -	শ্রীনিতাগোপাল	৮০
	শক্তির মাতৃরূপ	শ্রীদেশু মিত্র	৮২
	শক্তি-তত্ত্বের উৎস	ড: গুরুদাস কুমার ও শ্রীকমলা কুমার	৮৫
	জাতীয় চেতনার বিকাশে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব	শ্রী নিখিল রঞ্জন রায়	৮৮
৫।	গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র	শ্রী সন্তোষ কুমার অধিকারী	৯৫
৬।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী		৯৮
৭।	হে সুন্দর স্বয়ংপ্রকাশ (কবিতা)	শ্রী শান্তশীল দাশ	১০৮
৮।	আমেরিকায় শ্রীকৃষ্ণ-অর্চনা	শ্রী সন্তোষ কুমার দে	১০৯
৯।	কলা-বৌ স্নান	শ্রী হৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ	১১৩
১০।	যাঁকে দেখিনি	শ্রী বিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৫
১১।	সাময়িকী : সঙ্ঘের বার্ষিক বিবরণ		১১৭
১২।	বিদায়কা কর্মসূচী ও ২৪ পরগণা	শ্রী অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায় জেলা শাসক, ২৪ পরগণা	১২০

আকাশে শরৎ।
মানুষের মন এখন মেঘের সঙ্গী।
ছুটিতে চায় দূর দিগন্তে
সেদিকে নদী, সমুদ্র, পর্বত,
সেদিকে সৌন্দর্য এবং সুষমা।
আমরা জানি।
এবং আমরা প্রস্তুতও।
মানুষের আসা-যাওয়ার পথের ধারে
আমরা বাড়িয়ে আছি হাত

সাহায্যের, সৌজন্যের, সহযোগিতার।
বিনিময়ে প্রত্যাশা শুধু একটাই।
তার নাম শৃঙ্খলা।
জীবনের চলা-হাঁটার পথে
শৃঙ্খলাও এক সৌন্দর্য।

পূর্ব রেলওয়ে

উজ্জ্বলভারত

ঊনত্রিংশ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

॥ শ্রীনিত্যগোপাল ॥

শ্রীদুর্গাশঙ্কর দেবে করি দরশন,
(তাই) প্রেমানন্দ-সিন্ধুনীরে মন নিমগন !

সুন্দর শঙ্কর দেব শ্রীদুর্গা সুন্দরী,
শঙ্করে শঙ্করী শোভে ভাবের বিভরী,
শ্রীশঙ্কর চিদাকাশ, তাঁর অনন্ত বিকাশ,
সেই চিদাকাশে শোভে শুদ্ধ নিত্য জ্ঞান,
সেই চিদাকাশে তাহা উজ্জ্বল তপন।
মনসরোবরে শোভে ভক্তি-সরোজিনী,
সে তপন তরে তাহা প্রেমে পাগলিনী,
সে তপন মনোহর, তাহা দিবা চিদাকার
তাহা চৈতন্য কারণ, মুক্তির কারণ,
অজ্ঞান-আঁধার তাহে হয় নিবারণ।
তাহার জ্যোতিতে হেরি দিবা সহস্রারে,
তাহার জ্যোতিতে হেরি শ্রীগৌরী-শঙ্করে,
শঙ্কর সচ্চিদানন্দ, তাঁতে নিত্য জ্ঞানানন্দ,
(তিনি) নিত্যপ্রেমানন্দে পূর্ণ প্রিয়পরশন,
শ্রীগৌরীর সনে করি তাঁহারে বন্দন।

সিদ্ধিদাতা শ্রীগণেশে আমার প্রণাম,
(তিনি) অপরূপ নিত্যরূপ তিনি নিরুপম,
বন্দনা করি তাঁহারে, নিত্যানুসিদ্ধ নিকরে,
কার্ত্তিকের দেবে করি সতত স্মরণ,
বন্দনা করি তাঁহার অভয় চরণ।

মহাষষ্ঠী মহাদেবী পরমা যোগিনী,
কার্ত্তিকের শক্তি তিনি সন্তানদায়িনী,
পরাভক্তি সুকুমারী হউন কন্যা শ্রীগৌরী,
হউক কৃপাতে তাঁর জ্ঞানসুসন্তান,
সন্তানরূপে করুন বিদ্যাদান প্রদান।
প্রফুল্ল শ্বেত সরোজে হেরি শ্রীভারতী
বিনোদিনী বিদ্যাবতী সরস্বতী সতী,
মনোহর কোকনদে, হেরি তাঁহার শ্রীপদে,
তাঁহার শ্রীপদ মম দিবা (বা নিত্য) আলম্বন,
হউক হৃদয়ে তাহা নিয়ত স্ফুরণ।

হেরি রমা মনোরমা শ্রীবিষ্ণুভাবিনী
রক্ত-সরসিজোপরে সুধাংশু বদনী,
(তিনি) ইন্দিরা পরা প্রকৃতি, ইন্দুমুখী ইন্দুমতী,
নলিন-নয়ন তাঁর অমল আনন,
বিনোদ শ্রীপদে তাঁর বন্দি সর্ব্বক্ষণ।

শ্রীনন্দি হউন আজি আমার বন্দিত,
হউক শ্রীপদে তাঁর মন অবনত,
ভূঙ্গিরে বন্দনা করি, ভক্তিভাবে তাঁহে হেরি,
হউক কৃপাতে তাঁর সকল জীবন,
শ্রীনন্দি-শ্রীভৃঙ্গি পদে পাইনু শরণ।

———

"নিশ্চয়তাকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে স্থাপন করা তো পুরুষোত্তম-দর্শন নয়। প্রকৃতির ক্ষেত্র সদা পরিবর্ত্তনশীল; চির অনিশ্চয়। এই অনিশ্চয়কে যথাযথ ভাবে গৌরব দান করিয়া যিনি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন তিনিই বুদ্ধি-যোগের অধিকারী। সকল দুর্যোগকে দুর্যোগ রাখিয়া যিনি সুযোগে পরিণত করিতে পারেন, তিনিই যোগেশ্বর। প্রকৃতির ক্ষেত্র নিত্য অনিশ্চয়, পুরুষ চির নিশ্চয়। চাই নিশ্চয়-অনিশ্চয়ের সামঞ্জস্য অর্থাৎ প্রতি অনিশ্চয়ের মধ্যে চির-নিশ্চয়ের রং দেখা ও আস্বাদন করা।"

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শক্তির মাতৃরূপ

শ্রীবেণু মিত্র

মায়ের কথা মনে পড়ে। সন্তানকে সৃষ্টি করতে এবং রক্ষা করতে যে মাতৃত্বকে নিজেকে ক্ষয় করে দিতে হয়, সেই মাতৃত্বকে মনে পড়ে। কোন বিশেষ মা তার বিশেষ সন্তানকে যে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করেন সেই বিশেষ মানুষটির মধ্যেই কি শুধু মাতৃত্বকে আস্বাদন করি? না, মাতৃত্ব এত ছোট বস্তু নয়, তা হলে এ বিশ্ব কবে পুরনো হয়ে যেত। যেখানেই দেখি নিজেকে ক্ষইয়ে দিয়ে, বিসর্জন দিয়ে অপরকে রক্ষা করা—সেখানেই তো মাতৃত্বকে আস্বাদন করি। সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এই মাতৃত্ব। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেও সেই নিজেকে ক্ষইয়ে দিয়েই নিজেকে অব্যাহত করা। নিজেকে ক্ষয় করে করেই তিনি চিরদিন আছেন। ছোট আধারে যে মাতৃত্বকে পেয়েছিলাম, তাকে কি বিরাট প্রকৃতির মধ্যে পাই না? আকাশে বাতাসে আলোতে আঁধারে, সর্ব মানুষের সব সম্পর্কের মধ্যেও মাকে কমবেশী খুঁজে পাই, মাতৃত্বকে উপলব্ধি করি। আমার চারদিকে কত বিভীষিকা—তবু এরই মধ্য দিয়ে মাতৃস্নেহ ঝরে পড়ছে। নইলে বেঁচে থাকাই সম্ভব হতো না।" যতক্ষণ সৃষ্টি আছে ততক্ষণ বিভীষিকাও আছে, স্নেহধারাও আছে। সৃষ্টি জুড়ে এই ইতিহাস। আমার ক্ষুদ্র পরিধিটুকুর বাইরেও যে বিরাট শক্তির খেলা তাতেও এই মাতৃত্বকেই খুঁজে পাই। কত কোটি কোটি বৎসর ধরে সৃষ্টি শক্তি যে ধারায় ক্ষয়িত হয়ে হয়ে নিজেকে উন্মোচিত করে যাচ্ছে সেই ধারাকে কত কত প্রাচীন কালে ভারতের সাধক যে ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তা প্রস্থানত্রয়ের অবধূতভাষ্যকার শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ভাষায় অভিনব। শক্তি-তত্ত্বকে তিনি অপূর্ব জীবন্ত ভাষ্য দান করে গেছেন।

যে শক্তি সৃষ্টি করে তাকে মা বলি—বিশ্ব জুড়ে সেই শক্তিকে মা বলে অভয় পাই। মাটিতে আকাশে পাতালে প্রতি মুহূর্তে এই সৃষ্টি চলেছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যে-আমি ধূলিকণার সমান তাকেও প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি করে চলতে হয়, নিত্য নূতন আবেষ্টনের সম্মুখীন হয়ে তাকে গড়ে তুলে নিতে হয়। যা প্রতিনিয়ত চলছে তাকে একদিন বিশেষ করে উপলব্ধি ও আস্বাদন করবার জন্য বছরে একটা বিশেষ সময় বেছে নিয়েছেন ভারতের সাধক—, বৃষ্টি-ঝরঝর ঝুলে পড়া মেঘ যখন আকাশের উপরে অনেক দূরে উঠে গেছে, যখন তেজা মেঘ সরে গিয়ে সেই অনেক উপরে নীলের সমারোহে সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, শীতের আড়ষ্টতা মানুষকে যখন পর্যন্তও জড় করে দেয় নি, আশ্বিনের সেই দিনগুলিতে আত্মসমীক্ষার অবসর, বিশ্বের সৃষ্টি-তত্ত্ব উপলব্ধির দিন—মায়ে সন্তানে

মিলনের দিন। কে আমি, কতটুকু আমি, জগৎ জুড়ে এই আনন্দ-যজ্ঞে কেন আমার নিমন্ত্রণ সেই ভাববার উত্তর পাই যখন মায়ের সন্তানে মিলিত হতে পারি। স্রষ্টার কাছ থেকে, মায়ের কাছ থেকে সৃষ্টি-তত্ত্ব শিখে নিতে না পারলে কোথায় কেমন করে জানব এর রহস্য? আমি তো ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র — আমি যে তাঁরই অংশ তিনি – বিশ্বের সব কিছুর সঙ্গে যে আমার নাড়ীর সম্বন্ধ — এ কথা যদি না বুঝি, তাহলে কোথায় আমার স্থান, কিসে আমার অভয়?

স্রষ্টাকে, শক্তিতত্ত্বকে, মা-কে তিনভাগে দেখতে পেয়েছেন সাধক— মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী। সবটুকু মিলিতেই মায়ের রূপ সুন্দর, মহীয়ান – অংশ ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আনন্দ-আস্বাদন – জীবনের পরিপূর্ণ রূপ।

প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে যেতে হচ্ছে মানুষকে কিছু না কিছু ভাঙনের মধ্য দিয়ে। পরিবর্তিত নূতনকে বরণ করতে অতীতকে ভুলতে কিছু হবেই, সেই শক্তি লাভ করতে মায়ের পুজো। অতীতকে পেরিয়ে আসা কি সহজ? অভ্যাস মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখে। নূতনকে বরণ করে নিতে পদে পদে সে বাধা দেয়। মহাকালীর পুজো করে নূতনকে বরণ করে নেবার শক্তি অর্জন করব। সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছি না—নূতনের আহ্বান কানে আসে—অতীত টেনে ধরে—কোন্ অনিশ্চয়ের মধ্যে পা দেব। মাতৃশক্তি সেইখানে সেই অনিশ্চয়ের মধ্যে পথ দেখাবে। আমার ব্যক্তিসত্তা বুঝি দিশেহারা হয়ে পড়ে। সবাই কি নূতনকে চিনতে পারে? নূতনকে যে বরণ করে নেব, কেমন করে নেব, কতটুকু নেব। বিশ্বে সব কিছুতে যে সুন্দর অসুন্দর, কল্যাণ অকল্যাণ, ভালমন্দ জড়ানো। যা আমার ব্যক্তি-সত্তাকে সার্থক করে সমষ্টি সত্তার সঙ্গে সঙ্গেই—তা বেছে করে নেওয়া কি আমার ব্যক্তি-বুদ্ধিতেই সম্ভব? নূতন বলেই কি তার সবটুকু গ্রহণীয়? অতীতকে যে ছাড়ব একটা বিপর্যস্ত এলোমেলো গোলমালের মধ্যে পড়ে যাব না? পুরুষোত্তম সঙ্গে নূতনকে মিলিয়ে তার কল্যাণী রূপকে আমার ব্যষ্টি সমষ্টি সত্তায় কেমন করে ফুটিয়ে তুলব? সপ্তমী দিনে মহাকালী পুজোয় মায়ের কাছে শরণাগত হয়ে এই সব শিখব, সেই মিলিয়ে নেবার, কল্যাণকে খুঁজে পাবার বুদ্ধি লাভ করব। মায়ের সঙ্গে—বাপ-ঠাকুরদার আনন্দঘন সত্তার সঙ্গে—যুক্ত না হলে ভাঙনের মধ্য দিয়ে যেই হারিয়ে ফেলব, কল্যাণী বুদ্ধিকে খুঁজে পাব না। তাই চাই মায়ের কাছে শরণাগতি। আমি ভাঙনের মধ্যে যা দেখতে পাই না, কোথায় কোন্ তীরে হব পার, মা সেখানে ধরে রেখে উত্তরে দেবেন কল্যাণী নূতনের হাতে। নূতনের কতটুকু নেব, কেমন করে মেলাব তা তাঁর কাছ থেকে শিখে না নিলে এলোমেলো বিশৃঙ্খলতার ছন্দহীনতা আমাকে বিপর্যস্ত করে দেবে। তাই শ্রদ্ধা আর শরণাগতি নিয়ে নূতনকে চেনা, বরণ করা ও মিলিয়ে নেওয়া শিখব মায়েরই কাছে। অতীতের যা ভাঙতে হবে তার দুই রূপ—সুন্দর রূপেও তাকে দেখা গিয়েছিল, কুরূপে তো বটেই। সুন্দরকে আর কুরূপকে—দুইকে পেরিয়েই নূতনের দেখা মেলা সম্ভব। তাই মহাকালী পুজোয় মধু ও কৈটভরূপ অসুর বধ।

অষ্টমী দিনে শক্তি মহালক্ষ্মী রূপে সাধকের

কাছে উদ্ভাসিত হলেন। তিনি বিচ্ছিন্নতারূপ মহিষাসুর বধ করলেন। মহালক্ষ্মীর কাছে আমরা শিখব সঙ্ঘবদ্ধতার সাধনা। নূতন সৃষ্টিকে যখন বরণ করলাম তখন সব চেয়ে যা দরকার তা হল সঙ্ঘবদ্ধতা। মহালক্ষ্মী সংঘবদ্ধ দেবশক্তি-সত্তাতা —তাই তাঁর কাছে সৃষ্টিকে বিচ্ছিন্নতারূপী অসুরের হাত থেকে রক্ষা করতে শিখব সঙ্ঘবদ্ধতার সামগ্রিক চেতনা দ্বারা। মানুষের ভেতরকার বিচ্ছিন্নতারূপী অসুরই সৃষ্টিকে ধ্বংস করে—কেউ কারো সাথে মিলতে পারে না—প্রত্যেকে আলাদা আলাদা। এই বিচ্ছিন্নতা-বুদ্ধি সর্বনাশা। মিলতে হবে—প্রত্যেকের সঙ্গে—যে বিরোধী তার সাথেও মেলবার বুদ্ধি বের করতে হবে এই মহালক্ষ্মী পূজাদ্বারা। যেখানে সর্বজনের মিলন, সেখানেই মহালক্ষ্মী বিরাজিতা। শ্রীকৃষ্ণ রাস মণ্ডলে সব রকম গোপী-দের সম্মিলিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সঙ্ঘবদ্ধতাই সৃষ্টিকে রক্ষা করতে পারে। সংঘ থেকে নিজেকে যখন আমরা পৃথক করে ফেলি, তখন কিন্তু এ কথাটা আমরা ভুলে যাই যে পৃথক বললেই পৃথক হওয়া যায় না—আমি জাগ্রত বুদ্ধিতে যতই সকলের সঙ্গে আমার নাড়ীর যোগ অস্বীকার করি না কেন, এ কথা কোন মতে মিথ্যা নয় যে এ বিশ্বে সকলের সঙ্গে সকলে সংগ্রথিত। আমরা নির্বোধ এ কথা তাই বুঝতে তো পারিই না—জোরের সঙ্গে অস্বীকার করতে চাই। সেইটি যে সত্য নয়, আমরা যে আসলে এ বিশ্বে সকলের সঙ্গে মিলে মিশেই সত্তা হয়ে আছি—সেই কথাটা শিখব মহালক্ষ্মীর পূজায়। সেই দিনে এই সঙ্ঘবদ্ধতার ধ্যান আমাদের হোক।

সৃষ্টি রক্ষা পাওয়ার পরে সমস্যা দেখা দেয় মানুষের 'অহম্'-এর গ্রাস থেকে তাকে রক্ষা করতে। মানুষের একটা স্বভাব আছে যতটুকু তার অধিকারে তত-টুকুকেই সে নিজের অহম্ দিয়ে মুড়িয়ে তার অধি-পতি হতে চায়—আমার ও আমি-বোধ তাকে আচ্ছন্ন করে এই বুদ্ধি দেয় যে' এ-সৃষ্টি আমার ভোগের বস্তু—আমি একে যথেচ্ছ ভোগ করব। কিন্তু এ বিশ্বের একটি কণাও অপরের যথেচ্ছ ভোগের বস্তু নয় এই কথা জানাতেই নবমী দিনের দেবী মহাসরস্বতী ঐ অহম্-পরায়ণ ভোগবাদী অসুর শুম্ভ নিশুম্ভের ভোগের প্রস্তাবের জবাবে বলেছিলেন, 'যে আমাকে সংগ্রামে জয় করতে পারবে, যে আমার দর্প চূর্ণ করতে পারবে, যে আমার প্রতিবল—সে-ই আমার ভর্তা হতে পারবে।' এ বিশ্বের প্রতি বস্তু প্রতি ঘটনা এই ঘোষণা করে বসে আছে—প্রতি ধূলিকণা বলছে আমাকে জয় করে নিতে হবে। অর্থাৎ কেউ কারো ভোগ্য নয়—এ বিশ্বে প্রতি বস্তুকণা পবিত্র—কেউ কাউকে ভোগ করতে পারে না। প্রত্যেককে তার উপযুক্ত মান মর্যাদা দিয়ে, অপরের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে এ বিশ্বে সকলে টিকে থাকবে, কারো ভোগ-বুদ্ধিসর্বস্ব আমির কাছে কেউ নিজেকে বলি দেবে না। আমার যতটুকু সৃষ্টি, ততটুকুও আমার ভোগের বস্তু নয়—এ বিশ্বে প্রত্যেকে শুধু সেবা-বুদ্ধি প্রণোদিত হলেই নিজের সৃষ্টিকেও বাঁচিয়ে রাখতে পারে, নইলে তা ধূলোয় মিশে যেতে খুব সময় নেয় না। নবমী পূজার দিনে মহাসরস্বতীর পূজায় এই কথা শিখব। তখনই সৃষ্টি ও স্রষ্টা সার্থক।

বিশ্বের শক্তি-তত্ত্বকে সার্থক যদি এই ভাবে

বুঝে সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধে ওয়াকীবহাল হয়, তাহলেই জীবনে সে বিজয় লাভ করতে পারে। বিশ্বের মধ্যে সর্বের সাথে মিলতে পারাই বিজয় লাভ। তিন দিনের শক্তি-আরাধনাকে যদি জীবনের মধ্যে সত্য করে তুলতে পারি তাহলে নূতন সৃষ্টিকে সংঘবদ্ধতার দ্বারা রক্ষা করে নিজের আমিকে সেবার মধ্যে ছড়িয়ে দেব—তখন বিজয় আপনি এসে দ্বারে উপস্থিত হবে। নিজের আমি দিয়ে বিশ্বকে ভোগের দৃষ্টিতে আয়ত্ত করতে চাইলে বিজয় কখনই আসবে না। সংঘবদ্ধতা ছাড়াও নূতন সৃষ্টিকে রক্ষা করা যায় না। বিশ্বের শক্তিতত্ত্ব প্রতি ঘটনায় এমনি ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। তার সাথে আমার নাড়ীর যোগ যত ক্ষুণ্ণই আমি হই না কেন। আমার স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রেখেও যদি এই নাড়ীর যোগকে রক্ষা করতে পারি, তাহলে পথহারা হই না এত বড় বিরাট কর্মশালায়—আমার প্রচেষ্টা বিশ্ব-মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত হয়ে আনন্দিত হয়, সার্থক হয়। তাই এই আশ্বিনের নির্দিষ্ট দিনগুলিতে এমন করেই যেন তাঁর কাছে নিজেকে নিবেদন করতে পারি যাতে আমার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রকাশ ঘন হয়ে ওঠে। যিনি সর্বভূতে ছড়িয়ে আছেন সেই সর্বভূতস্থা মাকে নমস্কার, বার বার নমস্কার। তিনি সুন্দর, তিনি ভীষণ, তবু তিনি আমারও মা, তিনিই সকলের মা—এই বোধ জাগ্রত হলেই মাতৃরূপিণী শক্তিতত্ত্ব অধিগত হয়। সেই মাতৃ-শক্তির জয় হোক।

শক্তি তত্ত্বের উৎস

ডঃ গুরুদাস কুমার
শ্রীমতী কমলা কুমার

শক্তি-তত্ত্ব একটি অতি প্রাচীনতম ধর্ম। হিন্দু দর্শন ও শাস্ত্রমতে শক্তিই মহাজাগতিক আদ্যাশক্তি যাহা নারী বা মাতৃকারূপে রূপান্তরিত হয়ে দুর্গা, কালী, উমা, মহামায়া প্রভৃতি নানারূপে পূজিত হইয়া থাকে। ইহা পরমা শক্তি ব্রহ্মেরই বিধিরূপ। শক্তিতত্ত্বে শিবই নিষ্ক্রিয় পুরুষ আর প্রকৃতি প্রবৃত্তি-রূপিণী কার্যকারিণী শক্তি বিশেষ। এই পুরুষ ও প্রকৃতির সমন্বয়ে বিশ্ব জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি বিনাশের শক্তিভূতা সনাতনী দেবীর আবির্ভাব।

জীবন উৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে ঊর্বরতা ও প্রজনন শক্তির উপাসনা বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল। প্রাকৃতিক শক্তি দেব দেবীর রূপ কল্পনা পুরুষ দেবতার আদি প্রতীক লিঙ্গ পূজা পদ্ধতি প্রাচীন আর্যজাতির ভারতে আগমনের বহু পূর্বে ইরাণ, ইয়াক, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ঊর্বরতা ও প্রজননশক্তির

রূপ কল্পনা ও উহার প্রতীক মূর্ত্তির প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া যায় খৃঃ পূঃ প্রায় ২৫,০০০ হাজার বৎসর পূর্বে পুরা প্রস্তর যুগের আবিষ্কৃত জীব-জন্তুর অস্থির উপর রেখাঙ্কন চিত্র ও বিশেষ প্রস্তরে খোদিত নারী মূর্ত্তিতে (Venus)। এই সকল নিদর্শন হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক মানবের মধ্যে প্রাণ ও জন্ম রহস্যের মাতৃকল্পিত নারী মূর্ত্তির চারু শিল্পের বিশেষ প্রচলন ছিল। জীব জন্তুর প্রাচুর্য্য ও মানবের উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহারা নানা প্রকার মূর্ত্তি পূজা ও যাদুবিদ্যার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল ও ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করিত।

খৃঃ পূঃ ৪,০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন ক্রীটের সভ্যতাতে প্রকৃত মাতৃকল্পিত দেবীর উপাসনা আরম্ভ হয়। প্রাচীন ঈজিপ্ট (মিশর) ও 'বাদারিয়ান' সভ্যতায় প্রাপ্ত নানা প্রকার ভিনাস নারী মূর্ত্তি আবিষ্কারের ফলে অনুমিত হয়, মূর্ত্তিগুলি পরবর্ত্তী যুগের মাতৃদেবীর প্রাক্‌রূপ। ইহাদের বেশীর ভাগই মাতা পৃথিবীর (Mother God dess) প্রতীক মূর্ত্তি। নিকট প্রাচ্যের প্রাচীন অধিবাসীরা শস্য উৎপাদিনী পৃথিবীকেই মনে করিতেন যেন মাতৃদেবী বা মাতা—বিশ্বপালিনী প্রাণ ও প্রজনন শক্তির উৎস। এইরূপ মাতৃদেবীতে গভীর বিশ্বাস ও ধর্ম্ম ভাবকে অবলম্বন করিয়াই পৃথ্বীদেবী মূর্ত্তির উপাসনার সূচনা ও উর্বরতা অনুষ্ঠানের প্রারম্ভ হয়। ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বাঞ্চলে বিশ্ব জননী জগন্মাতাই ছিলেন সেকালের প্রধান উপাস্য দেবী। প্রাচীন ক্রীট ও সাইপ্রাসে এক সময়ে সিংহবাহিনী পার্ব্বত্যদেবীর পূজার বিশেষ প্রচলন ছিল। এশিয়ার প্রসিদ্ধ মাতৃদেবী 'সিবিলি' ও ক্রীটের মাতৃদেবী একীভূত হইয়াছিলেন। পশ্চিম এশিয়ার প্রায় সর্বত্রই মাতৃদেবীর উপাসনার সঙ্গে তাহার অধীনস্থ তরুণ দেবতারও প্রচলন দেখা যায়। উহারা প্রায়ই পুত্র বা পতিরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকিত।

ভারতবর্ষে মাতৃরূপে কল্পিত শক্তি বা দেবীর উপাসনার প্রবর্ত্তন ও পিতৃ দেবতার পূজা বৈদিক যুগ আরম্ভ হইবার বহু পূর্বেই প্রচলিত ছিল। খৃঃ পূঃ ২,৫০০ হাজার ১,৫০০ অব্দে প্রাচীন সিন্ধু নদ উপত্যকার পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম প্রান্তে দুইটি প্রাগৈতিহাসিক যুগে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ নগর হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো (Marshel J. H. 1931) আবিষ্কারের ফলে প্রাগ্‌বৈদিক যুগের শিল্প সংস্কৃতি ও ধর্ম্মীয় মৃণ্ময় নারীমূর্ত্তির এক অপরূপ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই সকল অঞ্চলে নানা প্রাচীন বস্তুর মধ্যে বহু ক্ষুদ্র নারী মূর্ত্তি যেগুলি অধিকাংশে সামান্য বস্ত্রে আবৃত। কতকগুলি অর্দ্ধ দেহমাত্র ও দেখিতে বেশ উগ্র ও কণ্ঠদেশে অলঙ্কার ভূষিতা। ইহা ছাড়া শীল মোহরে পোড়া মাটিতে উৎকীর্ণ খোদিত নানা প্রকার চিত্র ও এক বিশেষ দেবতার মূর্ত্তি ত্রিমুখ, দ্বিভুজ, যোগাসনে উপবিষ্ট ও চতুষ্পার্শ্বে হস্তী, ব্যাঘ্র, প্রভৃতি বেষ্টিত মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল পুরুষাত্মিক নারী মূর্ত্তিগুলি অনুশীলন করিয়া নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন যে সিন্ধু নদের প্রাচীন অধিবাসীগণ এই মূর্ত্তিগুলিকে মাতৃদেবী বা জগন্মাতার উপাসনা ও পূজার্থে ব্যবহার করিত। ইহা ছাড়া ঐ মূর্ত্তিগুলি খাদ্য শস্যের উৎপাদিনী পৃথ্বী দেবী ও গৃহদেবতারূপেও পূজিত হইত। মার্শেল সাহেবের মতে (1931) শীলমোহরে অঙ্কিত পুরুষ দেবতার মূর্ত্তিগুলি পৌরাণিক শিবের

আদি প্রতীক। শিব বা পশুপতি পরিকল্পিত আকৃতির মূল আদর্শ পরবর্তী যুগে হিন্দুজাতির মধ্যে শিব শক্তি রূপে প্রচারিত হইয়াছে। অতএব শিব ও শক্তি পূজার উৎস প্রাগ্‌বৈদিক। সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত যোনি বা লিঙ্গরূপী জড় পদার্থের নিদর্শন হইতে প্রতীয়মান হয় যে শিব শক্তির উপাসনার প্রবর্তন এক অতি প্রাচীন রূপাদন।

খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষে ইন্দোইউরোপীয় ভাষী উপজাতিরা যখন দেশান্তরে যাইয়া ইরানে বসবাস করেন তখন তাহাদের মধ্যে বৈদিক আর্য্য জাতির মত প্রকৃতি পূজা ও বিভিন্ন দেব দেবী রূপ কল্পনার প্রচলন দেখা গিয়াছে। এশিয়া মাইনরের 'বোগজকই' (Bozbukeui) নামক স্থানে আর্য্য-জাতি মিটানীদের লিখিত প্রাচীন বিবরণ হইতে জানা যায় যে মিটানী শাসকদের ভাষা ছিল আদিম বৈদিক ভাষার অনুরূপ। ইন্দ্র, বরুণ, নাসত্য প্রভৃতি তাদের উপাস্য দেবতা ছিল বৈদিক দেবতারই মত।

প্রাচীন আর্য্যরা সকলেই ছিলেন প্রকৃতির উপাসক। প্রকৃতির মধ্যে শক্তির কল্পনাই ছিল তাহাদের ধর্মের বৈশিষ্ট্য। তাহারা বেশীর ভাগই দেবদেবীকে প্রাকৃতিক শক্তি বিশেষের স্থূল ও বাহ্য বাক্তিত্বের রূপ কল্পনা করিয়া নানা স্তোত্র উপাসনা ও আহ্বান করিতেন। বৈদিক আর্য্যদের সমাজনীতি পিতৃ-তান্ত্রিক। মাতৃ দেবতার উপাসনা ও ধর্ম-বিশ্বাস অত্যন্ত গৌণ স্থান অধিকার করিত। ইন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণ ইত্যাদি পুরুষ দেবতাগণেরই প্রাধান্য ছিল। বৈদিক ঋষিদের মধ্যে অদিতি উষা, সরস্বতী, রাত্রি, পৃথ্বী, ইড়া, বীরণা ইত্যাদি। বৈদিক ঋষিগণ পৃথিবীকে প্রাণদায়িনী, অন্নদায়িনী এবং ধনদারূপে সর্বপ্রকার বাৎসল্য ও স্নেহভাবে স্তব করিয়া শ্রদ্ধাহুতি প্রদান করিতেন। বেদে দ্যৌ পিতা ও পৃথিবীরূপী মাতার কল্পনার মধ্যে এক সার্বজনীন পিতা মাতার ও পতি পত্নীরূপের আভাষ পাওয়া যায়। ঋক্‌বেদে অদিতিদেবী আদিত্য-গণের জননী বলিয়া স্তুতা হইয়াছেন। এই অদিতিই ছিলেন পৃথিবী। অখণ্ড সীমাহীন অদিতি হইলেন খণ্ড সীমাযুক্ত। বেদের পরবর্তী যুগে অদিতি দক্ষ-জননী ও দক্ষ-কন্যা উভয়রূপে বর্ণিত হইয়াছে। বৈদিক সূত্রে মাতৃদেবীর বহু উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে শক্তি-ধর্মকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে মাতৃদেবীর পূজার ধারা মূলতঃ দুইটি :— একটি প্রাচীন বা পৌরাণিক ও অপরটি আধ্যাত্মিক। প্রাচীন ধারামতে দেবী এক পর্বতবাসিনী, বিন্ধ্য-বাসিনী ও সিংহবাহিনী যিনি পরবর্তীকালে গিরিজা, শৈলতনয়া নামে খ্যাত। এই পার্বতী হইলেন উমা, শিব বা পশুপতি হইলেন তাঁহার পতি। দ্বিতীয়মতে দেখা যায় দেবী পরম তত্ত্ব। তিনি ত্রিভুবনব্যাপিনী এক অদ্বিতীয়া মহাশক্তি। সেই মহাশক্তি বা আদ্যাশক্তি হইতে সব কিছু প্রসূত।

অতএব দেব-দেবীর মূর্তি পূজার প্রাচীনত্ব মাতৃদেবী-কল্পিত শক্তি-দেবীর উপাসনা ও শক্তি-তত্ত্বের ঐতিহ্য দেব দেবীর বিচিত্র রূপ বর্ণনা প্রভৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রাণ ও প্রজনন শক্তির জননী রূপে মাতৃ কল্পিত নারী মূর্তির উপাসনা মানব ইতিহাসে বহু যুগ যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে নারী মূর্তিগুলি উর্বরতা ও প্রজনন শক্তির প্রতীকরূপে কল্পনা করা হইত। ক্রমশঃ যখন মাতৃদেবীর উপাসনা

প্রসারিত হইতে লাগিল স্থূলভাবে সেগুলি আরও আনুষ্ঠানিক ও রীতিসিদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান হিন্দুধর্মে সকল দেব দেবীর রূপ কল্পনা ও মাতৃরূপে শক্তিদেবীর উপাসনার আদি সংস্কার মূলতঃ একই। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও অনুশীলনের ফলে প্রতীয়মান হয় যে সুদূর প্রাচ্যের প্রাচীন অধিবাসীদের ধর্ম সংস্কার দেব দেবীর মূল কল্পনা বহুকাল হইতেই একসূত্রে আবদ্ধ। কাল-ক্রমে সেগুলি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়া পার্শ্বিক নানা জাতির সভ্যতা ও ধর্ম পদ্ধতির সহিত সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান হিন্দু ধর্মের দেব দেবীর রূপ কল্পনা ও শক্তি তত্ত্বের মূলসূত্রগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। আধুনিক হিন্দুসমাজে ও অষ্ট্রিক গোষ্ঠির আদিবাসীদের ধর্ম সংস্কারগুলিতেও মাতৃ-দেবীর ও গ্রাম্যদেবীর উপাসনা লিঙ্গরূপী পাথর পূজার প্রচলন এখনও বর্তমান।

জাতীয় চেতনার বিকাশে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব।

শ্রী নিখিলরঞ্জন রায়

উপরোক্ত প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে জাতীয় চেতনা বিকাশের ইতিহাস সম্বন্ধে দু'চারটা কথা বলে নেওয়া ভাল। কি ভারতে, কি ইউরোপখণ্ডে জাতীয়ভাবোধের জন্ম খুব বেশী দিনের কথা নয়। ইতিহাসের পাতা উল্টালেই দেখা যায় যে, জাতীয়তাবোধ বা nationalism-এর প্রথম উন্মেষ হয়েছিল ইতি-হাসের আধুনিক যুগে। আঠারো শতকের শেষ দিকে আর উনিশ শতকের গোড়ায় ইউ-রোপের ইতিহাস নেপোলিয়ানের সমরাভিযানের দুন্দুভিনিনাদে মুখরিত। তাঁর অজেয় সেনাবাহিনীর পদভরে ধরণী সেদিন টলমল। বহুদেশের স্বাধীনতা হরণ করে নেপোলিয়ন চেয়েছিলেন সারা ইউরোপে অখণ্ড ফরাসী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে। যে সব রাজ্যের স্বাধীনতা অপহৃত হয়েছিল সেখানে অনুপ্রবেশ করল ফরাসী বিপ্লবের বাণী : সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। এতো-দিন পর্যন্ত যুদ্ধ হোত রাজায় রাজায়। সৈন্য-বাহিনী হোত রাজার বেতনভুক্, থাকত রাজার অধীন। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ, আর বহিরাগত ফরাসীদের আধিপত্য শুধু রাজন্যবর্গের মধ্যেই নয়, বুদ্ধিজীবী মহলে এবং সাধারণ মানুষের মনেও সঞ্চারিত হোল বিদেশী শাসনের প্রতি বিরূপতা এবং জাতীয় ঐক্য ও সত্ত্বাবোধ। এই মনোভাব ক্রমশই দৃঢ় হয়ে উঠতে লাগল। প্রাশিয়া এবং স্পেন, নেদারল্যাণ্ড ও ইতালীর মানুষ বাধা দিতে লাগল বিজাতীয় ফরাসী শাসকদের; নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা শান্তি-চুক্তির ফলে ফরাসী-অধিকৃত রাজ্যগুলির পুনর্বিন্যাসে জাতীয় রাজ-তন্ত্রের (National monarchy) প্রথম উদ্ভব

ঘটেছিল। জার্মান জাতির জন্ম জার্মেনি, ইতালীয়গণের দেশ ইতালি, তাচজাতির দেশ হল্যাণ্ড—ইত্যাকার জাতীয় রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন হল সেই সময় থেকে। নেপোলিয়ন শুধু একজন দিগ্বিজয়ী রণদুর্মদ সমরনেতাই ছিলেন না, অন্যান্য বহু নূতন প্রথা ও প্রতিষ্ঠান রূপ পরিগ্রহ করেছিল তাঁর উদ্যমে ও প্রেরণায়। ইউরোপ খণ্ডে আধুনিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষেও তাঁর পরোক্ষ অবদান অনস্বীকার্য।

এবার আমাদের ভারত ভূমির দিকে একবার তাকাই। জ্ঞাত ইতিহাসের আদি যুগ থেকে হাজার খুঁজলেও এ দেশে আধুনিক জাতীয়তাবাদের অস্তিত্বের হদিশ মেলে না। মধ্য যুগ অর্থাৎ খ্রীঃ নবম/দশম শতক থেকে ভারতীয় ইতিহাসের রূপরেখা অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে সিন্ধুদেশে বিজাতীয় আরবরা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। তারও প্রায় তিনশো বছর পরে ভারতের বায়ুকোণে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে দেখা দিল এক নূতন দুর্যোগ। তারপর কিঞ্চিন্যূন দু'শো বছরের মধ্যেই স্বাধীন হিন্দুভারতের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল। দেশের সেই ঘোর দুর্দিনে প্রবল শত্রুর প্রতিরোধে দু'চার জন হিন্দুরাজা এগিয়ে এসেছিলেন, আত্ম বিসর্জন দিয়েছিলেন এবং দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে নিজেরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন। কিন্তু সেই মহাসঙ্কটের দিনে দেশের অন্যান্য রাজারা কেহই পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন নি, তেমন দেশের জন্য সাময়েও ছিল একান্ত স্বল্পতাত্ত্বিক ঔদাসীন্যে নিশ্চিন্ত, নির্লিপ্ত। দেশের মানুষের এই মনোভাবটি কুটেন্টেটের ঐতিহাসিক কথায়:—

"The East bowed low before the blast,
In patient deep disdain.
She let the legion's thunder pass.
And plunged in thought again."

—Matthow Arnold

প্রবিষয়শা বাঙালী ঔপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি অর্থবহ ভাষায় দেশের তৎকালীন অবস্থার যে মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন তারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করি—

"শকাব্দের দশম শতকে ভারতের ভাগ্যাকাশে সূর্যাস্ত হইতেছিল। নয় শত বর্ষ ব্যাপী মহারাত্রি আসন্ন। পশ্চিম দিক্‌প্রান্তে রাক্ষসী বেলার কৃষ্ণিরোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। সেই সময় ভারতের অগণিত রাজন্যবর্গ পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া, অথবা বিশেষে মৈত্রী মিতালী করিয়া মনের আনন্দে কাল কাটাইতেছিলেন। প্রজারাও মোটের উপর মনের সুখে ছিল। ৮৯৯ শকাব্দে সবক্তগীন আসিয়া লাহোর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিলেন। ৯২৭ শকাব্দে আসিলেন মামুদ গজনী। ৯৩৬ হইতে ৯৪৮ শকাব্দের মধ্যে সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠিত হইল। ১১৫৫ শকাব্দে মহম্মদ ঘোরী দিল্লী অধিকার করিলেন। মহারাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। ইহা ভারতের পশ্চিম প্রান্তের কথা। ভারতের পূর্বভাগে তখনও একটু আলো ছিল। ক্ষীণ চন্দ্রের আবছায়া আলো। সে আলোতে দূর পর্যন্ত দেখা যায় না, নিজের আঙিনাটুকু মাত্র দেখা যায়। আঙিনায় ফুল ফুটিয়াছিল, অবসন্তীর পরিশীলনে মলয়ানিল বহিতেছিল। মানুষ নিশ্চিন্ত মনে প্রেম করিতেছিল, গান গাহিতেছিল, শিল্প সৃষ্টি করিতেছিল। রাজারাও নিজেদের

অন্তরে খেলা খেলিতেছিলেন ; যুদ্ধ বিগ্রহ, মৈত্রী মিতালী ও রাজনৈতিক কূটক্রীড়া চলিতেছিল। কিন্তু আসন্ন দুর্যোগের অগ্রবর্তী ছায়া তাঁহাদের মুখের উপর পড়ে নাই। পশ্চিম ভারতে বিজাতীয় শত্রু প্রবেশ করিয়াছে এ সংবাদ যে তাঁহারা একেবারেই জানিতেন না তাহা নহে। তাঁহারা নিজেদের ঘর লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, বাহিরের দিকে দৃক্‌পাত করিবার অবসর তাঁহাদের ছিল না।

সেদিন ধীরে ধীরে ভারতেতিহাসের নাট্য মঞ্চের উপর মহাকালের কৃষ্ণ যবনিকা নামিয়া আসিয়াছিল, প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছিল। তারপর রঙ্গমঞ্চ যুগান্তকাল ধরিয়া তিমিরাবৃত ছিল। নৃত্যগীত, হাস্যকৌতুক মূক হইয়া গিয়াছিল। মানুষ চামচিকার মত অন্ধকারে বাঁচিয়া ছিল।"

ভারতের ইতিহাসে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির প্রথম হোতা বীরশ্রেষ্ঠ ছত্রপতি শিবাজী। নানা জাতি, উপজাতি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত মারাঠা জনশক্তিকে তিনিই এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেছিলেন। মুঘল দুঃশাসনের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধেই শিবাজীর এই মহোদ্যম। কিন্তু তাঁর নীতি ছিল উদার ও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। রামদাস তুকারাম ও নামদেব প্রমুখ সমন্বয়বাদী ধর্মগুরুদের আদর্শে তিনি এক অখণ্ড, ঐক্যবদ্ধ ভারতিভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর শাসনে পরধর্ম বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা উদিবে প্রভাতে
এসেছিল নামি,
এক ধর্ম-রাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিবে বলে একত্রিত।
ভারতের দুর্ভাগ্য সেই পুণ্যলগ্ন পেয়েছিল কি না

মারাঠা সামন্তগণ শিবাজীর সেই মহান আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে মারাঠা জাতি ও মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য করে তুলেছিলেন।

ভারতে আধুনিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনে ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রসারে। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়গণই জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রবক্তা। আবার এ কথাও সত্য যে ইংরেজী জানা কিছু লোকই, যেমন মহম্মদ আলী জিন্নাহ ও মুসলীম লীগ, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ঘোর শত্রু। দুরাত্মা জিন্নাহ বলেছিল : I shall have India destroyed if not divided। এই জাতীয়তাবাদের ভাবধারা তাঁরা পেয়েছিলেন ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদির ভাণ্ডার থেকে। হিন্দু কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং তাঁর অনুরাগী ভক্ত শিষ্য সম্প্রদায়—যাঁরা তৎকালে "ইয়ং বেঙ্গল" নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন—জাতীয়তার অগ্রদূত। ডিরোজিও ছিলেন ফিরিঙ্গি বংশোদ্ভব, কিন্তু ভারতকেই তিনি তাঁর স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত "ফকির অব জাঙ্গিরা" কাব্যের একটি কবিতাকে সর্বপ্রথম স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক কবিতা বলা যায়—

My country ! in thy days
of glory past
A beauteous halo circled
round thy brow,
And worshipped as a deity
thou wast—
—Where is thy glory, where
that reverence now ? ইত্যাদি

* * * *

স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব, অস্তে গেছে চলি
সেদিন তোমার; হায় সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজা ছিলে এই ভবে!

[দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ]

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নবগোপাল মিত্র ও রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির উদ্যোগে এবং ঠাকুর পরিবারের সাহায্যে ও সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত কলকাতার 'হিন্দুমেলা' জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের উদ্বোধনে আর এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। হিন্দুমেলা উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথের মেজদা প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত গান ভারত-সঙ্গীত রচনা করেছিলেন—

"মিলে সব ভারত-সন্তান
একতান মনঃ প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান।

মনে রাখতে হবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তখনো প্রতিষ্ঠা হয় নি। সারা ভারতকে এক অখণ্ড স্বদেশ এবং সব ভারতবাসীকে এক ঐক্যবদ্ধ জাতিরূপে কল্পনা এই প্রথম।

আদর্শ, ভাব এবং প্রেরণার দিক থেকে যে সব কবি, সাহিত্যিক, ধর্মনেতা, সংবাদপত্রসেবী ও মনীষী দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম ও জাতি গৌরব সঞ্চারিত করে ইতিহাসে অমর আসনে আসীন হয়েছেন তাঁদের মাত্র অল্প কয়েকের নাম প্রদ্ধাভরে উল্লেখ করা যেতে পারে—হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখার্জী, কবি রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" মহা-সঙ্গীত, কেশবচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের ওজস্বিনী বাণী, স্বামীজীর অগ্নিময় 'স্বদেশমন্ত্র', লোকমান্য তিলকের উদ্দীপনাময়ী রচনা, স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথের গান, কান্ত কবি রজনীকান্তের স্বদেশী সঙ্গীত, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক, উর্দু কবি ইকবালের "হিন্দুস্তান্ হামারা", মুকুন্দ দাসের যাত্রা, অতুল প্রসাদের গান, কবি নজরুলের বিদ্রোহ-সঙ্গীত ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জাতীয় জয়-ধ্বনি—'জয় হিন্দ্' ইত্যাদি। উল্লিখিত ও অনুল্লিখিত অগণিত কবি, লেখক, গায়ক, নাট্যকার অভিনেতা, রাজনৈতিক নেতা ও দেশকর্মী জাতীয়তা বোধ, স্বদেশ প্রেম এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের মানসিক ও আদর্শগত পৃষ্ঠপট রচনা করে গিয়েছেন। আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম—তা' সে সশস্ত্র বিপ্লবোদ্যম, বা অহিংস গণ আন্দোলন যাই হোক না কেন—তাঁর প্রেরণা ও শক্তি পেয়েছিল জাতীয় সাহিত্যের উৎস হতে।

জাতীয়তাবোধ বা দেশপ্রেমের বীজ বপনের শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে বাল্যকাল। বীজ থেকে যখন অঙ্কুরোদ্গম হয় তখনই চারাগাছ স্থানান্তরে রোপন করা সমীচীন। বড়োগাছ স্থানান্তরিত করলে অনেক সময়েই বাঁচে না। স্বাধীনদেশে স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার ভিতর দিয়ে সুকৌশলে স্বদেশ প্রীতির প্রথম পাঠ দেওয়া-নেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। এবিষয়ে ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্বের ঈর্ষাকর্ষের দাবি করতে পারে। সাধারণতঃ সাহিত্য ও ইতিহাসকেই স্বদেশ মন্ত্রের বাহক রূপে ব্যবহার করা হয়। কবি হুকাসন মনে

নূতন ভাবের সঞ্চারণ অপেক্ষাকৃত সহজ। বালকের কিশোরের কাঁচা চোখে সোনালী স্বপ্নের অঞ্জন লেপে দেওয়া সহজ। বিলেতের স্কুল পাঠ্য বইগুলির পাতায় পাতায় ছড়া ছবি, কবিতা কাহিনী, জীবন-চরিত, নীতিবাক্য ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের প্রতি গৌরববোধ, জাতির শ্রেষ্ঠত্ব, বীরত্ব ও মহত্ত্ব, আর দেশবাসীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মনকে তৈরি করার সুপরিকল্পিত প্রয়াস দেখা যায়। অনেকটা সেই প্রথারই অনুসরণে আমাদের দেশের স্কুলপাঠ্য কিতাবেও অনুরূপ দেশপ্রেমমূলক রচনা স্থান পেয়ে আসছে। সাহিত্যের, বিশেষ করে ইংরাজী সাহিত্যের বইগুলি কিন্তু ছিল এবিষয়ের ব্যতিক্রম। বিলাতের নদ-নদী, শহর গ্রাম, আর বিলাতের মানুষের নামধাম কীর্তি কাহিনীর কথায় ভরা থাকত পূর্বেকার ম্যাকমিলান অক্সফোর্ড ব্রাঞ্চি ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের সঙ্কলনগুলি। দেশের পরিবর্তে, নিজের পিতৃপিতামহ ও পূর্বপুরুষদের কীর্তি কাহিনীর বদলে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা পড়ত অজানা, অদেখা ইংরাজদের কথা। স্বাধীনতার পর এই অনভিপ্রেত রেওয়াজের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবু এখনও পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক প্রকাশিত "পিকক্ রীডার্স" অনেকটা সেই পুরানো রীতিই অনুসরণ করে যাচ্ছে। এই বইগুলির পরিকল্পনা ও রচনা উভয়ই ত্রুটিপূর্ণ। এর আশু সংস্কার ও পরিবর্তন আবশ্যক। তথাকথিত 'structural method' অনুসৃত হয়েছে এই বইগুলির রচনায়। "Structural method"-এর গুণকীর্তন অস্বীকার না করেও এখন খুব জোর গলায় বলা যায় যে, বইগুলি পড়ে ছাত্রছাত্রীরা কোন আনন্দ পায় না। আনন্দের সঙ্গে যা পড়া যায়, তাই সত্যিকারের পড়া। অন্তরের আগ্রহহীন যান্ত্রিক গলাধঃকরণে বলবর্ধনের সম্ভাবনা থেকে যায়। স্কুলের পঠন-পাঠন আনন্দকর করে তোলার দায়িত্ব যেমন শিক্ষকের তেমনি পুস্তক-লেখকেরও।

সম্প্রতি মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ স্কুল ফাইনাল পাঠ্যক্রমের বড় রকমের সংস্কার সাধন করেছে। নবপ্রবর্তিত সিলেবাসে ইতিহাস পাঠের ধরণ ধারণে বেশ একটা বড় রকমের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এতাবৎ যে সব ইতিহাসের বই স্কুলে কলেজে পড়ান হত তার অধিকাংশই ছিল ইংরেজ ঐতিহাসিকদের লিখিত বইয়ের প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ। উগ্র সাম্রাজ্যবাদী জেম্‌স্ মিলের প্রথম সমগ্র ভারতের ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইংরাজরাই প্রথম এদেশের ইতিহাস নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা শুরু করেছিল। এ প্রসঙ্গে স্যার উইলিয়ম জোন্স, হেনরি টমাস প্রিন্সেপ, জেমস টড প্রভৃতির অবদান স্মরণীয়। বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসের রহস্য উদ্ঘাটন করে এই মনীষীরা ভারতীয়গণের জাতীয় চেতনা জাগিয়েছিলেন। কিন্তু স্কুলকলেজের পাঠ্য লেখা হত ইংরেজ, অর্থাৎ বিজেতার দৃষ্টিভঙ্গীতে। ইংরেজ লাট-বেলাট, সেনাপতি ও প্রশাসকদের কীর্তিকাহিনীই ছিল এই সব বইয়ের উপজীব্য। ভারতীয়গণের কথা উক্তি সামান্যই বলা হত। ইংরেজ শাসকদের নানা কুকীর্তি আর ইংরেজ সেনাপতিদের বীরত্বের কাহিনী-ভারাক্রান্ত ইতিহাসের বই মুখস্থ

করে পরীক্ষা পাশ করতে ছাত্ররা হতো গলদ্‌ঘর্ম। ইতিহাস পড়ার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ। সে উদ্দেশ্য সাধনের ধারে কাছেও যেত না সেই সব ইতিহাসের বই। দেশের প্রতি গৌরব-বোধ, জাতির প্রতি মমতা ও দেশপ্রেমীর আদর্শ সঞ্চারিত হওয়া দূরে থাক, বিদেশীদের লেখা বই পড়ে আমরা যে তাদের তুলনায় কতো হীন, কতো নিকৃষ্ট আর দুর্বল সেই বোধই মনে বদ্ধমূল হত। ইংরেজদের সবই ভাল, আর আমাদের সবই মন্দ—এই হীনমন্যতায় শিকার হতাম আমরা। আজ স্বাধীনতার এক-চতুর্থ শতকের পরেও এই হীন মনোভাব আমরা একেবারে ছাড়তে পেরেছি কিনা সন্দেহ।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নূতন পাঠক্রমে ইতিহাস বই-গুলিকে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্যরূপে বলা হয়েছে—ইতিহাস পাঠের ভিতর দিয়ে দেশবোধ ও জাতীয় মর্যাদা জাগিয়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে মতান্তর থাকতে পারে না। দেশহিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-মাত্রই পর্ষদের এই প্রকল্পকে স্বাগত জানাবে। শিক্ষার্থীরাও দেশের প্রকৃত, অবিকৃত ইতিহাস পড়ে লাভ করবে আনন্দ, জ্ঞান ও দেশাত্মবোধ। এখন দায়িত্ব লেখকের। ইতিহাস লেখক ও ঐতিহাসিকের কর্তব্যের মূল নীতি যা স্থির নির্ধারিত করে দিয়েছেন 'রাজতরঙ্গিণীর' রচয়িতা সেটিও স্মরণ করা যাক—

"যিনি অতীত বিষয়ের বর্ণনাতালে রাগদ্বেষ পরিহার করিয়া অনুরাগ বা বিরাগ নিরপেক্ষ হৈর্য সহকারে মধ্যস্থ বা বিচারকের ন্যায় আচরণ করেন তিনিই প্রাজ্ঞ ঐতিহাসিক।" ঐতিহাসিকের কর্তব্য অতি দুরূহ। সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষভাবে প্রমাণসিদ্ধ সত্য পরিবেশন করা সহজ কাজ নয়। দেশ-প্রীতির আবেগময়তায় সত্য হয় বিকৃত, ঐতিহাসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। একদেশদর্শিতায় ঐতিহাসিক সত্য ক্ষুণ্ণ হয়। My Country right or wrong : My Country good or bad—এমন একটা মনোভাব প্রবল হয়ে উঠে ঐতিহাসিক এবং ইতিহাস-শিক্ষককে তাই নিয়ত সতর্ক থাকতে হবে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১৮১৫ সনের ওয়াটারলুর যুদ্ধ ইতিহাসের এক বিস্ময় ঘটনা। ইংরেজ লেখকদের অহরহই আজো সাই হুনিয়ায়। তাদের ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ইংরেজ লেখকদের মতে ডিউক অব ওয়েলিংটন হচ্ছেন নেপোলিয়ন-বিজয়ী ওয়াটারলুর বীর। এই মতটাকেই আমরা মেনে নিয়েছি, কারণ আমরা তো ইংরেজের লেখা বই ছাড়া অন্য বই পড়ি না। পক্ষান্তরে জার্মান লেখকদের মতে ওয়াটারলু বিজয়ের কৃতিত্বের বেশীর ভাগ হচ্ছে প্রাশিয়ান সেনাপতি ব্লুচারের প্রাপ্য। দাবিটা অযৌক্তিক নয়। কারণ, যুদ্ধের চরম মুহূর্তে ব্লুচারের অজস্র-বাহিনী অকুস্থলে এসে না পৌঁছুলে বিজয়লক্ষ্মী নেপোলিয়নকে বরিত করতেন না। নেপোলিয়নের re-inforcement আসবার কথা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর re-inforcement যথা সময়ে এসে পৌঁছুতে পারে নি। নেপ-

জিয়ামের রাজধানী ব্রাসেল্‌স্ শহরের অনতিদূরে এক নগণ্য গ্রাম ওয়াটারলু। সেখানে যুদ্ধের স্মারক চিহ্ন যা আছে তা থেকে কে বিজয়ী আর কে বিজেতা তা সহজে বুঝবার উপায় নেই। তৃতীয় পক্ষ: ফরাসীরা স্বীকার করে না যে, ওয়াটারলুর রণাঙ্গনে তাদের পরাভব ঘটেছিল। ইতিহাসের একই ঘটনা ঘিরে এরূপ মত-বিভিন্নতা আরও দেখা যায়। বিখ্যাত ইতিহাস-অধ্যাপক লর্ড অ্যাক্টন বলেছিলেন যে, এ যুদ্ধের ইতিহাস এমন নিরপেক্ষ ও সত্যভিত্তিক হওয়া উচিত, যাতে পাঠক বলতে না পারে যে লেখক ইংরেজ, না জার্মান, না ফরাসী।

দেশ-প্রেমমূলক ইতিহাস-কাহিনী যেন মারমুখী জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি না করে, সেদিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। প্রকৃত দেশপ্রেম পর দেশ ও পর জাতির প্রতি বিদ্বেষ জাগায় না। আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ পরিণামে সর্বনাশ ডেকে আনে, যেমন এনেছিল নাৎসী জার্মেনীর তাণ্ডব। উগ্র দেশপ্রেম থেকেই উদ্ভূত হয় উৎকট জাত্যাভিমান। উগ্র দেশপ্রীতি থেকে জন্মায় একটা মিথ্যা শ্রেষ্ঠত্বের ভাব, অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা। নাৎসীদের "Herren Volk" theory দ্বারা জার্মান জাতটাকে একটা মিথ্যা অহমিকার আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাত, সুতরাং অন্য সব জাতিকে তাদের পদানত থাকতে হবে। নাৎসী জার্মানীর স্কুল-পাঠ্যগুলিকে বিকৃত তথ্য ও অলীক কাহিনী সহযোগে পরিণত করা হয়েছিল নিম্ন স্তরের অতি নিকৃষ্ট ধরণের দলীয় প্রচার পুস্তকে। এর পরিণাম কতদূর ভয়াবহ এবং মারাত্মক হয়েছিল সাম্প্রতিক ইতিহাসই তার সাক্ষ্য বহন করে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তান এবং মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশ সেই একই ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করে চলেছে। ভারত-বিদ্বেষ আর হিন্দু-উৎসাদনের জিগির তুলে তারা জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। যখনি কোনো সঙ্কট বা সমস্যা দেখা দেয় তখনি তারা শুরু করে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার আর চালায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নানা উৎপীড়ন। উগ্র সাম্প্রদায়িকতাকেই তারা দেশপ্রীতি আর জাতীয়তাবোধের সমার্থক রূপে নেছে নিয়েছে। ও সব দেশের পাঠ্য বইগুলিও ঐ ঘৃণ্য মতিগতিরই পৃষ্ঠপোষক। কচি বয়স থেকেই শিক্ষার্থীকে শেখান হয় যে, ভারত তাদের শত্রু, আর কাফের হিন্দুরা হচ্ছে নিধনযোগ্য কুকুর। এরূপ হীন ও জঘন্য মনোবৃত্তি কখনই সত্যিকারের জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করতে পারে না। পরিণামে ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তাই শিক্ষা-ব্যবস্থায় উদার ও বিশ্বজনীন নীতির ভিত্তিতে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ-উদ্বোধক পাঠ্য নির্বাচন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষ যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন না করলে হিতে বিপরীত ঘটার সম্ভাবনা থেকে যায়।

গান্ধীজি ও সুভাষচন্দ্র

শ্রী সন্তোষ কুমার অধিকারী

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুই ব্যক্তিত্ব মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী বসুর। স্বাধীনতার ইতিহাসে এই দুই মহান মানুষকে নিয়ে বহু বিতর্ক ও বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। ফলে স্বাধীনতাউত্তর যুগের মানুষের পক্ষে সংগ্রামের দুই মহানায়কের স্বরূপ ও সঠিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার। এই ব্যাপারে কোন সঠিক প্রচেষ্টা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বরং মানুষের সাধারণ বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত হতে হয়েছে—কারণ যাঁরা জীবনী বা ইতিহাস লিখতে চেষ্টা করেছেন তাঁরাও মোহমুক্ত চিত্তা নিয়ে এগোতে চেষ্টা করেন নি। যিনি গান্ধীর ভক্ত তিনি এতই পক্ষপাতদুষ্ট হয়েছেন যে সুভাষ চন্দ্রকে নস্যাৎ করে দিতে দ্বিধা করেন নি; অপর দিকে সুভাষবাদী মানুষ গান্ধীকে ভণ্ড বলে প্রচার করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

সঠিক ইতিহাস কি, তা জানা দুরূহ ব্যাপার এই জন্যে যে, আমাদের দেশে ঐতিহাসিকের সংখ্যা নগণ্য। যাঁরা ইতিহাস লেখেন তাঁদের দৃষ্টি থাকে হয় শাসকদলের মনস্তুষ্টির দিকে আর নয়ত বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের নীতি প্রচারের দিকে। অর্থাৎ ঘটনাকে যথাযথ ভাবে বিবৃত করতে এবং পরিবেশের মাধ্যমে একটি চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে যে মোহহীন, নির্মোক দৃষ্টির প্রয়োজন তা আমাদের মধ্যে আছে বলে মনে হয় না।

গান্ধী-প্রভাবিত কংগ্রেস দল এবং গান্ধীর অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী অনুগামীর দল আমাদের রাষ্ট্র-শাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ায় এবং গান্ধীর অনুগামী নেতাদের মধ্যে সুভাষ-বিদ্বেষ মারাত্মক ভাবে সংক্রামিত হওয়ায় দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা চলেছে সুভাষের নামকে সংগ্রামের ইতিহাস থেকে মুছে দিতে। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগেও সে নামকে কলঙ্কযুক্ত দেখাতে চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। অন্যদিকে সুভাষবাদী দলগুলি মুখর হয়ে থেকেছে গান্ধীজীর নিন্দায়।

ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধীজি ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যে রাজনৈতিক মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, কিছু দলীয় মনোবৃত্তির মানুষ তার সুযোগ গ্রহণ করতে দ্বিধা করে নি।

আমাদের এক জনপ্রিয় নেতা রাজা গোপালাচারী সুভাষকে রঙচঙে ফুটো নৌকা বলে বর্ণনা করেছিলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম্ গ্রন্থে সুভাষচন্দ্রের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছিলেন—I also saw that Subhas Bose's escape to Germany made a great impression on Gandhiji.

অর্থাৎ যখন সমস্ত জাতীয় নেতৃবৃন্দ সুভাষের নিন্দায় মুখর, কোন কোন পরভৃত দল তাঁকে বিশ্বাসঘাতক কুইসলিঙ্ আখ্যা দিতেও প্রলুব্ধ হয়েছিল,—তখন কিন্তু দেখা গেছে গান্ধীজি নিজে সুভাষ সম্পর্কে বিস্ময়কর (?) মনোভাব পোষণ করেছেন। গান্ধীজীর এই মনোভাব তাৎক্ষণিক মুক্তকণ্ঠজাত নয়। মুখ হওয়ার মত আবেগ গান্ধীজির ছিল না। তাঁর মনোভাব যুক্তির দ্বারাই সর্বদা পরিমার্জিত হত।

সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, মত-পার্থক্য বা মতৈক্য এবং এই দুই মহানায়কের চিন্তা ও কর্মের তুলনামূলক আলোচনার মত পরিবেশ আজ সৃষ্টি হয়েছে বলেই এই অবতরণিকা।

একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হাত থেকে কোটি কোটি জনতার হাতে এনে দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। বিপ্লবী, তরুণ দলের রক্তাক্ত আত্মদানকে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন। অন্ততঃ ভারতের ইতিহাসে বুদ্ধ ও চৈতন্যের পর গান্ধীই প্রথম নেতা যিনি অন্যায় ও পীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সংঘবদ্ধ করেছিলেন। কোন রাজা লাভের আশায় নয়, ব্যক্তিগত লাভের মোহেও নয়, নির্যাতন এবং ত্যাগের পথে শুধুমাত্র অন্যায়ের প্রতিরোধে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মহাশক্তির পরিচয়। সুভাষচন্দ্র সে কথা স্বীকার করেই সশ্রদ্ধ চিত্তে বলেছিলেন—The service which Mahatma Gandhi has rendered to India and to the cause of India's freedom is so unique and unparalled that his name will be written in letters of gold in our national history for all time. প্রায় অনুরূপ শক্তি ও নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। মহাযুদ্ধের বিশৃঙ্খল ও বিপর্যয়কর পরিবেশে ভারতের বাইরে চলে গিয়ে এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের অধিকারী সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দক্ষিণ এশিয়ার মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির পতাকা তলে সংগঠিত করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের এই ব্যক্তিত্ব এত দুর্নিবার যে তা ইতিহাসকারদের কাছে বিস্ময়কর। ব্রিটিশ ডিপ্লোমাট ও জীবনীকার হিউটনের ভাষায়—For most the personality of the man was over whelming : there was a genius of enthusiasm, of inspiration. Men found that when they were with him only the cause muttered, they saw only through his eyes...could deny him nothing.

গান্ধীজি ভুল করেন নি। তিনি প্রার্থনা-সভায় বলতে দ্বিধা করেন নি যে, The lesson that Netaji and his army bring to us is one of self sacrifice, unity irrespective of class and community, and discipline. If our adoration will be wise and discriminating, we will rightly copy this trinity of virtues.. Then we will be able to

stand erect before the world.

জার্মানীতে যেন দুর্ঘটনায় (পরে জানা যায় যে এ সংবাদ মিথ্যা) সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তাঁর জননীর কাছে এক শোকবার্তায় গান্ধীজি বলেছিলেন—আমাদের গন্তব্যস্থান এক। এই কথারই পুনরুক্তি করে আমেরিকান সাংবাদিক লুই ফিশারকে তিনি বলেন—I regard Bose as a patriot of patriots। নীতির বিরোধিতা এবং চিন্তার স্বাতন্ত্র্য যে সত্যি সত্যিই তাঁদের মনে অশ্রদ্ধার ভাবকে উদ্রিক্ত করেনি তার পরিচয় অজস্র। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র গান্ধীনীতির কাছে পর্যুদস্ত হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার হানি ঘটেনি। ১৯৪৪ সালে মেক্সিকো ইন্সিটিয়াল ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের কাছে ভাষণ দিতে গিয়ে নেতাজী বলেছিলেন—In Gandhi there are two aspects—Gandhi as a political leader and Ganbhi as a philosopher. We have been following him in his capacity as a political leader.—Amar Lahiri—Said Subhas Bose. page 122. ঐ বক্তৃতাতেই তিনি বলেন—As a development of this struggle for freedom, India tried a new experiment—Civil disobedience or Passive resistance—of which the best exponent was Mahatma Gandhi... there is no doubt that it has greatly helped to rouse and unify the Indian people.....' Ibid page 116.

১৯৪৪ সালের ১২ জুলাই তিনি বললেন—The only other alternative plan···is that of Mahatma Gandhi embodied in the 'Quit India' resolution. If that plan succeeds, our plan and our activities will be set at naught. Hugh Toye—Subhas Chandra Bose. page 174.

অপর দিকে গান্ধীজির মনোভাব সম্পর্কে মৌলানা আজাদের মন্তব্য—Many of his remarks convinced me that he (Gandhiji) admired the courage and resourcefulness Subhas Bose had displayed in making his escape from India. His admiration for Subhas Bose unconsciously coloured his view about the whole war situation. Moulana Abul Kalam Azad—India wins freedom. page 40. অর্থাৎ তাঁর (গান্ধীজির) বিভিন্ন মন্তব্য থেকে আমাদের প্রতীতি জন্মেছিল যে, তিনি (গান্ধীজি) সুভাষ বোসের ভারতের বাইরে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে যে সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল তার প্রশংসাই করতেন। সুভাষ বোসের প্রতি তাঁর এই শ্রদ্ধার মনোভাব তাঁর অজ্ঞাতসারেই সমগ্র যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিকে অনুরঞ্জিত করেছিল।

গান্ধীজির এই মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলেই গান্ধীজির সেক্রেটারি শ্রীমতী সুশীলা ওয়ার্ধাতে গান্ধী আশ্রমে বসে সাংবাদিক লুই ফিশারকে বলেছিলেন—Bose was more

popular than Nehru, and in certain circumstances had stronger appeal than Gandhi. .. Louis Fischer—A week with Gandhi, page 23. বোস নেহরুর চেয়েও বেশী জনপ্রিয়, এবং কোন কোন অবস্থায় ভারতবাসীর কাছে তাঁর আবেদন গান্ধীজির চেয়েও বেশী শক্তিসম্পন্ন।

অর্থাৎ দুই নেতা—সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী যাঁদের পথ ও চিন্তা - তাঁরা পরস্পরকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে চিন্তা করেন। রাজনৈতিক মতবৈষম্য তাঁদের কাউকেই এই শ্রদ্ধার আসন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তাই সুভাষচন্দ্রকে তাঁর যোগ্য সম্মান দিতে গিয়ে মহাত্মাকে যাঁরা হেয় করেন, তাঁরা যেমন বিভ্রান্ত, গান্ধীজিকে বড় করতে গিয়ে নেতাজীকে যাঁরা ছোট করেন, তাঁরাও তেমনি বিভ্রান্ত। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসের পুরাণ পুরুষ এই দুই মহানায়কের জীবনের—কর্মপন্থা, চিন্তাধারা এবং রাজনৈতিক দর্শনের—তুলনামূলক আলোচনা হওয়া উচিত বলেই এই প্রবন্ধের সূচনা।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

১৯৫৫

গোঁসাই (হেমন্ত দাশগুপ্তের পুত্র) এক চিঠি দিয়াছে ও আমার সেবার জন্য ৫৲ টাকা পাঠাইয়াছে। গীতার ভুল ব্যাখ্যায় সে মানসিক অশান্তিতে আছে, আমার ভাষ্য তাহার ভাল লাগিয়াছে। হরিদাসী তাহার বি-কে দিয়া বৌকার ভাসনা ও হালুয়া সন্ধ্যার পর পাঠাইয়া দিয়াছে। ৭ই অক্টোবর

ঠাকুর, তোমার আশীর্বাদে উষাঙ্গিনী জীবনের সঙ্গিনী হইয়াছিল। সে জীবনে কোনদিন পরনিন্দা পরচর্চা করে নাই। পরের কথায় মধ্যে সে নাই। হাসিমুখে সকলের জন্য করা তার একটি দেখিবার জিনিষ। বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছি বাবা সে দেহ নাই। কোনও দিন ইহা লইয়া অভিযোগ করে নাই। সমস্ত অলংকার কংগ্রেসের সেবায় বরিশাল কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি তারিণীকুমার গুপ্তের হাতে দিয়া দিয়াছি। কোনও দিন দুঃখ করিতে শুনি নাই। ছেলেপুলে নিয়া অনেক খাওয়া-পরার দুঃখ সে পহিয়াছে। সে জন্য বিরক্ত বা হাঙ্গামা কোনদিন সে করে নাই। দিনরাত্রি সংসারের সমস্ত কাজ সে একা করিয়াছে। বাবাকে (মা তখন নাই) ফেলিয়া তাহার ছোট দুই ভাইবোনের বিবাহেও সে শ্রীনগর যায় নাই। আমার ৪ বড় ভাই-বৌর সেবা প্রাণ খুলিয়া করিয়াছে। তবে সে নিজ ব্যক্তিত্বদ্বারা অপরের ত্রুটি বিচ্যুতি

দেখিয়া কখনও সংশোধনের জন্য কড়া কোন ব্যবস্থা করিতে পারিত না। সে নিজে ছিল অত্যন্ত ভাল মানুষ। তাই আমি বলিতাম, 'তুমি বৈকুণ্ঠে যাইবে, কিন্তু গোলোকে যাইতে পারিবে না'। অপরকে ভাল করিতে হইলে যে শাসন করা প্রয়োজন তাহা সে করিতে পারিত না। তাহার মিষ্টি ব্যবহারের সুযোগ তাই সকলে নিতে চাহিত। সে ক্ষেত্রে আমি ছিলাম তাহার রক্ষক। তোমার স্নেহ অক্ষুণ্ণ হউক। মিনু কুমারসহ বীরেন ডাক্তারের বাসায় যায় প্যাণ্টের কি গোলমাল হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করার জন্য। রেণু ভাতে ভাত খাইয়া বাহির হয়, কেরে সাটার পর। আমিও সকালে আজ ভাত ভাত খাই। সকাল ৮ পর কিশোর চক্রবর্তী আসে। ২ ঘণ্টা মত থাকে। ঠাকুর নাকি তাহাকে অস্পৃশ্যদের মধ্যে কাজ করিতে বলিয়াছেন হালপাতালে থাকিতে। সে লাল কাপড় পরিতে পারে, তবে সন্ন্যাসী হইবে না। আমি বলিলাম, যে-সামাজিক ক্ষেত্রে দার্শনিক বিপ্লবের কথা তিনি তাঁহার জাতি-দর্পণে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা ছড়াইয়া না দিলে অস্পৃশ্যতা দূর হইবে না। বুদ্ধ হইতে গান্ধীজী পর্যন্ত কেহ বর্ণাশ্রমের ভিত্তি টলাইতে পারেন নাই। চাই সর্বাগ্রে ভিত্তি বদলানো। এই বয়সে কি আদিবাসীদের মধ্যে থাকিতে পারিবে? ৮ই অক্টোবর

ঠাকুর, তুমিই সর্বপ্রথম নির্গুণা ভক্তির কথা এমন স্পষ্ট করিয়া লিখিলে যাহার ভিতরে তামসী রাজসী সাত্ত্বিকী ভক্তিরও সমাবেশ রহিয়াছে। সগুণা ভক্তি self-centred, আর নির্গুণা ভক্তি পুরুষোত্তম-centred। পুরুষোত্তম যেমন সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের সমন্বয়ে নির্গুণ, তাঁহার প্রতি ভক্তিও গুণত্রয়সমন্বয়রূপিণী। 'অপ্রাকৃত সৎ সংস্রবে প্রাকৃত অসৎকর্মও সৎ কর্মে পরিণত হয়'—তোমার এই লেখাদ্বারাই তো রজোগুণের তমোগুণের দিবাস বিধান করা হইয়াছে। তুমি আশ্চর্য মোহন যাদুকর, তোমার স্পর্শে এই জগৎটা কি দিব্যরূপে উদ্ভাসিত হইল! এমন তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ! ভাবিলে বুক গৌরবে ভরিয়া উঠে। আমাকে তোমার মত করিয়া লও। তোমার জীবন আমাতে জমিয়া উঠুক, সেই জীবনের ছোঁয়াচ দিয়া সব জীবনকে ভগবত জীবনে গড়িয়া তুলিব। মানুষকেই তো ভালবাসিতাম। মানুষকে তোমার ভাবে ও রসে গড়িয়া তুলিব—ইহাই বুঝি ছিল আমার সারা জীবনের সাধনা। 'মানুষ' 'মানুষ' করিয়া পাগল হইলাম, একাকার হইতে চাহিলাম। তাহাদের পাইলাম কৈ? 'ভগবান' 'ভগবান' যতখানি করিয়াছি, তাহার চেয়ে বেশী বুঝি 'মানুষ' 'মানুষ' করিলাম। মানুষকে প্রাণ ঢালিয়া পাইতে চাহিয়াছি। তুমি ছিলে আমার বুকের মধ্যে। তোমাতে মানুষে এক করিয়া ভাবিতে ও ভালবাসিতে চাহিয়াছি। তোমার জয় হউক। মীনু ১০টার পর আসে। ৫টায় পাঠ হয়। মীনু গান করে। ঝিনু আসে, বই দিয়া যায়। আজিকার পাঠে তেমন লোক হয় নাই। জগদীশবাবু, বিলাসবাবু, সতীন্দ্র ও তাহার স্ত্রী আসে। 'রাধাই পরা প্রকৃতি, পরা শক্তি' অংশ পাঠ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব আলোচনা হয়। যে সংসারে পিতা-মাতার ঝগড়া সেই সংসারে সাধুর বাড়ি আসে না—এই আলোচনা হয়। প্রস্রাবের উদ্বেগটা বাড়িয়াছে। পাঠের পর নগেন মুখার্জীর

পুত্র সন্ন্যাসী ও তাহার ভাই আসে।...পাঠে 'অখণ্ডে'র কথা হইতেছিল। দুই রকমের 'অখণ্ড'। খণ্ডহীন অখণ্ড। হিন্দুরা কাপড় কাটিয়া টুকরা-দ্বারা প্রস্তুত জামা ব্যবহার করে না। এ দেশ তাই অখণ্ড ব্রহ্মের উপাসক। কিন্তুআর একটি 'অখণ্ড' আছে। অংশ-প্রসবিনী প্রকৃতির অনন্ত অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ খণ্ডগুলিকে সমন্বিত করিয়া অখণ্ড ব্রহ্মভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য যে অনন্তকাল ধরিয়া প্রচেষ্টা, তাহাই ভক্তিযোগের উদ্দেশ্য। এই প্রচেষ্টায় অখণ্ড বিশ্ব গড়িয়া উঠে। এক দিকে অখণ্ড ব্রহ্ম, অপর দিকে অখণ্ড বিশ্ব। এই দুই অখণ্ডের সমন্বয় সাধনাই বর্ত্তমান যুগ-সাধনা।

২ই অক্টোবর

ঠাকুর, আমি সারা জীবন আগাইয়া গিয়া মানুষের সমস্যার সাথে জড়িত হইয়াছি, তাহাদের সুখদুঃখের খোঁজ নিয়াছি, অংশীদার হইয়াছি। মানুষের যেন ইহা পাওনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিন যদি কোন কারণে খোঁজ খবর নেওয়া না হয়, তাহারা 'অভিমান' দ্বারা আমাকে আহত করে। কৃতজ্ঞ হওয়ার কোন কথা নাই। কোন গুরু এমন করিয়া আগাইয়া গিয়া শিষ্যের দুঃখ মাথা পাতিয়া নেয়? অথচ ইহা নিয়াই ঝগড়া। আমার জীবন আজ দুর্বিসহ বিশেষ কোনও কারণে যাহা আদৌ বৈষয়িক নয়। মানুষকে সুস্থ রাখিতে গিয়া মানুষের সঙ্গে আমার ঝগড়া। এমন কপালই আমার! ...সারা জীবন আত্মমর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছি। মানুষের কথার—বাচিক বা কায়িক অপমানের—জীবন দিয়া জবাব দিয়াছি। একবার রামচন্দ্রপুর (বরিশালে) বড়দিদির ওখানে যাই। ভাগিনেয় জিতেন শুধু প্রণাম করে নিজ বাড়ীতে পাইয়া। আমি বলিয়াছিলাম, মামাকে মামাবাড়ী গিয়া প্রণাম করিও। আমার দিদিকে আমি প্রণাম করিতে আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া জিতেন বলিয়াছিল, 'মামার মাথা খারাপ'। ইহার পর আর তাহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করি নাই। দেশসেবার মধ্য দিয়া যখন বরিশালে প্রতিষ্ঠিত হই, যখন আমার ভাগিনেয় বলিয়া পরিচয় দিতে তাহারা গর্ববোধ করিতে লাগিল, তখনই শুধু তাহাদের বাড়ী প্রবেশ করিয়াছি। বলতো কাহারও সঙ্গে করি নাই, মাথাও নোয়াই নাই। ঠাকুর, তোমার গর্বেই আমার গর্ব। নলিনী মানে বেলেঘাটা হইতে ডালিম সহ।...রেণু সমস্ত হইতে ব্লক আনিয়া কিরণ ল্যাম্প ঘুরিয়া ২৪টায় খাইয়া আবার বাহির হয়। ফেরে ৭টায়। আজ বিজ্ঞাপন সংগ্রহ একরূপ শেষ হইল। রেণু প্রবোধ ভৌমিকের (বঙ্গবাসী কলেজ) সঙ্গে দেখা করে। বিজ্ঞাপন সংগ্রহে রেণু 'অসাধ্য সাধন' করিয়াছে। ঠাকুর সর্ব ক্ষেত্রে এক অসাধ্য সাধন'-এর যোগ লিখিয়াই গিয়াছেন। তাঁহাকে বুকে করিয়া চলিলে রেণু অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে। ৮ বৎসর উজ্জ্বলভারত চালানো একটি 'অসাধ্য সাধন'। নিতাগোপাল আমার চিরজীবী হউন, সোনার মানুষ আমার, সর্বস্ব আমার!

১০ই অক্টোবর

ঠাকুর, কি অসাধ্য সাধন যে তুমি আমার জীবনে করিয়াছ তাহা ভাবিলে অবাক হই! কোন্ মানুষকে দিয়া তুমি কি করিয়াছ? আমি সংস্কৃত শাস্ত্রের কি জানি? অথচ আমার জীবনে তুমি একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন প্রকাশ করিয়াছ। কোথা হইতে পাণিনির 'মানা' শব্দের অর্থ বয়ঃইষ্ দিলে!

'আর অধিও পূর্ণ'—এই ছোট তত্ত্বটুকু যে তোমার পুরুষোত্তম-দর্শনের ভিত্তি তুমি, তুমি তাহা প্রকাশ করিলে। কোথা হইতে কি আনিয়া যে একত্র করিলে আমি কি তাহা পারিতাম? শুধু তুমি, শুধু তুমিই ইহা পার। মনে হয় যেন, যে কোন সুসঙ্গত প্রশ্নের উত্তর আমি তোমার এই দর্শনের আলোকে দিতে পারি। অথচ ইহা চলিবে না, হইতেই পারে না। চলিবার যারা বুকের রক্ত দিয়া দিয়া গেলাম। আর একটি অপরাধ সাধন করিয়াছি। প্রত্যেক মানুষটিকে পাইতে হইলে, সব দিক বজায় রাখিয়া পাইতে হইলে যে তাহার আবেষ্টনকে পরিপাক করিতে হয়, ইহা আমি জীবন দিয়া পরীক্ষা করিয়াছি। কাহাকেও আবেষ্টন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাইতে গেলেই 'error of omission' আসে, আবেষ্টন বিপ্লব হইয়া উঠে। নিত্যনিরঞ্জনানন্দের পক্ষে প্রতিভাকে পাইতে যে কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি হইয়াছিল, আমার পক্ষে তাহা হয় নাই। যোগমায়ার কৃপা আমার উপর আছে। সমগ্র বিশ্বকে সঙ্গে লইয়া কোনও কিছু পাইতে সাধনা করাই যোগমায়ার উপাসনা। বুঝিয়াছি, 'রেমে তয়া আত্মরতঃ আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ' এই বাক্যের সার্থকতা। রেণু ১১টার পর যাইয়া প্রেসে যায়, ফেরে সন্ধ্যায়। তাহার পর ডাক্তার সি, সাহার ওখানে যায়, Teucrium m. v. 12 আমার ব্যবহার করে। শুধু নিয়া আসে। উদ্ভোধনের কাভারে ১—এর সংখ্যার স্থানে ৯ম ছাপা হওয়ায় কাভার সোনালী রঙে শুদ্ধ করিয়া ছাপানো হয়।...মিনুকে তাহার অবস্থা ও তাহার সাধনা সম্বন্ধে কিছু আমি বুঝাইতে পারি নাই। সন্ধ্যার উপেন বসু আসে, যোগাযোগী আনে, পত্রিকার ৪৲ টাকা দেয়। নিত্যগোপাল দর্শনে জীবনের ১৷৷. টাকা ও আমার ফলের জন্য ১৷. টাকা দিয়া যায়। আসিবার জন্য বলিয়া দেই। ১১ই অক্টোবর

ঠাকুর, আর তো মানুষের সঙ্গে কথা কহিয়া পারিতেছি না। তাহারা 'অভিহিতেঽর্থে বক্তুরভিপ্রায়াৎ অর্থান্তরকল্পনা বাক্ছলম্' এই নীতির আশ্রয়ে ছলের আশ্রয় করে। আমার অভিপ্রায় কেহ বুঝিল না। তাহারা দশ্যের স্তর, পরিচ্ছন্নতার স্তরে দাঁড়াইয়া কথা কয়, আমি নির্গুণের স্তরে, সমগ্রের স্তরে দাঁড়াইয়া কথা কই। কি যে কষ্ট হয় তাহাদিগকে বুঝাইতে তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। কথা বন্ধ করা ছাড়া আর আমার গতি নাই। সম স্তরে না হইলে কথায় হয় শুধু তর্ক। এখন আমার নির্দেশ দেওয়া ছাড়া গতি নাই। বুঝাইতে যাওয়া আমার পক্ষে বিড়ম্বনা। ব্যাপক দৃষ্টি যাহাদের নাই, যাহারা নিজের standpoint-ই শুধু দেখে, যাহারা কোন কিছুতে আটকাইয়া আছে, তাহাদের সঙ্গে আমার আলোচনা ব্যর্থ প্রচেষ্টা। কথায় শুধু কথা বাড়ে, তিক্ততার সৃষ্টি হয়। বিনতী অনুগত সন্তানের মতন ব্যক্তির সঙ্গেই কথা কওয়া আমার চলে। কাহাকে আমার কথা বুঝাইতে পারিয়াছি? তাহারা ঝুঁকি নতুন কথা বলে, আমি তাহাদের কথা বুঝি না। অথচ ব্যাপারটা আসলে উল্টা। ঠাকুর, যাহা কিছু আমার কল্যাণকর, তাহা করিও। রেণু ৯৷ টায় প্রেসে যায়, ফেরে ২৷.টায় পর। খাওয়ার পর আবার যায়, ফেরে ৮টার পর। ১০খানা উদ্ভোধন নিয়া আসে। কাল বাকী পাওয়া যাইবে। মিনু সকালে দক্ষিণেশ্বর গিয়া মাকে নিয়া আসে। আজ প্রতিভার মায়ের

অন্ধতিথি, অমৃতী ডোপ দেয়। কি হাড়ভাঙ্গা খাটুনিই না রেণু খাটে। আমার এখানে কাহারও শুইয়া থাকা হয় না। উজ্জ্বলভারতের দিনরাত্রির কাজ। একটা up-hill-work লইয়া পড়িয়াছি। একটা নূতন culture প্রবর্ত্তন করা কি যে সে কথা? তবুও তো একটা পথ খুলিয়া যাইতেছে। মানুষ appreciate করে। ধন নাই, জন নাই, তবুও তো চলিয়াছি। আমি এই পত্রিকা একদিন সবার সামনে গিয়া দাঁড়াইবো। সমস্তরের লোক না হইলে কথাবার্ত্তায় রস হয় না। অনর্থক তর্ক। ১২ই অক্টোবর

ঠাকুর, তোমার বিশ্বরূপ জীবনের স্পর্শ পাইবার পর হইতেই বিশ্বসেবার জন্য একটা তীব্র লালসা অগ্রেত হয় আমার অজ্ঞাতসারে। বরিশালে অতীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'আশ্রম'-এ প্রথমদিন ঐ বিশ্বকল্যাণ সভার অধিবেশন হয়। ইহার পর ঐ সভায় সভ্যদের বাড়ী বাড়ী অধিবেশন হইত। আমার একটি ছবি ভাল লাগিত—যাহা কোনও কাপড়ের মিলে প্রস্তুত কাপড়ের ঈশর ছিল—'একটী লোক এই বিশ্বকে ঠেলিতেছে'। বিশ্বটাকে তোমার আদর্শে গড়িয়া তুলিবার নেশা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। অশ্বিনীবাবু পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, 'বিশ্বকল্যাণ' সভা। বুঝি ঐ নাম পছন্দ করিতেন না। বিশ্বকল্যাণ! এত বড় দুঃসাহস! কিন্তু কি করিব? আজও তো সেই দুঃসাহস যেমন তেমন রহিয়াছে। সভার সভ্য—সুরেশ গুপ্ত, অতীনবাবু, হেমন্ত দাশগুপ্ত, বিমলা দাস, সুরেন্দ্র ঘোষ, সতীশ দাশ, সুধী সেন, আমি প্রভৃতি। আমিই বেশীর ভাগ বলিতাম। কলিকাতায় গড়িয়াছিলাম 'সত্যব্রত সমিতি'। সত্যব্রত তখন তাহার মাতৃগর্ভে। রাধাদাদা বলিলেন, "এবার তোমার পুত্র হইবে, তাহার নাম রাখিলাম 'সত্যব্রত'। এই সত্যব্রতের নামেই সত্যব্রত সমিতি নামকরণ হইল"। ১২ জন সভ্য ছিলেন। এই সমিতির কয়েকজন সভ্য মিলিয়া ঠাকুরের কাছে একবার যাই। ঠাকুর শুনিয়া খুশি হন। বলিলেন, 'বিবেকানন্দ এই রকম সভা করিত'। সভ্যদের নাম উমেশ চক্রবর্ত্তী, অনন্ত সেন, আমি, রেবতী সেন, প্রবন্ধ কবিরাজ, উপেন্দ্র গুপ্ত, দেবেন্দ্র দত্ত, রমেশ কর, শরৎ সেন, মধু ভট্টাচার্য্য, যষ্ঠী ঘোষ, হেম গাঙ্গুলী। ১০৭ নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে সভা হইত। তুমি—তুমিই আছ আমার জীবনে, ঠাকুর! রেণু ও কুমার প্রবোধ ডোমিকের ওখানে যায়। ...৪০ কপি বোধহয় বিক্রয় আর হইল না। ১৬ কপি দিয়া আসিয়াছে। রেণু কারবালা ট্যাঙ্ক লেনে সুধীর দাশগুপ্তের বাড়ীতে যায়। ফেরে ৯৯.টায়। জয়া আসে সন্ধ্যায়। সে আমার আলোচনা বোঝে না বলিয়া ভাবিবার আসে না। কি দুঃখ আমার। আমাকে ভালবাসিলেও তো আসিতে পারিত। উজ্জ্বলভারত ৭০০ সংখ্যায় দিয়া যায়। ৪০ খানা কুমার নিয়া আসে। রেণু কাল ১০ খানা আনিয়াছিল। ১৩ই অক্টোবর

ঠাকুর, 'সত্যব্রত সমিতি'-র পর 'ব্রজ-মোহন বিদ্যালয়'। সেখানেও থাকা হইল না। হরেন মুখার্জী মাইনরকে লইয়া কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গোলমাল সুরু হইল। হরেনবাবু ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতেন না। পড়াইবার যোগ্যতা তাঁহার ছিল. তিনি যে-সে করিয়া কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন হইলেন। ব্রজ-

মোহন বিদ্যালয়ের সব শিক্ষক একযোগে কর্তৃপক্ষের কাছে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। তাঁহারা যখন এ বিষয়ে তেমন অবহিত হইলেন না, তখন আমি পদত্যাগ করিয়া পথে দাঁড়াই। আর পরের চাকুরী করি নাই। হরেনবাবুকেও অবশ্য চাপে পড়িয়া কর্তৃপক্ষ সরাইতে বাধ্য হইলেন। তাহার পর কংগ্রেস। প্রাণ ঢালিয়া কাজ করিয়াছি। স্বরাজ পার্টির সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ, বরিশালে সতীনবাবুর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ। ছাড়িলাম কংগ্রেস। গড়িলাম কংগ্রেসের পালটা 'স্বরাজ-সেবক সঙ্ঘ' ও ভাশনাল স্কুল। জনসাধারণের কাছ হইতে স্বরাজসেবক সঙ্ঘ কংগ্রেস অপেক্ষা বেশী টাকা ও মুষ্টির চাউল পাইত স্বরাজ-সেবক সঙ্ঘও ছাড়িলাম সুরেশ গুপ্ত ও দুর্গামোহন সেনের সঙ্গে মতদ্বৈধতায়। ইহার মধ্যে কলিকাতায় গৌরাঙ্গ-গোষ্ঠী স্থাপন করি ২ নং বা 6 নং রাজা লেনে। তাহার পর সন্ন্যাসী হই। বৃন্দাবনে যাই, ২৪. বৎসর সেখানে থাকি। পরে গড়ি নরনারায়ণ আশ্রম। কত গড়িলাম, কত ভাঙ্গিলাম তোমার মুখের দিকে চাহিয়াই তো। ওগো আমার বিপ্লবের দেবতা, ভাঙ্গা-গড়ার ঠাকুর, আমার জীবনে বিপ্লব জয়যুক্ত হউক। মহানির্বাণ মঠে কর্তৃপক্ষ নিয়া গেল শুশ্রূষার্থিকীর জন্য। সেখানেও স্থান হইল না। কোথাও আমার স্থান নাই। তুমিই আমার 'স্থানম্ নিধানম্ বীজমব্যয়ম্'। কুমার রেণু সোপো বাগুইআটী যায় সিমেন্ট সরাইবার জন্য। সিমেন্ট জমিয়া গিয়াছে জলীয় হাওয়া লাগিয়া—রেণু বলিল। কেরে ২টার পূর্বে। বিলগুলি লেখা হয়। কুমারকে তাহার দেহ, বর্তমানে এখানের আর্থিক অবস্থা সব বলা হয়। ঐ শরীর লইয়া কাজ করা সঙ্গত নয়। উদ্ভোধন-ভারত গ্রাহক ডাকে দেওয়া হয়। ১৪ই অক্টোবর

মা, তোমার আশীর্বাদে আমি কৃষ্ণ পাইয়াছি, গৌর পাইয়াছি, নিতাগোপাল পাইয়াছি। তোমার কোলে আছি বলিয়াই এত ঝঞ্ঝাট জটিলতার বুক চিরিয়া আগাইয়া আসিতে পারিয়াছি। কোথাকার মানুষ কেমন করিয়া বর্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছি। ভাবিলে অবাক হইতে হয়। এত জটিলতার মধ্যে কি আদর্শ রক্ষা করিয়া চলা সহজ হইত যদি না তুমি সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে। তুমি আদর্শে, তুমি বাস্তবে, তুমি দেবত্বে, তুমি অসুরত্বে।···তুমি কামাখ্যা, কায় তোমার স্পর্শে দিব্য। ওগো বিপরীতরতাতুরা, সকল বিপরীতের মধ্যেও তুমি রত ও আতুরা। তোমার বিশ্ব কি মোহন মধুর! এমন সত্য শিব সুন্দর বিশ্বকে জীব তাহার পরিচ্ছিন্ন মন-বুদ্ধির ঐকদেশিক স্পর্শদ্বারা মলিন বিকৃত করিয়াছে। ওগো পরা শক্তি, পরা বুদ্ধি, পরা মন, পরম দেহ, আমি শক্তিময় হইয়া, তোমাময় হইয়া তোমাকে, তোমার বিশ্বকে আস্বাদন করিব। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা। ১০৪.টার বিশ্বনাথ মণ্ডল আসে, তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া বেশ লাগিল। বেশ বুঝিবার ক্ষমতা আছে। নিতাগোপালের তত্ত্ব বোঝে।···আমার লেখা খুব পছন্দ। পরিকল্পনার জন্য অর্থ আদায় করিতে একটি রসিদ বই নিয়া যায়। দুধ-খই খাইতে দেওয়া হয়। মিনুকে সন্ধ্যার পর নিতে আসে। যাওয়ার খরচ বাবদ ১৫৲ টাকা ও তাহাকে ২৲ টাকা দেওয়া হয়। আরও কিছু পত্রিকা পোষ্ট করা হয়। Teucrium 12 খাবার পর প্রস্রাবের উদ্বেগ করিয়াছে। ১৫ই অক্টোবর

ঠাকুর, চিরকাল তোমার কৃপায় গৌরবোজ্জ্বল জীবন যাপন করিয়াছি। তাহাতেও অপমান বা অনাদর করি নাই, প্রতিবাদ করিয়াছি অথচ বিবাদ করি নাই। সঙ্গত কথা বলিতে কাহাকেও ভয় করি নাই ; অথচ মর্যাদা লঙ্ঘন করি নাই। সকল বড়দের সঙ্গে দেখা হইয়াছে কখনও পথে, কখনও আমার বাড়ীতে। জপ করিয়াছি মহাপ্রভুর সেই মন্ত্র, 'তব ব্রহ্মা আসিবেক আমার দুয়ারে'। মহাত্মাজী দুইবার আমার বাড়ী গিয়াছেন। প্রথম-বার আমার প্রথমবার জেলে যাওয়াকালীন ১৯২১-২; দ্বিতীয়বার যখন সতীন সেন কংগ্রেসের সেক্রেটারী। মহাত্মাজী বরিশালে আসেন, আমি স্টীমার ঘাটে যাই। দূর হইতে দেখি। সতীন সেন অবশ্য তাহার দেওয়া অনুমতি-পত্র নিয়া যাইতে বলিয়া-ছিল। আমি যাইব কেন অপরের ছাড়পত্র লইয়া ? মহাত্মাজী কিন্তু অশ্বিনীবাবুর বাসা হইতে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি গেলাম। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া দুইবার সতীন সেন কর্তৃক পথে বাধাপ্রাপ্ত হই। শেষে যাইতে পারি। মহাত্মাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কিসের বিরোধ ? বলিলাম, উঁহারা end-কে সত্য স্বীকার করে, আমি means-এর উপর বেশী জোর দেই। বিরোধের ইহা মূল কারণ। আরও বলিলাম—তুমি তোমার নিজের মতবাদের মূল নষ্ট করিতেছ – I shal fight with Gandbi in order to maintain his Gandhism। মহাত্মাজী হাসিলেন। শেষে বলিলাম, তুমি আমার বাড়ী যাইবে না ? হাঁ, যাইব, আমার প্রোগ্রাম শেষ করিয়া যাইব। পরের দিন স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ পরিদর্শন করিয়া আমার বাড়ী যান। আমার দাদা বলেন, আমার ভাইকে আশীর্ব্বাদ করুন। হাসিতে হাসিতে মহাত্মাজী বলেন, 'আপকা ভাই হামারা সাথ লড়াই মাফতে হার, কৈসে আশীর্ব দেঙ্গে' ? কি মিষ্টি করিয়াই যে বলিলেন, আজও প্রাণে জাগে। এমনি করিয়া বড়দের স্নেহ পাইয়াছি। ৫টায় পাঠ আরম্ভ হয়। ললিতবাবু প্রারম্ভিক ও শেষের গান করেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে কালীতত্ত্ব এবং মহানির্বাণ মঠ হইতে রাধাতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। 'গুরুর্ব্রহ্মা' ইত্যাদি শ্লোকে গুরু 'প্রত্যক্ষ' এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ব্রহ্ম 'অনুমান'। 'প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্' সূত্রে ইহাই আখ্যাদিত হইয়াছে। মঠ হইতে নীলরতন বাবু ও সেবানন্দ আসিয়া ছিল। জগদীশবাবু কালীচরণ সিংহ উপস্থিত ছিলেন। সুধাংশু ১১টার পর আসে, ১টাকা দিয়া যায়। ১৬ই অক্টোবর

ঠাকুর, তুমি নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে যে রাধা-ভাব প্রচার করিয়া গেলে, যাহা এ যাবৎ কেহ জানিত না, তুমি নিত্যগোপাল রূপে তাহারই দার্শনিক তত্ত্ব, রাষ্ট্রীয় বিপ্লবজনীন প্রয়োগ শিখাইবার কৌশল বলাইয়া দিলে। শ্রীরামকৃষ্ণ করিলেন 'কালীতত্ত্ব' প্রচার, তুমি করিলে শ্রীরাধাতত্ত্ব প্রচার যিনি কালী বিপ্লবময়ী, তিনিই মানবীয় মূর্ত্তিতে শ্রীরাধা। তোমারই লেখা, 'বৃষভানুপুরে আজ কালী কাত্যায়নী' জনম নিলেন কলাবতীর কোল আলো করিয়া। রাধাপ্রেম বিরুদ্ধধর্মময় : ইহাই তো সমন্বয়। রাধাভাবে পুরুষ-প্রকৃতি সমন্বয়, জড়-অজড় সমন্বয়, স্থিতি-গতি সমন্বয়, যোগ-ভোগ সমন্বয়, দেহাত্মবাদ-অধ্যাত্মবাদ সমন্বয়। শরণাগতি সাধনায় পুরুষভাব ও প্রকৃতিভাব দুই-ই পুরু-ষোত্তম-সেবায় সার্থক হয়, ভোক্তা-ভোগ্য 'একচুল

পুরুষোত্তম-সেবায় বিভোর হয়। তখন বিবিক্ত কেবল পুরুষ ও কেবলা প্রকৃতির অক্লান্ত মিলনে রাস-লীলা আস্বাদিত হয়। বিশ্বজীবনে তুমি জড়িত হও। কবে তোমাকে কোলে করিয়া বিশ্বের ভিতর বাহির জুড়াইবে? দুঃখ বাধা তোমার সমন্বয়-জীবনে যোগায় রস। বাধা অবাধ তোমার জীবনে সমন্বিত। রেণু ১২॥টার পর বাহির হয়। দমদম, প্রিন্সিয়ার প্রভৃতি স্থানে বিল ভাউচার কপি দিয়া ফেরে সন্ধ্যার পর। কুমারও বহু জায়গায় যায়। এখানে এত সুযোগ ছিল, সাহস প্রয়োগ করিলে কুমারের যাওয়ার কথা উঠিত না। ঘরে বাইরে কোথাও সে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে নাই। রেণুকে যদি সর্বতোভাবে relief দিতে পারিত—প্রুফ দেখা, অফিস সামলানো, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া, তাহা হইলেও চলিত। নয়নাগাবণ আশ্রমের বই ছিল, তাহা যদি লোকের কাছে পৌঁছাইতে পারিত, তাহা হইলেও তো হইত। শরীর মন দুই-ই তাহার ক্লান্ত। কোনও প্রেরণা নাই, উৎসাহ নাই। অবসাদ তাহার দেহে মনে। অথচ বাসন্তী তাহার জীবনের প্রকাণ্ড বাধা। এ বাধা লইয়া কেমন করিয়া চলিবে? সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হইলে রক্ষা পাইত।...১৭ই অক্টোবর

ঠাকুর, বাধা-অবাধ সমন্বিত এই বিশ্বকে চিনিয়া লওয়া তোমার কৃপা ছাড়া অসম্ভব। বাধা-স্বরূপিনী নারী কি বাধাই না সৃষ্টি করে। তাহাকে চিনিয়া উঠা দুষ্কর। সে যে মূর্তিমতী মায়া। প্রতি জীবনে মায়ার এই খেলা। পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটী ধারায় সে চলে। একদিকে সে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য রুদ্রাণীরূপে নিজেকে কর্তার উপর চাপায়, অন্য দিকে পাছে তাহার এই রূপ ধরা পড়ে তাই সেবিকার রূপে কর্তার মনোরঞ্জন করে। যাহারা ঝগড়াটে, তাহারা সেবাপরায়ণা হয়। এই সেবাপরায়ণা শুধু তাহার ঝগড়াটে রূপকে আড়াল করিবার জন্য। এই দুই রকমের কৌশল প্রতি জীবনে বিশেষ করিয়া নারী-জীবনে স্পষ্ট। পুরুষ ইহা না বুঝিয়া সেবায় গলিয়া যায় এবং দুর্দান্ত স্ত্রী তাহাকে বশীভূত করে ও নিজের দাবী বজায় রাখার আধার করিয়া লয়। পরিণাম ইহার অশুভ। পুরুষ ক্লৈব হয়, কামহীন হয়, এবং স্ত্রীগণও দুরাত্মা হয়। ব্রজলীলায় ইহার দর্শন উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং পুরুষোত্তম-জীবনে ইহার মীমাংসা দেওয়া হইয়াছে। তোমার আশীর্বাদে আমার এই দর্শন লাভ হোক। গোটা ৯-এর পর আশুতোষবাবু আসেন। থাকেন স্বামী শঙ্করী দেবীর। শ্রীমৎ নিগমানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। উদ্বোধন পড়িয়া ভাল লাগিয়াছে, দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা গুরুভায়েরা প্রতি রবিবার মিলিত হন। গত রবিবার আড়িয়াদহে মিলিত হইয়াছেন। বেশ ভাল লাগিল। গুরুভাইদের ভিতর কি আকর্ষণ! আর নিতাগোপালের? অনেক আলোচনা হইল। তিনিও hypothesis বদলাইবার কথা বলেন। কিন্তু দর্শন-ক্ষেত্রে একটী বিপ্লব না আসিলে যে সমন্বয় মানুষের কথায় প্রতিষ্ঠিত হইবে না, তাহা বলিলাম। কেয়াতলা হইতে অতুলবাবু আসেন, ১২॥টা পর্যন্ত কথা হয়। 'যত্রাস্তি ভোগঃ' ইত্যাদি শ্লোক বলিয়া কোলাকুলি করিয়া স্নানে যাই। কুসুমেরা আসিবে ১১॥টা হইতে

১২৪.টার মধ্যে। বেণু রান্না করিয়া শিয়ালদহ যায় তাহাদের আনিতে। ১৪. টায় গাড়ী আসে। ...অমরেশ আসে ১৪.টার পর। উষাঙ্গিনী. বেণু, প্রতিভা, মিনু ও গোপার জন্য কাপড় কিনিয়া আনে। আমার জন্য মিলের কাপড় আনে। বদলাইয়া আমায় জন্য বলিলাম। রাত্রি ৮টার পর খদ্দরের কাপড় লইয়া আসে। রাত্রিতে খায় ও যায়। ...১৮ই অক্টোবর.

ঠাকুর, তোমায় দর্শন ও জীবন বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে আলা আমার বুকের ভিতর অহোরাত্র জ্বলিতেছে, কাহাকেও তো বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার নির্বাণ ঘটিল না। আমার জ্বলুনি আমারই রহিল, সে যায় মত চলিয়া গেল। কাহাকেও তো বুকের নিকটতম প্রদেশে সমস্বার্থ ও সমভোগ করিয়া পাইলাম না। ভাবাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত ও দ্রব্যাদ্বৈত সাধনার ভিতর দিয়া কত জনকে বুকের ভিতর টানিয়া লইলাম, কেহ ভাবে ক্রিয়ায় দ্রব্যে অদ্বৈত হইতে চাহিল না, আসিল না। তোমায় প্রতিষ্ঠা হইল না আমা-দ্বারা। তুমি প্রতিষ্ঠিত একদিন হইবেই কেননা উহা ছাড়া বিশ্ব দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু আমাকে তো বস্ত্র করিলে না, আমি তো তোমাকে বুকে বহন করিবার শান্তি ও মুক্তির অধিকারী হইলাম না। এতদিনকার সব প্রচলিত hypothesis বদলাইয়া তাহারও পিছনে গিয়া তুমি আগাইয়া আসিবার 'যোগ' শিখাইয়াছ। তুমি বস্তু। সত্যরূপে তুমি দেখা দেও। সত্যে তোমায় আকার হউক। দেখা দেও, দিন যে যায়! দিন ফুরাইল, কবে আসিবে ঠাকুর সত্যরূপে? মানুষ পাইবার জন্য সারাজীবন পথে পথে কাঁদিলাম। কৈ, মানুষ তো পাইলাম না। সর্ব মানুষের ভিতর দিয়া তোমাকে ঘন করিয়া পাইবার উদ্দীপনায় না এতদিন ছুটিয়াছি? আর যে পারি না ঠাকুর। দেখা দেও, দেখা দেও। অমরেশ ১১৪. টায় খাইয়া নবদ্বীপ চলিয়া যায়। সে ১টার পর বাহির হয়। সুব্রত ১টায় আসে। সে কোহিনূর বাইবে শনিবার। মীনু D. A. বাবদ প্রাপ্ত ৯ টাকার মধ্যে একটাকা পাঠাইয়া দিয়াছে। গোকুলের স্ত্রী বনানী আসে ৩টার পর। বেণুর সঙ্গে দেখা হয়। বুধবার আসিবে বলিয়াছে ২টার পর। অমরেশ আমায় ফটো চায় ঠাকুরের পাশে বসাইয়া। অনেকক্ষণ ইহা লইয়া ভাবিলাম। ঠাকুরের পাশে বসাইবার অনুমতি কি আমি দিতে পারি? কোন্ অধিকারে ঠাকুরের পাশে বসিব? সে অধিকার আমায় তাঁহার 'প্রকৃতি' বলিয়া স্বীকৃতির অধিকার। ঠাকুর ভক্তজন সমক্ষে ঐ ভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, স্বপ্নেও উহা দেখিয়াছি। তখন প্রকট ছিলেন এবং তাঁহাকে উহা বলিয়াছি। তিনি যখন তখন যার তার কাছে ঐ স্বপ্ন বলিতে নিষেধও করিয়াছেন। ১৯শে অক্টোবর

ঠাকুর, আমি শেষের দিকে যে-সব চিঠি লিখিতাম তাহাতে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করি-তাম, 'নিত্যদাসী' ছিল আমার নাম। তুমি সেই চিঠি গুরুভ্রাতাকে পড়িতে দিয়াছ সকলকে শুনাইবার জন্য। বিশ্ববন্ধু (হরিপদানন্দ) আমাকে 'দিদিমণি' বলিয়া ডাকিত। একদিন বিশ্ববন্ধু কি তোমা দিবে, অথচ সেদিন আমার কলিকাতায় চলিয়া আসার কথা। তুমি বিশ্ববন্ধুকে ডাকিয়া বলিলে, 'বিশ্ববন্ধু, তোমার দিদিমণি যে চলিয়া

যাইতেছেন তোমার উৎসবের মধ্যে, তাহার কি হইবে'? বিশ্ববন্ধু বলিল, 'আমি বলিলে দিদিমণি থাকিবে'। প্রাণকৃষ্ণ আচার্য মহাশয়ের বাড়ীতে একতলায় 'বন্দেমাতরম্ ষ্টোরস' নামে আমার যে কাটা কাপড়ের দোকান ছিল, তাহার হিসাবের খাতায় আমার নামের পাশে দৈবচরণ সে (তোমার আশ্রিত) লিখিত, 'শরৎ কুমারী বসু'। সে তোমাকে 'বাবা' ডাকিত, তোমার প্রকৃতি বলিয়া আমাকে 'মা' বলিয়া ডাকিত। বৃন্দাবনে থাকা-কালীন কুমারের পিতা প্রিয়নাথ মৈত্র বলিয়াছিলেন, 'নিত্যগোপাল যদি গৌর, তবে আপনি গদাধর'। বরিশালে কালীপ্রসন্ন কর একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, আপনি হাটিয়া গেলে পিছনের দিক হইতে মেয়ে মানুষ বলিয়া মনে হয়। দীর্ঘ দিন তোমার প্রকৃতি বলিয়া নিজেকে ভাবিয়াছি। তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার প্রকৃতি। তুমি তোমার জীবন ও দর্শনরূপ যে বীর্য আমার মধ্যে আধান করিয়াছ, তোমার প্রকৃতি রূপে তাহাকেই সর্বস্ব দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়া বিশ্বের বুকে প্রকট করিব, ইহাই না আমার মুক্তি? তুমি তো তোমাকে প্রকাশ করিবে না, প্রকাশ করিব আমি—ইহাতেই তো আমার সার্থকতা। অমরেশ যে আমার ফটো তোমার পাশে বসাইতে আজ চাহিল, তাহার মূলে যদি এই সব না থাকে তবে কি অধিকার আমার আছে তাহার ঐ প্রস্তাব মানিয়া লইবার? আমি আপত্তি করিব না। ঐ রূপই হইবে। তুমি আমাকে যে অধিকার দিয়াছ, যত-দূর পারি সে অধিকারের মর্যাদা আমি রাখিব। সত্যব্রত তুমার পূজার কাপড়ের জন্য ১০৲ টাকা পাঠাইয়াছে। আমি মানুষকে সুযোগ করিয়া দিয়াছি। ধন দেই নাই, উহা আমার নাই। সত্যব্রতকে কারবার করিবার, নিত্যব্রতকে ঘড়ি মেরামত করিবার, তুকারামকে ছবি আঁকিবার, নন্দরাণীকে সেলাই শিখিবার, শেষকালে রেণুকে উদ্বোধন, বেদান্ত প্রভৃতি দিয়াছি। তুকা-রামকে ছবি শিখিবার জন্য আমার বন্ধু শরৎ ঘোষ, সুধীর বাবুকে বলিয়া দিয়াছিলাম। আজ সে ইডিও করিয়াছে। ২০শে অক্টোবর

এখনই দেখা যাইতেছে আমাদের সমস্ত নব্য উদ্যোগ সজীব হৃৎপিণ্ড-চালিত রক্তস্রোতের মত এক-বার বিশ্বের দিকে ছুটিতেছে, একবার আপনার দিকে ফিরিতেছে, একবার সার্বজাতিকতা তাহাকে ঘর-ছাড়া করিতেছে, একবার স্বাজাতিকতা তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতেছে। একবার সে সর্বত্বের প্রতি লোভ করিয়া নিজত্বকে ছাড়িতে চাহিতেছে আবার সে দেখিতেছে নিজত্বকে ছাড়িয়া রিক্ত হইলে কেবল নিজত্বই হারানো হয়, সর্বত্বকে পাওয়া যায় না। জীবনের কাজ আরম্ভ হইবার এই তো লক্ষণ। এমনি করিয়া দুই থাকার মধ্যে পড়িয়া মানবধর্মের সত্য পথটি আমাদের জাতীয় জীবনে চিহ্নিত হইয়া যাইবে এবং এই কথা উপলব্ধি করিব যে স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে এবং সর্ব জাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়, এই কথা নিশ্চিতরূপেই বুঝিব যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুক্ষিগত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।

—রবীন্দ্রনাথ

হে সুন্দর স্বয়ংপ্রকাশ

শ্রীশান্তশীল দাশ

রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে কত না সন্ধ্যায়
তোমাকে ডেকেছি আমি, হে সুন্দর,
আমার সে-ডাক
শোনো নি, পাইনি আমি তোমার প্রসাদ,
ব্যর্থ আমি হয়েছি কেবল ;
তুমি নেই, বারেবারে হয়েছে সংশয়—
কী বেদনা সে সংশয় মাঝে।

সেই কত যুগ হতে কত না মানুষ
করেছে তোমার আরাধনা,
দিয়েছে কত না অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে,
কত অঙ্ক, কত গান করেছে রচনা :
সেই কি শুধু অর্থহীন কল্পনা-বিলাস !
বেদনা-আচ্ছন্ন মনে জাগে প্রশ্ন :
তবে তুমি নেই, তুমি নেই !

মেনে নিতে চায় না এ মন,
আবার আবার সেই ফিরে যাই নিভৃত নিলয়ে,
হে সুন্দর, খুঁজে ফিরি বারবার সেখানে তোমায়।
মেলে না তোমার দেখা,
কী বেদনা হৃদয়ের গভীরে !

অন্ধকার রাত্রি শেষে ফিরে আসি রুদ্ধ কক্ষ হতে—
ম্লান দুটি আঁখি মেলে চেয়ে দেখি :
কী প্রণয় সমস্ত জগৎ, আলোকে উজ্জ্বল !
অসীম আকাশ হতে নেমে আসে
আলোকের ধারা,
উদ্ভাসিত সে-আলোকে চতুর্দিক—
বৃক্ষলতা, পত্রপুষ্প, তৃণখণ্ড, বিস্তীর্ণ প্রান্তর,
আনন্দের প্রস্রবণ দিকে দিকে
অজস্র উদার ;
সমস্ত সংশয় জাল ছিন্ন সেই আলোক ধারায় ;
কোথায় সংশয় !
কোথা সে বেদনা-বোধ মনের গহনে !
সুন্দরের প্রণয় প্রকাশ কী আনন্দময় !
অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে যে-সুন্দর ব্যাপ্ত এ জগতে,
তাকে খুঁজে ফিরি আমি রুদ্ধদ্বার কক্ষ মাঝে,
সঙ্কীর্ণ বেদীতে !

হে সুন্দর স্বয়ংপ্রকাশ,
তোমাকে প্রণাম করি, বারেবার তোমাকে প্রণাম

আমেরিকায় শ্রীকৃষ্ণ-অর্চনা

শ্রীসন্তোষ কুমার দে

সাত সমুদ্র তের নদী পারে সুদূর আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরের নিকট, ফ্লাশিংএ ৪৩৯ হেনরি স্ট্রীটের শান্ত পরিবেশে, সম্পূর্ণ গৃহ ভাড়ায় একটি ত্রিতল বাড়ীতে একটি হরেকৃষ্ণ মন্দির আমার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং সেখানে একদিন কাটিয়ে তাঁদের পূজা অর্চনা, ভোগরাগ কীর্তন আরতি সব কিছু দেখবারও সুযোগ পেয়েছিলাম—গত বছর (১৯৭৫) আগষ্ট মাসে, যখন আমি আমেরিকায় ছিলাম।

ও দেশের নিয়ম অনুযায়ী বাড়ির বেসমেন্ট অর্থাৎ একতলাটি মাটির তলায়, দোতলার ঘরগুলি রাস্তার সমান্তরাল, আর ত্রিতলটি রাস্তা থেকে দোতলা বলে মনে হয়। রাস্তার সমান্তরাল অর্থাৎ দোতলায় একটি প্রশস্ত ঘরে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি অতি শোভন সুন্দর একটি মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত। ফুল ও আলোক দিয়ে মন্দিরটি মনোরম করে সাজানো, ধূপের গন্ধে আমোদিত, পবিত্র স্নিগ্ধ। সারা বাড়ির দেওয়াল আমেরিকার ভক্ত শিল্পীদের আঁকা শ্রীকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদজী (A. C. ভক্তিসিদ্ধান্ত স্বামী প্রভুপাদজী) এবং তাঁর গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের রঙ্গিন ছবি দিয়ে সাজানো। আশ্রমে পূজা আরতি কীর্তন প্রসাদ বিতরণ, এমন কি মন্দির সম্মার্জনা, ভোগরন্ধন—সব কিছুই অতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছেন মুষ্যাধিক মার্কিন মেয়েরা ও দুএকজন কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো ভক্ত, শিষ্য এবং শিষ্যাগণ। একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদজী ব্যতীত অন্য কোন ভারতীয়ের সাক্ষাৎ মিলল না। প্রভুপাদজীও সেদিন এই মন্দিরে ছিলেন না। শুনলাম ১৩ই সেপ্টেম্বর আসবেন। তখন তিনি ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার তাঁদেরই আর একটি আশ্রমে। কে এই প্রভুপাদজী, যাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রভাবে আমেরিকার নারীপুরুষ এভাবে কৃষ্ণ-ভাবে ভাবিত হয়ে মন্দির আশ্রম বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেছে? প্রভুপাদজীর সাংসারিক নাম ছিল অভয় চরণ দে। ১৮৯৬ সালে কলকাতায় তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা স্বর্গত গৌরমোহন দে (১৮৪৯—১৯২০) ছিলেন একজন কৃষ্ণভক্ত নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। অভয় চরণ পিতার কাছ থেকেই রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ পূজায় অভিষিক্ত হন। বালক বয়সেই তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে কীর্তনে মৃদঙ্গ বাজাতেন। কলকাতায় এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে অভয় চরণ স্কুলে কলেজে ভালোভাবেই শিক্ষা লাভ করেন। যখন তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র তখন গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভের মোহ ত্যাগ করেন, কিন্তু তাঁর পড়াশুনা শাস্ত্র-

আলোচনা এবং রাধাকৃষ্ণ ভজনা চলতেই থাকে। ১৯১৮ সালে ২২ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি পারিবারিক ঔষধের ব্যবসায়ে লিপ্ত হন এবং এলাহাবাদে একটি ফার্মাসিউটিক্যাল লাবরেটারির পরিচালনার ভার তাঁর উপরে পড়ে।

১৯২২ সালে তিনি গৌড়ীয় মঠের শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর সংস্পর্শে আসেন। যদিও তিনি গৌড়ীয় মঠের সেবায় নানাভাবে সহায়তা করতেন তবু তিনি সেখানে শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হন। ১১ বছর পরে ১৯৩৩ সালে তিনি শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ঐ বৎসরেই গৌড়ীয় মঠে তাঁর গুরুদেবের জন্মতিথিতে তিনি একটি সভায় ভাষণ দেন এবং প্রকৃত আচার্যের স্বরূপ কি তা বিশ্লেষণ করেন। ১৯৩৬ সালে, অর্থাৎ আরও ১১ বছর পরে তাঁর পূজনীয় গুরুদেবের তিরোধান হয়। তখন তিনি তাঁর গুরুদেবের আরব্ধ কাজের ভার গ্রহণ করেন এবং পাশ্চাত্য দেশে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারের উদ্দেশে "Back to Godhead" নামক একটি পাক্ষিক ইংরাজী পত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই পত্রিকাটি তিনি নিজেই লিখে সম্পাদনা করে প্রকাশ করতেন। এই সময় হতেই তিনি বাড়িতে ছোট ছোট অধিবেশনে কীর্তন ও বৈদিক শাস্ত্র আলোচনা করতেন।

১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং গৃহ পরিজন স্ত্রী পুত্রাদি পরিত্যাগ করে শ্রীবৃন্দাবনে চলে যান। সেখানে বসেই তিনি ইংরাজীতে বৈষ্ণব শাস্ত্র গ্রন্থ অনুবাদ করতে থাকেন এবং কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তারপর তাঁর গুরুদেবের আরব্ধ কর্ম পাশ্চাত্যে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারের উদ্দেশে ১৯৬৫ সালে আমেরিকায় যাত্রা করেন। সেই থেকেই পৃথিবীর নানা দেশে মহাপ্রভুর ভাবধারা প্রচারে তিনি ব্রতী আছেন। তাঁর কাছ থেকেই আমেরিকা প্রথম মহাপ্রভুর বাণী শুনতে পায়। তাঁর সঙ্গে ছিল শ্রীবৃন্দাবন হতে নেওয়া মহাপ্রভুর একখানি চিত্র—চিত্রখানি তিনি নিউইয়ার্কে তাঁর ক্ষুদ্র বাসগৃহে অতি সমাদরে প্রতিষ্ঠা করে তার পাদমূলে বসেই নাম গান করতেন এবং সমাগত ভক্তদের কাছে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর গুণগ্রাহীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ এই তপস্বীর পূত প্রভাবে ধীরে ধীরে একটির পর একটি হরেকৃষ্ণ মন্দির গড়ে ওঠে। ১৯৬৬ সালে তিনি Iskon অর্থাৎ International Society for Krishna Consciousness নামক একটি আন্তর্জাতিক সমিতি স্থাপন করেন এবং সেই সমিতির উদ্যোগে পৃথিবীর নানা দেশে হরেকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু আমেরিকায় আছে ১৯টি আশ্রম, কলকাতায় ছয়টী, আফ্রিকায় চারটী, এশিয়ায় দশটী (তার মধ্যে কলিকাতায় একটী), দক্ষিণ সমুদ্রতীরের বিভিন্ন দেশে সাতটী, ইউরোপে এগারোটী আর লাটীন আমেরিকায় এগারোটী। এখন মোট ৭৮টী আশ্রম চলেছে। এ হিসাব ১৯৭৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত। অদূর ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে, সঙ্গে গড়ে উঠবে আরও আশ্রম। অনেক আশ্রমে আবার গুরুকুল প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছোট ছোট শিশুদের জন্য নিয়মিত বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। তা ছাড়া প্রত্যহ

বিকালে প্রত্যেক মন্দিরে শাস্ত্র-আলোচনা করা হয়। প্রত্যেক রবিবারে এবং বিশেষ বিশেষ তিথিতে বৈষ্ণবাচার্যদিগের জন্মদিন ও তিরোধান তিথি পালিত হয়। তখন উৎসবে সমাগত ভক্তবৃন্দকে প্রচুর পরিমাণে, একেবারে যাচাই করে, প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এখানে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থার কথা একটু বিশদ ভাবে বলছি। বিশুদ্ধ চিত্তে পবিত্র ভাবে সংগৃহীত নানা নিরামিষ উপচারে ঠাকুরের ভোগ রান্না করা হয়। রান্না করা অন্ন ব্যঞ্জনাদি ব্যতীত কাঁচা ফলমূলাদি এবং শুকনা পেস্তা বাদাম কিসমিস আখরোট প্রভৃতি, এমন কি নানা প্রকার সুগন্ধি ও তৃপ্তিকর পানীয়ও ঠাকুরের ভোগে দেওয়া হয়। সেই সব উপচার প্রসাদ হিসাবে ভক্তদের অতি সমাদরের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিবেশন করা হয়।

প্রসাদ লাভের ব্যবস্থা মন্দিরের তলার মাটির নীচের গর্ভ গৃহে, নিখুঁত ভাবে পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল ভাবে আলোকিত সেই গর্ভগৃহে লম্বা কার্পেটের আসন বিছানো এবং প্রসাদ-থালিকা রাখবার জন্য সাদা দেবদারু কাঠের একই মাপের ছোট ছোট জলচৌকী পর পর সাজানো। জলচৌকির উপর প্লাষ্টিকের ট্রে-র মত পাত্রে বিবিধ প্রসাদ-বস্তু সাজানো, প্লাষ্টিকের চামচ ও কাঁটা দেওয়া—যাতে হাত দিয়ে খেতে অসুবিধা না হয়। চৌকির এক পাশে কাগজের গ্লাসে পানীয় জল ফলের রস ইত্যাদি। যার যা কতবার দরকার সাধকেরা হাসিমুখে সব সরবরাহ করেন—আবার এসে জিজ্ঞাসা করেন আর কিছু চাই? প্রসাদম্ কণিকা মাত্রম্—এই আপ্ত বাক্যে এই সাধকেরা বিশ্বাসী নন বোঝা গেল।

লজ্জায় পড়ে গেলাম—যখন আশ্রমের দু'জন সাধু আমি বাঙালী জেনে আমি মহাপ্রভুর দেশের মানুষ এবং মহাপ্রভুর মাতৃভাষা আমারও মাতৃভাষা এই সুবাদে আমাকে সম্মান জানালেন। তাঁরা আমায় উপরে তেতলার অফিস ঘরে নিয়ে সব ঘুরিয়ে দেখালেন। সেখানে কোন আদরে, টাইপ রাইটার খটাখট চলছে—সব কাজই করছেন সাধুরা নিজেরাই। একজন আমেরিকান সাধিকা রোমান হরফে লেখা একটি সংস্কৃত মন্ত্রের ইংরাজি অনুবাদ করে দিতে অনুরোধ করলেন। তাঁর ধারণা ছিল—মন্ত্রটি বাংলায় লেখা, আমি পড়ে বললাম এটি বাংলা নয়, সংস্কৃত; তবু খুব সরল সংস্কৃত বলে বাংলার মতই মনে হয় বটে। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করে মন্ত্রটি রচিত। তিনি অনুবাদ শুনে খুশী হলেন। আমাকে তাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থরাজি, মাসিক পত্রিকা ব্যাক্ টু গডহেড (Back to Godhead) এবং লং প্লে রেকর্ডে আমেরিকান সাধকদের গাওয়া কীর্তন গান প্রভৃতি দেখালেন। আমেরিকান সাধকদের আঁকা শ্রীকৃষ্ণ একাকী এবং শ্রীরাধিকাসহ যুগল চিত্র, মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের চিত্র, প্রভুপাদজীর বক্তৃতার ক্যাসেট প্রভৃতি দেখালেন। আমি কিছু কিনে নিলাম। দেখলাম এখানে কণ্ঠের মালা ও জপের মালা, তুলসী গাছ, তিলক মাটী সব কিছুই কিনতে পাওয়া যায়। তেতলার ঘরে কৃত্রিম আলোতে রাখা প্লাষ্টিকের টবে সার দেওয়া মাটীতে তুলসী গাছগুলি বেশ সতেজ হয়েছে। শুষ্ক তুলসী মঞ্জরীও পাওয়া যায়—বাড়িতে এনে ছড়িয়ে দিলে নিজের জমিতেই তুলসী বৃন্দাবন সৃষ্টি হতে পারবে।

আমেরিকান সাধুরা ইংরাজীর মাধ্যমে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের রসাস্বাদ করে আগ্রহী হয়ে কেউ কেউ মূল সংস্কৃত পড়বার জন্য সংস্কৃত শিখেছেন এবং তাঁরা মন্দিরে ইংরাজীতে শাস্ত্র আলোচনার সময় সহজে স্বচ্ছন্দে সংস্কৃত শ্লোকসমূহ উদ্ধার করতে লাগলেন শুনলাম। তবে উচ্চারণে একটু জড়তা থেকেই যায়। সংস্কৃত আমরা সবাই কি বিশুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করতে পারি? এবং ইংরাজীও আমরা যা বলি তা ওদের কানে অমনি আড়ষ্টই বোধ হয় নিশ্চয়।

এই নিষ্ঠাচারী নিষ্ঠাবান সাধকদের সঙ্গে আলাপ করে যা জানলাম তা আরও চমকপ্রদ। তাঁদের গুরুদেব কারো উপর সন্ন্যাস গ্রহণের কঠোর ব্রত আরোপ করেন না। শুধু বলেন— বেপরোয়া যৌন জীবন যাপন না করে সংযত সংসারী হতে। বিবাহে আপত্তি নেই, বরং সাধক সাধিকাদের মধ্যে একবার মাত্র বিবাহ করে চিরদিনের জন্য স্বামীস্ত্রী হিসাবে বাস করবার পরামর্শ দেন তিনি। অবাধ যৌন জীবনের বিরুদ্ধে এই সংযত সুস্থ জীবন অনেককেই যে আকৃষ্ট করেছে তা এখানকার সাধকদের দেখেই বুঝতে পারলাম। নিষেধ আরও আছে—তা হল সব রকম নেশা এড়িয়ে চলা, মদ্যপান ধূমপান এমনকি চা কফি কোকো পান করাও তারা এড়িয়ে চলেন—এল, এস, ডি, মারিজুয়ানার যুগে এই নেশায় নিস্পৃহ জীবন সত্যই এক আশ্চর্য আদর্শ স্থাপন করেছে। আর এক নিষেধ, আমিষ ভোজনে। নিরামিষ ভোজনের উপকার তাঁরা নিশ্চয় পাচ্ছেন—না হলে সাধকেরা আশ্রমের প্রসাদ পেতে এত আগ্রহী হবেন কেন?

মহাপ্রভু স্বয়ং বলেছিলেন—

সন্ন্যাস করিনু যবে দুঃখ হইল মন
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিল ধন।

সেই প্রেম-ধর্মেরই অনুরাগী এরা, পরস্পরের প্রেম তাঁরা আপামর জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করতে প্রয়াসী। তাই তো গড়ে উঠছে নতুন নতুন হরেকৃষ্ণ মন্দির। এদের এইসব বিদেশী সাধিকাদের দেখে কিন্তু ম্লেচ্ছ বলে মনেই হয় না। মনে পড়ে সেই বিখ্যাত পদ—

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেন নয়
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ব বেত্তা সেই গুরু হয়।

অনেকজন সাধকের সঙ্গে পরিচয় হল, কয়েকজন সাধিকার সঙ্গেও আলাপ হল, দেখলাম তাঁদের পূজা অর্চনা, সংকীর্তনে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় যোগদান, আবার সেবাপরায়ণ মূর্তিতে যেন সাক্ষাৎ দেবদূত দেবদূতী। দূর মার্কিন দেশের পটভূমিকায় যেন একখণ্ড সজীব বৃন্দাবনের ছবি।

সেই অমৃত মধুর স্মৃতি নিয়ে ফিরে এসে আজ এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির চত্বরে পৌঁছে আবার তাই তাঁদের স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। *

* বারাকপুরে শ্রীশ্রীগৌরনিতাই মন্দিরে অনুষ্ঠিত মূলসঙ্ঘ সম্মিলনীর বিজয়া সম্মেলনে পঠিত।

কলা-বৌ স্নান

শ্রীশুভঙ্কর মল্লিক কাব্যতীর্থ

'বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্ব্বরী দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে'। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন কাল। ইংরেজের গৌরব-সূর্য্য তখন মধ্য গগনে। কোম্পানীর দাপটে বাঘে ছাগে যেন একঘাটে জল খায়। দিল্লীর বাদশাহ পর্যন্ত বৃটিশ সিংহের কাছে কুণ্ঠিত প্রায়। কলিকাতায় গড়ে উঠেছে বণিকদের কুঠি—চৌরঙ্গীর চতুর্দিকে চমক লাগান গগনচুম্বী ইংরেজদের ইমারত। যে দিনের ঘটনা উল্লেখ করছি—বঙ্গের অঙ্গনে ঋতুচক্রে তখন নেমে এসেছে শুভ্র শরৎ কাল। কবি কুলোত্তম কালিদাসের ভাষায়—

পুণ্ডরীকাতপপত্রভঃ বিকসিত কাশচামরঃ।
ক্ষতু বিভূষয়ামাস ন পুনঃ প্রাপ্তশ্চিরম্॥

বাঙ্গালীর প্রাণের প্রিয়, পুণ্যপার্বণ, জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজা সমাগত। বাংলার ঘরে ঘরে আতপ চালের আলপনা। দোরে দোরে মঙ্গল কলস—কদলীতরু রোপন। আনন্দময়ীর আগমনে মত্ত প্রকৃতি—আকাশ বাতাস আনন্দে মুখর। আবাস বৃক্ষবনিতার অধরে অধরে হাসি। বৎসরান্তে উমাসমের আগমন। অরুণদেব তখনো পূর্ব্বাকাশে দেখা দেননি। সপ্তমীর নিটোল বরা ভোরে শিশির-সিক্ত পথ ধরে একদল শুচি-শুভ্র বিপ্র চলেছেন জানবাজার থেকে। আগে আগে চলে বাদ্যি বাজনা। ঢাক, ঢোল, কাঁসি, সানায়ের মিলিত মধুরাগিনীতে মেতে উঠেছে সারা পল্লীটি। মায়ের ভক্তবৃন্দ ব্যস্তসমস্ত ঘরে এগিয়ে যাচ্ছেন বাবুঘাটের দিকে। দুই বিপ্রের স্কন্ধে বেণুদণ্ডে কলাবৌ। ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে স্নান করানর জন্য তাঁরা চলেছেন। বাতায়ন খুলে পুরললনাগণ শঙ্খ বাজায়। নাচতে নাচতে কচি কাঁচারা কেউ কেউ নেমে আসে পথে। কিন্তু সেই বাদ্যধ্বনিতে হঠাৎ অনেক বৃটিশ কুম্ভকর্ণের কর্ণ পটাহে তীব্রণ আঘাত লাগে। ভোরের সুখ-নিদ্রা ভঙ্গ হয়। অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠেন কয়িংকর্মা বণিকটি। কুঠির কক্ষ থেকে সাহেব মুখ বাড়া করে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলেন, "তুমরা বাজনা বন্দ কর।" চাকী বলে, "তুমি কে—নবাব সিরাজদ্দৌল্লা না লর্ড ক্লাইভ যে তোমার হুকুমে বাজনা বন্ধ করতে হবে!" কে একজন আবার বলে,—"আমরা জান বাজারের মাড় কুবেরদের অনুচর; সাধ্যি থাকে এসে বন্ধ করে যাও"। সাহেব তখন বেগতিক দেখে দরজা বন্ধ করেন।

ভক্ত, পূজারী, বাদক দল মত্ত মাতঙ্গের গতিতে গঙ্গার দিকে এগিয়ে চলে। ভাগীরথীর পুণ্য নীরে ধীরে ধীরে স্নান করান হয় কলাবৌকে। জান-বাজারের দিকে প্রত্যাবর্ত্তনের কালে বণিকের কুঠির সম্মুখে মেঘমন্দ্রে আবার বাজতে থাকে ঢাকগুলি—সানায়ে উঠে সপ্তম সুর। তালে তালে উত্তাল তরঙ্গ তুলে ঢাকীরা সেখানে নাচতে শুরু করে।

এই ঘটনায় সাহেবের কাঁচের মর্যাদা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়। অপমান নিরসনের জন্ত রাজগোত্রীয় মহাপুরুষ যানার খবর দেন। যাঁর এই পূজো তিনি হচ্ছেন ক্ষাত্রতেজ-সমন্বিতা প্রাতঃ-স্মরণীয়া রাণী রাসমণি। কলকাতার জান-বাজারের রাজা রাজচন্দ্রের ধর্মপত্নী কুবের তুল্য ধনী মাড়োদের কুলবধূ, দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দির যাঁর অক্ষয় স্মৃতি বহন করে চলেছে। 'প্রিয়া দর্শনীয়া পণ্ডিতা পতিব্রতা' রাণীমা অঘটনের কথা মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করেন। তারপর তিনি ধীর স্থির ভাবে কর্মচারীদের হুকুম দেন—"আগামী কল্যের জন্ত পঞ্চাশটি ঢাক, পঞ্চাশটি ঢোল, কাঁসি, বাঁশীর যেন ব্যবস্থা থাকে। একশো জন বরকন্দাজ সহ আবার বাজাতে বাজাতে কুঠির সামনে দিয়ে যাবে। দেখা যাক্ ঐ বীর পুরুষ কি করে!" মহাকবি মাঘ যথার্থই লিখেছেন—

সমুল্লঙ্ঘ্যাতমস্বস্তঃ পরাগ্রোক্তিং মানিনঃ।
প্রভুঃ সিতাংশুতমসস্তত্রোদ্যোহরণঃ রবি॥

ঐশ্বর্যবান তেজস্বী পুরুষ শত্রুকে সমূলে উচ্ছেদ না করে পারেন না; যেমন সূর্য্য অন্ধকার দূর না করে উদিত হন না।

রাণীমার কথামতই কাজ হ'ল। পূজারী, ভক্ত, বাদকদল আবার ভোর ভোর-বাবুঘাট পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এল। সাহেব ক্রোধে রাণীমার বিরুদ্ধে অপমানের প্রতিশোধের জন্ত মামলা রুজু করলেন। জানবাজার রাজবাড়ীতে চলে তিনদিন ধরে মহামায়ার পূজা অর্চনা। আত্মীয় স্বজন কুটুম্ব, পরিজন, কর্মচারী সকলকেই নব বস্ত্র দান করা হয়। পূজোর কদিন আপামর জনের ভোজনেরও বিশেষ ব্যবস্থা হয়। সাতশো দরিদ্র সধবাকে শাঁখা সিঁদুর দান করা হয়। সহস্র কুমারীকে দেওয়া হয় নতুন নতুন ফ্রক। এ ব্যাপারে রাজ-কোষের প্রায় বাট হাজার টাকা খরচ হয়। তাইতো কবিগুরুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলা যায়—

আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান
দাঁড় ধরে আজ ব'সরে সবাই টানরে সবাই টান।

শেষ হ'ল মহাসমারোহে মহামায়ার অর্চনা। বিসর্জনের বেহাগ রাগিনী বেজে উঠল। সেই সঙ্গে এল দুঃসংবাদ—মামলায় শাস্তি ভাঙার অজুহাতে রাণীমার পঞ্চাশ টাকা জরিমানা। জরিমানার টাকা এক কর্মচারী গিয়ে কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়ে এলেন। এবার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ-করা মহীয়সী রাণী নতুন এক পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। গভীর রাত্রিতে অনুচরেরা গিয়ে লম্বা লম্বা শক্ত লাল কাঠ দিয়ে বাবু-রোড ঘিরে দিল। প্রভাতে উঠে সবাই দেখে অবাক কাণ্ড। রাস্তার পাহাড় জমেছে যান বাহনের। কোম্পানীর কানে সে সংবাদ পৌঁছাল। সরকার সে খবরে প্রথম কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হতভম্ব হয়ে গেলেন। শেষে বহু মন্ত্রণার পর রাণীমার কাছে অনুরোধ-পত্র পাঠালেন বেড়া তুলে নেওয়ার জন্ত।

সিংহিনীর মত তখন তেজস্বিনী মহিলা জবাব দিয়ে পাঠালেন—"বাবুরোডে সরকারের কোন এক্তিয়ার নাই। আমার স্বর্গীয় স্বামী বহু অর্থ দিয়ে জমি কিনেছিলেন। লোক জনের সুবিধার জন্ত প্রচুর টাকা ব্যয় করে রাস্তা নির্মাণ করে-ছিলেন। সুতরাং এ এখন আমার খাস সম্পত্তি। কোম্পানী যদি পথের প্রয়োজন বোধ করেন তবে

তা উচিত মূল্যে ক্রয় ক'রে নিতে পারেন।" ঔদ্ধত্যপূর্ণ এই বাণী শুনে রবি কবির তাঁবার রাণীর উদ্দেশ্যে বলতে ইচ্ছে করে—

মহাবীর্যবতী তুমি বীর-ভোগ্যা,
বিনম্রীত তুমি ললিতে কঠোরে
মিশ্রিত তোমায় প্রকৃতি পুরুষে নারীতে।

রাণীর কথায় সরকারের মাথায় বুঝি এবার আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। ভেবে পান না কূল কিনারা। শেষে গত্যন্তর না দেখে রাণীমার জরিমানার টাকা পেয়াদা মারফৎ কেন্দুত পাঠান। লিখিত পত্রে জানিয়ে দেন—পূজো পার্ব্বণে বাড়ি বাজনা যথারীতি বাজতে থাকবে, তবে পথে বেরুতে হলে তার আগে একটি পুলিশ পাশ নিতে হবে। এ ব্যাপারে আর কোনদিন কোন সোলযোগ ঘটবে না।

এই সুসংবাদে জানবাজারের পুরবাসীর প্রাণে আর আনন্দ ধরে না। কোম্পানীর বিরুদ্ধে রাণীমার জয়ের কাহিনী সারা ক'লকাতায় ছড়িয়ে পড়ে। ভাগীরথীও বুঝি সে কথা শুনে আনন্দে উথলে উঠে। বঙ্গ-বীরাঙ্গনার বীরত্ব গাথা বুঝি মুদ্রিত হয় স্বর্ণ অক্ষরে গৌড়-জনের মনের পাতায় পাতায়। কবির বীণাও সুরের লহর তুলে বেজে উঠে—

দশ দিগবধূ গায় যশোগান
বাতাসেতে ভাসে ধন্য ধন্য ধ্বনি;
কোটি কণ্ঠের মুখে মুখে ফুটে
জয় রাণী রাসমণি।

যাঁকে দেখিনি

শ্রী বিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধারণ মানুষের পক্ষে কোন একটা পক্ষ অবলম্বন করে জীবন ধারণ সোজা। যেমন, বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক সাহিত্যিক দৃষ্টি ভঙ্গীতে বিচার করবেন। আরও বিশেষ করে বলতে গেলে পদার্থবিৎ পদার্থ বিজ্ঞার, প্রাচীন ইতিহাসের বোদ্ধা প্রাচীন ইতিহাসের এক শ্যামবাবু (যদি তিনি রামবাবুর অনুরাগী হন) তবে রামবাবুর কথা বলবেন। প্রকৃতপক্ষে এটা প্রকৃতির পরিমিতি, এরকম না করলে অনেক সময় বাস্তব জীবন অচল, নিরবলম্ব হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু যা সোজা তা সব সময় সরল বা সর্বজন-গ্রাহ্য নাও হতে পারে।

কথাগুলি মনে হল শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবনের একটা উক্তি প'ড়ে। 'বাল্যকালে গান শুনতাম "অসার সংসারের মায়া ছাড়রে একবার," গানের ছাপ মনের উপর গাঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল।' (উদ্বোধন-পত্রিকা)। তাঁর কেন, এরকম আরও অনেকেরই নিশ্চয়ই এরকম

হয়েছে বা হচ্ছে। প্রথমেই বলেছি জীবনকে একটু একপেশে করে চলাই সুবিধেজনক, আর আমাদের দেশের আর্থ, উচ্চ পরিবেশ বোধ হয় ঐ পথে চলতে সাহায্য করেছে। শঙ্করাচার্যের দর্শন কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে বলা মুস্কিল ; করেছে নিশ্চয়ই। তবে শঙ্করের দর্শনের মধ্যে পুরুষকার বা আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার কথা আছে তা ঠিক আমাদের এই 'মায়াবাদে'র মধ্যে নেই, ওটা যেন অনেকটা 'ভাগবাদ'কে মেনেই চলেছে।

স্বামীজীর পরবর্তী কথাগুলিতে দেখি— 'জগতের যতটুকু ছাড়িবেন জানিবেন ভগবানকে ততটুকু ছাড়িলেন, কারণ সমস্তই ভগবান। কোন লোকই বদ্ধ নয়, কারণ ভগবান কি কখনও বদ্ধ হইতে পারেন ?' (স্বামীজীর পত্রাংশ)। মনে পড়ছে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা 'মনেতেই মুক্ত, মনেতেই বদ্ধ।' অথবা,

'Two men saw out of the prison bars
One saw the mud, other saw the stars.'

স্বামীজীর প্রসঙ্গে একথা শুধু ব্যঙ্গার্থে সত্য নয় আক্ষরিক ভাবেও সত্য। কারণ, বিদেশী শাসকদের কারাস্তরালেই তাঁর কতকগুলো শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সমস্ত জীবনই এই কথা বলে।

আজ দেখছি আমাদের চিন্তা ভাবনা তোল পালটেছে। বাহ্যিক রূপের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। নৌকো অন্য পাশে কাত হয়ে চলেছে। যোবহয় পাশ্চাত্য চিন্তা-সংস্কৃতির প্রভাবে অথবা কালের প্রভাবে এমন হয়েছে। আমরা এখন ঘোরতর বাস্তববাদী। যা কিছু বাস্তব-ঘেঁষা নয় তা আমাদের কাছে 'ফুচ্চু' (রাজশেখর বসুর মন্তব্যের কথায়)। কিন্তু সত্যিই কি চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়েছে, না এই সজল আবহাওয়া বিনা বিশ্ব চেষ্টায় শক্তির কাছে বিনা আত্মসমর্পণে তা হওয়া সম্ভব ? মনে হয় তা আত্মগোপনই করে আছে। আমাদের প্রতিটি 'বাস্তব' কাজই এর প্রমাণ করবে।

কোন আমূল পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় শক্তি ও গৌরব পূর্ব চিন্তাধারার অবশ্যিত অংশ বাদ দিয়ে বাঞ্ছিত অংশের সঙ্গে সমন্বয়। যে ব্যক্তি যৌবনেই জগতের অস্তিত্বে ও বৈরাগ্যের আভাস একই সঙ্গে দেখেছিলেন, তিনিই গীতার ভাষ্যে পুরুষোত্তম রূপে বিচরণ করেছেন। একথা ঠিক যে স্বামীজী শ্রীনিত্যগোপালের মধ্যেই এই সমন্বয়ের বীজ খুঁজে পেয়েছিলেন। তবে তিনি যে স্বকীয়তায় এগিয়ে গেছেন একথা নিঃসন্দেহ। তিনি তাঁর জীবন ও বাণীর দ্বারা সমন্বয়ের যথার্থতা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন।

যাঁরা একপেশে হয়ে চলেন তাঁদের অসুবিধে হচ্ছে এই যে যখন তাঁরা অপর পক্ষের সম্মুখীন হন তখন লাগে সংঘাত। চিন্তার জগতে সংঘাতের মূল্য অনেক, কিন্তু এই সংঘাত সেই রকম নয়। এ হচ্ছে নিজের নিজের পক্ষকে যে কোন ভাবে আঁকড়ে থাকার প্রবণতা। এখানেই আসে দলাদলি, স্বার্থপরতা ও হিংসা। আর এই সব ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় দুটি চিন্তা সমান্তরাল ভাবে চলতে থাকে, আর যখনই কাছাকাছি হয় তখন মিলন হয়ে লাগে কলহ, আবার চলতে থাকে। 'শরৎ কুমার (পুরুষোত্তমানন্দ) জীবনের এক পৃষ্ঠা পড়িলেই বুঝা যায়, তিনি কোন দিনই বিশেষ কোন মতবাদ বা বাদে আটকা

ছিলেন না ('শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ'—প্রতিভা রায়)। আর যেখানে তিনি বিরোধী মতের সম্মুখীন হয়েছেন সেখানে যদি কিছু অন্যায় দেখেছেন তবে কোমল কিন্তু দৃঢ়ভাবে তার প্রতিবাদ করেছেন। মহাজীবনের দুটি অংশ—একটি তাঁর শারীরিক ব্যক্তিত্ব, যা তাঁর শরীরকে কেন্দ্র করে ঘিরে থাকে; অপরটি তাঁর কার্য ও বাণী। এর কোনটিই কম নয়। এর প্রথমটীর সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য হয় নি, কিন্তু যখন তাঁর জীবন ও বাণী একটু পড়ি বা আলোচনা করি তখন তাঁর যুগপৎ কোমলতা ও দৃঢ়তা মনকে ভরে তোলে।

সাময়িকী

নরনারায়ণ আশ্রম-সঙ্ঘের ১৯৭৫-৭৬ বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন :—

নরনারায়ণ আশ্রমের সমাজ-সেবামূলক কর্ম-চিন্তার বাহক নরনারায়ণ আশ্রম সঙ্ঘ। তার চারটি শাখা—নরনারায়ণ গ্রন্থাগার, নরনারায়ণ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, প্রাক বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও নরনারায়ণ মহিলা শিল্পশিক্ষা কেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে—আর একটি নূতন বছরে পদক্ষেপ করেছে। এই বছরের অতিক্রান্তায় আছে পারিপার্শ্বিক জনমানসের সহানুভূতি, ছাত্রছাত্রী ও সভ্যদের সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষক ও কর্মীবৃন্দের অকুণ্ঠ নিষ্ঠা আর শ্রীশ্রীনিতাগোপাল, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের একান্ত আশীর্বাদ।

আশ্রমসঙ্ঘের প্রতিটী শাখা এগিয়ে চলেছে, সেবা-ধর্মই তার আদর্শ। তাদের চলার পথের ভুল ত্রুটিগুলিকে স্বীকার করে নিয়েও বলা যেতে পারে তাদের চলা আগামী দিনের আরও সাফল্যের সূচনা করে। বাধাও আছে বহু বাহুল্য। কারণ বিভিন্ন শাখার জন্য সরকারী অনুদান তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দিতে অক্ষম। নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের এই অনুদান আবার সরকারী অফিস থেকে আদায় করাও বিশেষ সময়, শ্রম ও অর্থব্যয় সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন শাখার আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাবে অনেকেরই আভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি ঘটলেও বহিরঙ্গের বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। প্রত্যেকেরই গৃহ-সমস্যা অর্থাৎ স্থান-সংকুলানের প্রশ্নটা বিশেষ সমস্যা হয়েছে। নিম্নবুনিয়াদী ও শিল্পশিক্ষার বিদ্যালয় দুইটিতে ছাত্রছাত্রীদের বসার জায়গা, গ্রন্থাগার-সভ্যদের পড়ার জায়গা, বইয়ের আলমারী রাখবার জায়গার অকুলানের জন্য তারা তাদের কর্ম-প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। সহৃদয় মানুষের সহানুভূতি ও সহযোগিতা আমরা আশা করে রইলাম।

বিভিন্ন শাখার বিবরণ :—

গ্রন্থাগার : গ্রন্থাগারের বয়স উনিশ। গ্রন্থাগার-কর্মী দুইজন—গ্রন্থাগারিক ও শিওন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে তৃতীয় কর্মীর ব্যবস্থা না থাকায় দুই-জনকেই সব কাজ বিশেষ শ্রমের সঙ্গেই চালাতে হচ্ছে। নরনারায়ণ আশ্রমসঙ্ঘ গভার্ণিং বডিই চারিটী বিভাগ মূলত: পরিচালনা করেন, তবুপি গ্রন্থাগারকে প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করবার জন্য গ্রন্থাগার-সভ্যদের করেকজনকে নিয়ে আছে একটা উপসমিতি এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করবার জন্য আছে একটা উন্নয়ন-কমিটী। উপসমিতি, উন্নয়ন কমিটী ও গ্রন্থাগার সভ্যদের প্রচেষ্টায় একটী পড়ার ঘরের জন্য কিছু অর্থ ইতিমধ্যে সংগৃহীত হয়েছে, আরও বেশ কিছু অর্থ সংগৃহীত না হলে এই ইচ্ছাকে রূপদান করা সম্ভব হবে না।

গ্রন্থাগারের সভ্যসংখ্যা ৩১শে মার্চ '৭৬ পর্যন্ত ১৭৫ জন (এর মধ্যে প্রায় ৭০% সভ্য ছাত্র)। এ ছাড়া প্রতিদিন গ্রন্থাগারে বসে পড়াশুনা করার কিছু সভ্য রয়েছে।

ঐতিহাসিক পর্যন্ত পুস্তক সংখ্যা ৪১৪৭
" " পত্রপত্রিকার " ১৮
(দৈনিক ১খানা, সাপ্তাহিক ১খানা, পাক্ষিক ৩ খানা এবং মাসিক ২৪খানা) এগুলির মধ্যে কেনা হয় ৭ খানা, আর বাকিগুলি পাওয়া যায় কমপ্লিমেন্টারী বা আশ্রমের মুখপত্র 'উজ্জীবন'-এর বিনিময়ে।

গ্রন্থাগারের সভ্য ও পুস্তক সংখ্যা বাড়লেও স্থান-সঙ্কুলানের ব্যবস্থা না-হওয়াটা বড় রকমের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা আগেই বলেছি। গ্রন্থাগারে এ বছরে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা ও শরৎ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে করেকজন চিন্তাবিদদের নিয়ে দুটি আলোচনা সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল। গ্রন্থাগার সভ্যদের রুচির পরিচয় মেলে পড়ার বইয়ের তুলনা করলে—এ বছরে ফিকশান ৪৩১৮/নন-ফিকশান ৮৪০৪। সব মিলিয়ে বলা যায় পারিপার্শ্বিকতা থেকে আরও বেশী সহযোগিতা পেলে এই গ্রন্থাগারকে একটি বিশেষ গ্রন্থাগার ও ছাত্রবন্ধু করে গড়ে তোলা অবশ্যই যেতে পারে।

নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় : গৃহ-সমস্যার কথা আগেই বলা হয়েছে—তার মধ্যে বিদ্যালয় ও কোয়ার্টারের রিপেয়ারিংএর অর্থ সাহায্য সরকার থেকে পাওয়া যায় নি এ কথাটাও জানাই। একটি বড় বারান্দাসহ ৩ খানি কোঠা ঘর এবং ৪ খানি খেড়ায় ঘর নিয়ে এই স্কুল। শিক্ষক-শিক্ষিকা ৭ জন, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩০৩—এর মধ্যে নূতন ভর্তি ৮৯ জন। বাণ্মাসিক বার্ষিক এবং এপ্রিল মে ও সেপ্টেম্বরে ইংরেজী বাংলা অঙ্কের সাপ্তাহিক পরীক্ষা হয়ে থাকে। বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শতকরা হিসাবে ১ম শ্রেণীতে ৮৯'৪ জন, ২য় শ্রেণীতে ৬৯'৩ জন, ৩য় শ্রেণীতে ৬৭ জন ও ৪র্থ শ্রেণীতে ৮৮'৪ জন। প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় ২২'৮ জন। ৪৮ জন পরীক্ষার্থীর উত্তীর্ণ ৪৬ জনের মধ্যে ৯ জন প্রথম বিভাগে, ১৮ জন দ্বিতীয়, ১৯ জন সাধারণ অর্থাৎ P ডিভিশনে পাশ করে। ডিভিশনের দিক দিয়ে বিদ্যালয় এ বছরে প্রশংসা দাবী করতে পারে না। তবে সরকারী বইগুলি দেরী করে পাওয়ায় বিদ্যালয়কে এজন্য সবটুকু দায়ী করা যায় না। বুনিয়াদী

বিদ্যালয় বলে সুতোকাটা, সাকাই, বাগান ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার সঙ্গে রয়েছে। সুতোকাটা শেখানর একটা চেষ্টা করা হয় মাত্র— সুতো বিশেষ হয়ে ওঠে না। বাগানের শাকসব্জী বিক্রী করে ১১ টাকা ৬৪ পয়সা স্কুল ফাণ্ডে জমা পড়েছে এ বছর। বার্ষিক অনুষ্ঠান ও খেলাধূলা এ বছর মার্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুরস্কার-বিতরণও সেই সময়ই হয়। বছরে একবার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রাক বুনিয়াদী বিদ্যালয়—এ স্কুলের এখন পর্যন্ত নিজস্ব ঘর নেই। নিম্নবুনিয়াদীর ঘরেই সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত সপ্তাহে ৫দিন ইঁদে ৬ বৎসরের শিশুদের নিয়ে ক্লাস হয়। একজন প্রধান শিক্ষক, একজন সহ শিক্ষিকা, একজন মেট্রন ও একজন সার্ভেন্ট এর শিক্ষা-কর্মী। শিশুদের সংখ্যা এ বছরে ছিল ৪৯ জন, মাসে গড় উপস্থিতি ছিল ৪৫'৮। শিশুদের টিফিন দেওয়া হয়। স্কুলের কাজে অভিভাবকরাও কিছু আর্থিক সাহায্য দান হিসাবে দিয়ে থাকেন।

নয়নারায়ণ মহিলা শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র: এতদঞ্চলে এইটি সত্যিই একটি মূল্যবান সংস্থা। স্কুলটী ১৯ বছরের। নিজস্ব পাকা ঘরে এটী বসে, কিন্তু স্থান সংকুলানের সমস্যা আছেই তা আগে বলেছি। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মেয়েরা অল্প মাহিনায় সেলাই শেখে। স্কুলের দুইটী বিভাগ: লেডি ব্রেবোর্ণ ডিপ্লোমা বিভাগ, ২) সাধারণ অর্থাৎ সার্টিফিকেট বিভাগ। লেডি ব্রেবোর্ণ ডিপ্লোমা দেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সাধারণ বিভাগে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় নয়নারায়ণ আশ্রম-সঙ্ঘ থেকে। বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত বেলা ১৯.৪) থেকে ৫৯.৪) পর্যন্ত ক্লাস হয়। শিক্ষিকা শ্রীমতী মীনাক্ষী দাস লেডি ব্রেবোর্ণ ডিপ্লোমা ও সরোজনলিনী ডিপ্লোমা প্রাপ্তা। সাধারণ ক্লাসের প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় স্কুল থেকেই দেওয়া হয়, ডিপ্লোমা ক্লাসের এই খরচ ছাত্রীদের। সাধারণ ক্লাসের সেশান আগষ্ট থেকে জুলাই, ডিপ্লোমা ক্লাসের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর। সাধারণ ক্লাসে ১ বছরের কোর্স, ডিপ্লোমার ৩ বছরের। ও বছর সাধারণ ক্লাসে ছাত্রী ছিল ৪৫ জন, ডিপ্লোমার ৮ জন। সাধারণ ক্লাসে পরীক্ষার্থী ছিল ৬, পাশ করে ৬ জনই, ডিপ্লোমাতে পরীক্ষা দেয় ৫ জন, ৪ জন পাশ করে, ১ জন শুধু খাতায় পাশ করে। পাশকরা ছাত্রীদের বিদায় দিতে প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও একটী ছোট অনুষ্ঠান হয়ে ছিল। সেলাই শিক্ষা ব্যতীত মেয়েরা বছরে একবার ভ্রমণ উদ্দেশ্যে এদিক ওদিক যায়, সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠানে যোগ দেয় এবং বছরে একটী প্রদর্শনী করে। এবার সরস্বতী পূজায় ৭ দিন পরে প্রদর্শনী আরম্ভ হয়ে ৮ দিন থাকে। নানা প্রকার হাতের কাজ ও মেশিনের সেলাইর দ্রব্যাদি প্রদর্শিত ও বিক্রীত হয়। শেষ দিনে একটী অনুষ্ঠানে পাশকরা ছাত্রীদের ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

উপরে লিখিত আশ্রমসঙ্ঘের অগ্রগতির মধ্যেও দুইটি বিষয়ে আমরা খুব অসুবিধায় পড়েছি। একটী হচ্ছে নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলে সরকারী অনুদান সংগ্রহে প্রচুর সময় শক্তি ব্যয় করেও পুরো টাকা পাচ্ছি না। দ্বিতীয় হল প্রাক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের হেড টীচার শ্রীরাধেশ্যাম মজুমদার ও মেট্রন শ্রী শিবানী সরকার স্কুল কর্তৃপক্ষের কোন

রকম নির্দেশ না নিয়েই তাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে টাকা পোষ্টাফিসের সহায়তায় তুলে নিজেদের নামে ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট Vissue, ও Rucurring Disposit কিনেছে যা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে পড়েছে। এ ঘটনাটি আইনসঙ্গত হয় নি একথা তাদের জানালেও তারা আত্মপক্ষ সমর্থন করে চলেছে। ঘটনাটি সম্বন্ধে আমরা সকলকে অবহিত করে রাখলাম। আশা রাখি এ বিষয়ে তাঁরা আমাদের করণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন।

বিশদফা কর্মসূচী ও ২৪ পরগণা

শ্রী অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়, জেলা শাসক, ২৪ পরগণা

জন-সংখ্যা ও আয়তন-এর দিক থেকে ২৪ পরগণা রাজ্যের জেলাগুলির মধ্যে সবার উপরে। জেলার ১৩৭৯৬ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের মধ্যে সুন্দরবন অঞ্চলের আয়তন ৫৫০১ বর্গ কিলোমিটার। কোলকাতার কাছাকাছি হয়েও এ জেলার গ্রামাঞ্চলের জন-সংখ্যা প্রায় ৫৫ লাখ। গ্রামীণ জন-সংখ্যার এক বিরাট অংশ তপশিলী সম্প্রদায়ের। আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো কৃষকের চেয়ে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বেশী। এ ছাড়া জেলায় বেশ কিছু সংখ্যক তহশিলী উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকও আছে। কৃষি শ্রমিক তথা দিন মজুরদের মধ্যে ৩৬৫৫৫টি পরিবারের কোন বাস্তুভিটা ছিল না। বিশ দফা কর্মসূচী সুরু হওয়ার পর দরিদ্র কৃষক, কৃষি শ্রমিক, তফশিলী সম্প্রদায় ও তফশিলী উপজাতি সম্প্রদায় ও জেলার ছোট ছোট শিল্প কারিগর বিশেষ করে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া কৃষি উন্নয়নের জন্য সেচের সুযোগ বৃদ্ধি, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের হোষ্টেলে নিয়ন্ত্রিত দরে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ, দারিদ্র জনগণের কাছে নিয়ন্ত্রিত দরের জনতা কাপড় সরবরাহ প্রভৃতি কাজের কর্মসূচীও জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়। বিশদফা কর্মসূচীর অনুসারে, দেশে জরুরী কর্মসূচী ঘোষণা হওয়ার পর এক বছর কেটে গেছে। আমরা এই এক বছর কতটুকু কি করতে পেরেছি এটা অনেকের প্রশ্ন হতে পারে। যদিও আমার মতে এই কর্মসূচী এই জেলার জন সাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায়, সরকারী কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে উল্লেখযোগ্য ভাবে সাফল্য অর্জন করেছে।

সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল পচাত্তরের ২রা অক্টোবরের মধ্যে জেলার সকল বাস্তুহীন পরিবারের

মধ্যে বাস্তুজমি বণ্টনের কাজ এবং সরকারের উপর ন্যস্ত কৃষিযোগ্য জমি ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষী এবং ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের মধ্যে বিলির কাজ শেষ করতে হবে। সরকারের এই প্রতিশ্রুতি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পালন করা হয়েছে। জেলায় ৪৮৮৫৫ একর ন্যস্ত বিলিযোগ্য কৃষি জমি ৯৫২৮০ জন ভূমিহীন কৃষক এবং ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। জেলায় ৩৬৫৫৫টি বাস্তু-হীন পরিবারের মধ্যে বাস্তু জমি বিতরণ করা হয়। এ জন্য ১৬৮৭·২২ একর জমি প্রয়োজন ছিল। আমরা এর মধ্যে ১৬১০·৭১ একর জমি পেয়ে-ছিলাম সরকারী খাস জমি থেকে। বাকি ৪৬·৫১ একর অধিগ্রহণ করতে হয়।

বাস্তু জমি বিতরণের কাজ শেষ হওয়ার পর বসত বাটী তৈরীর কাজ আমরা হাতে নিয়েছি। এ পর্যন্ত ১১ লাখ ২৮ হাজার টাকা খরচ করে ২২৫৬টি বসতবাটী তৈরীর কাজ শেষ করা হয়েছে। আরও ২২১০টি বসত বাটী তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং এ জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১১ লাখ ৫ হাজার টাকা।

১৯৭৫ এর পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ঋণ ত্রাণ আইন অনুযায়ী মহাজনী ঋণ মুকুব ও বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর জেলার সমবায় সমিতিগুলি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি দরিদ্র কৃষক ও অন্যান্য দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। সমবায় সমিতিগুলি চলতি বছরের ১৫ই জুন পর্যন্ত প্রায় ৩১৭ লাখ টাকা স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ হিসাবে প্রায় ৩০ হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং দরিদ্র কারিগরের মধ্যে বিতরণ করে। এ ছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের তরফ থেকে ১১৫৩৬ জন কৃষকের মধ্যে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪ কোটি ৮৮ লাখ ১৯ হাজার টাকা লগ্নী করা হয়।

সেচের সুযোগ প্রসারের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে দ্রুত খাদ্য উৎপাদন কর্মসূচীর মাধ্যমে; এতে আরও ১৭৩৬৪ একর কৃষি জমি সেচের আওতায় আসবে। ইতিমধ্যে ৩৩৬টি অগভীর নলকূপ এবং ১৫টি গভীর নলকূপ খননের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। শক্তি-চালিত এই গভীর ও অগভীর নলকূপগুলির প্রায় সব কটি চালু হয়ে গেছে। এ ছাড়া এ প্রকল্প অনুযায়ী ৮টি জল নিকাশী সেচ প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পথে।

তন্তুবায় সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য জরুরী কর্মসূচী ঘোষণার পর থেকে এ পর্যন্ত ৩৭টি সমিতি সংগঠিত হয়েছে, এর মধ্যে ১৩টি সমিতি সমবায় সমিতি হিসাবে রেজিষ্ট্রী হয়েছে। সমিতিগুলির ১০৩০ জন তন্তুবায়কে ২ লাখ ৭৮ হাজার ১৭৪ টাকা ভরতুকি হিসাবে দেওয়া হয়েছে। সমিতির বহির্ভূত তন্তুবায়দের মধ্যে ২৯ হাজার টাকা সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয়েছে। উন্নত ধরণের তাঁত ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি কেনার জন্য অনুদানও দেওয়া হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের হোষ্টেলে নিয়ন্ত্রিত দরে খাদ্য সামগ্রী, বই খাতা ইত্যাদি সরবরাহ করার কাজও এগিয়ে চলেছে। এ পর্যন্ত জেলায় ৫৭টী অনু-মোদিত ছাত্রছাত্রীদের হোষ্টেলের ৩৩৮৮৬ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে চাল, গম, চিনি ও কেরোসিন তেল সরবরাহ করা শুরু হয়েছে। ৬টি জুনিয়ার

স্কুলে যুক্ত ব্যাঙ্ক খোলার জন্ত সরকারী অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত দরে কাপড় সরবরাহের জন্ত জেলার বিভিন্ন গ্রামে ৮টি প্যাইকারী সমবায় সমিতির মাধ্যমে ২৮৬টি বিক্রয় কেন্দ্র চালু আছে। কৃষি মজুর যাতে তার ন্যূনতম মজুরী পায় তার দেখাশুনা করার জন্ত প্রতিটি ব্লকে ১ জন ন্যূনতম মজুরী পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক জায়গায় কাজ শুরু হয়েছে।

সংগ্রহ ও বন্টনের কাজও জেলায় সন্তোষজনক ভাবে চলেছে। এ পর্যন্ত জেলায় চাল সংগ্রহের লক্ষ্য-মাত্রার ৯০% সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। জেলায় চাল সংগ্রহের বর্ত্তমান পরিমাণ হলো ১৩৫০০ মেট্রিক টন। জেলায় সংশোধিত ও প্রান্তিক রেশন এলাকায় ৬৬ লক্ষ ৮১ হাজার ৫১০ জন রেশনের সুযোগ পাচ্ছে।

বিশদকা কর্ম্মসূচী রূপায়নের সময় তফসিলী সম্প্রদায় ও তফসিলী উপজাতিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। জেলায় তফসিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের জন সংখ্যা যথাক্রমে ১৯১০৮৭ (মোট জন সংখ্যা) ২২·৬১% এবং ১০৭১৯৭ জন (মোট জন সংখ্যা ১·৬২%)। বিভিন্ন প্রকল্পের উপকৃতদের মধ্যে প্রায় ১০% তফসিল সম্প্রদায়ের এবং ১৩।১৪% উপজাতি সম্প্রদায়ের। খাস কৃষিজমি প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৯০৮১ জন তফসিলী শ্রেণীভুক্ত আর ১৩৯০৪ জন তফসিলী উপজাতি সম্প্রদায়ের। উপকৃতদের তালিকায় ১৪৪৮৭ জন মুসলমান আছে। বাস্তুজমি পেয়েছে যারা তাদের মধ্যে ১৪২৮৩টি পরিবার তফসিলী আর ৪৫৫৫টি পরিবার উপজাতি এবং ৭৬৪৬টি পরিবার মুসলমান। সমবায় সমিতির ঋণ প্রাপকদের মধ্যে ৮৩৯০ জন তফসিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক আছে।

বিশদকা কর্ম্মসূচীর কাজ শুরু হয়েছে, রূপায়নের কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। তার দেখে মনে হচ্ছে এই কর্ম্মসূচী জেলার গ্রামাঞ্চলে অনুন্নত সম্প্রদায় এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের যথেষ্ট সহায়তা করবে।

---

২৪ পরগণা জেলা প্রেস ক্লাবের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবের স্মারক গ্রন্থের প্রকাশিত প্রবন্ধ সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশ করা হলো।

শ্রীবিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইহাটি, পো: অশ্বিনীনগর, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত, প্রিন্টিং সেন্টার, (C/o. কে, বি, লাইব্রেরী) হাতিয়াড়া, হইতে মুদ্রিত।

একটি শিশুর সোনার থালা
দুটি হলেও আদর।
অধিক মানে অবহেলা
কেবলই চড়চাপড়।

আগে সঞ্চয় পরে সন্তান

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

Stereo Owners!

NEW

HMV SONIC TUNERS

Your Favourite Radio Programmes in Stereo Quality

If you own a stereo system, you can't be happy with the sound of an ordinary radio or transistor. As manufacturers of quality stereo systems, neither were we. The result: *HMV Sonic Tuners.*

HMV Sonic Tuners are radio receiving sets. They dispense with the reproduction equipment that is crowded into conventional radios, concentrate only on receiving broadcasts. All you have to do is plug the tuner into your amplifier—and listen to your favourite radio programmes through your stereo's speaker system! *Radio sound in stereo quality.* (And remember, almost every amplifier made in India has a tuner input.)

There are two HMV Tuner models. The Sonic II and IV. Whichever one you choose, you are getting the most advanced 'radio' available. HMV Sonic Tuners receive the most distant stations accurately because they have Fine/Flywheel Tuning—as well as a Visual Tuning Device that lights up only when a station is pinpointed.

So, step up to a *really complete* stereo system with an HMV Sonic Tuner.

Visit your dealer for a demonstration today.

HMV EMI **His Master's Voice**

—THE FIRST NAME IN SOUND FOR OVER 70 YEARS

MINTAS HMV.ST_J.140

সাফল্যের একটি বছর
জরুরী অর্থনৈতিক কর্মসূচী ২৪ পরগণায়

- ধাস কৃষিজমি বিতরণ করা হয়েছে ৪৮,৮৮৫ একর,
  —উপকৃত হয়েছে ১৫,২৮০ জন কৃষিজীবী
  —এর মধ্যে ৩৯,০৮১ জন তপশিলী সম্প্রদায়ের
  ১৩,১০৪ জন তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায়ের।

- বাস্তুজমি বিতরণ করা হয়েছে ৩১,৫৫৫ বাস্তুহীন পরিবারের মধ্যে।
  —এর মধ্যে ১৪,২৮৩ জন তপশিলী সম্প্রদায়ের
  আর ৪৫৫৫ জন তপশিলী উপজাতির সম্প্রদায়ের।

- সমবায় সমিতি থেকে ১৫ই জুন পর্যন্ত ৩১১.৮৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। উপকৃতদের মধ্যে ৩১,৫১৮ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী।

- ১৭,৩৬৪ একর অতিরিক্ত কৃষি-জমিতে সেচের ব্যবস্থা—৩৩১টি বিদ্যুৎ-চালিত অগভীর নলকূপ, ১৫টি গভীর নলকূপ এবং ৮টি জল-নিকাশী প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

- ৬৬.৪৫ লক্ষ টাকার কাপড় বিধিবদ্ধ দরে বিক্রয় হয়েছে ২৮১টি কেন্দ্রের মাধ্যমে।

- স্কুল-কলেজ হস্টেলের ৩৩,১৮১ জন ছাত্রছাত্রী বিধিবদ্ধ দরে খাদ্য-সামগ্রী পাচ্ছে।
  ৩২টি বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সমবায়ের মাধ্যমে খাতা বই ইত্যাদি সরবরাহ হচ্ছে। ৬টি স্কুলিয়ার স্কুলে বুক-ব্যাঙ্ক হচ্ছে।

২৪ পরগণা জেলা তথ্য ও জনসংযোগ সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

এদের জুতো পরাতে চাই

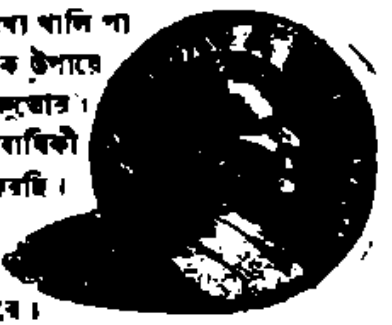

আমরা পঞ্চাশ বছর আগে লক্ষ্য করেছিলাম
'আমাদের দেশে অসংখ্য খালি পা
ঢাকার জন্য দরকার বাড়িক উপায়ে
তৈরী প্রচুর জুতোর।'
আজ টমাস বাটার জন্য শতবার্ষিকী
আমরা পালন করছি।
সেই সঙ্গে বানিয়ে চলেছি
এমন দামে জুতো
যত লোক মানুষ যা কিনতে পারে।

Bata

গীতাস্বামী মুনশী জগদীশ চন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা

মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা টিপ্পনী ভাষ্য বৃহদ্ভাষ্যাদি ও বিস্তৃত মূল্যবান ভূমিকাসহ। শঙ্কর, শ্রীধর, বলদেব, বঙ্কিম, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গীতাচার্যগণের মতালোচনাপূর্বক সম্পাদিত। অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা ও ভক্তিমূলক উপসংহার। জ্যাকেট সহ কাপড়ে বাঁধাই ১৫·০০ টাকা। প্লাষ্টিকের জ্যাকেটসহ ১৭·০০ টাকা।

শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর শ্রীগীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ। "যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলাভাষার শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা" ; "যতদিন বাংলাভাষা থাকবে, জগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।"—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

গীতার অন্যান্য সংস্করণ

বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০	নিত্য পাঠ্য গীতা	১·৫০
সুলভ পকেট গীতা	২·৫০	সদাপাঠ্য গীতা	১·০০
পদ্য গীতা	২·৫০	ঐ প্লাষ্টিক জ্যাকেটসহ	১·৫০

জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫·০০	ভারত আত্মার বাণী	৭·৫০
কর্মবাণী	১·৫০	Soul of India speaks	৭·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০

সুলেখকশ্রী অনিল চন্দ্র ঘোষ এম, এ,

		শ্রীনীলিমা ঘোষ এম, এ, বি, টি	
ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০	ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৩·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০	মানুষের মত মানুষ	১·৩০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৬·০০	বঙ্কিমের গল্প	১·৫০
বাংলার কবি	৬·০০	বিদ্যাসাগর	৩·০০
বাংলার বিদুষী	৪·৫০		
বাংলার মনীষী	৩·০০	ব্যায়ামবীর শ্রীশরৎ সরকারের	
জীবন গড়া	০·৭৫	শরীর ও শক্তি	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	৪·০০	নীরোগদেহে দীর্ঘজীবন	২·৫০
আচার্য জগদীশ	৪·০০	সরল যোগ-ব্যায়াম	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	৩·০০	যোগ-ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	৪·০০	ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৩·০০
রবীন্দ্রনাথ	৪·০০	যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৫·০০

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৪·০০

সর্বদা ব্যবহার্য মধ্যমাকৃতি অভিনব অভিধান। পরিবর্ধিত সংস্করণ। শব্দ সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার।

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

সুলেখা

আপনার
লেখার সাথী

বিভিন্ন রঙে পাওয়া যায় :—
রয়াল ব্লু • ব্লু-ব্ল্যাক • রেডি ব্লু
ব্ল্যাক • রেড • গ্রীন
ব্রাউন • অরোলেট

বিক্রয়ে সর্বাধিক

উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা • গাজিয়াবাদ

সি, সি. কোম্পানী লিঃ

—কন্টিনেন্টাল কমার্শিয়াল কোম্পানী লিমিটেড—
৮/১, বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ (ইষ্ট)
ক লি কা তা-১

যাবতীয় অফিস-ষ্টেশনারী ও
ছাপাই-এর কাজ :
টাইপরাইটার—কাউন্টেন পেন
বিক্রয় ও মেরামত :
—: ষ্টীল ফারনিচার :—

গ্রাহকের সন্তোষ আমাদের লক্ষ্য

ফোন—২২-৪২৬২, ২২-৪২৬৩,
২১-৫৪৮৩

স্টুডেন্টস্ টেলারিং হাউস

— আধুনিক রুচিসম্মত পোষাক —
অর্ডার সরবরাহ করা হয়।

—বাগুইআটি বাজার—

আদর্শ হিন্দু হোটেল
ও
মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

—: এবার পূজায় বিপুল আয়োজন :—

—ডি-আই-পি ৪৪নং বাসষ্ট্যাণ্ড—

Central Regd. No. R. N. 2571 57 Phone No 57 254 UJJAYANTA RAI

শারদোৎসবে

CALCUTTA UNIVERSITY

আমাদের আন্তরিক

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

গ্রহণ করুন।

24 SEP 1976

সুভাষ লাইব্রেরী

১২, সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা—৬